শুদ্ধতম কবি

আবদুল মান্নান সৈয়দ

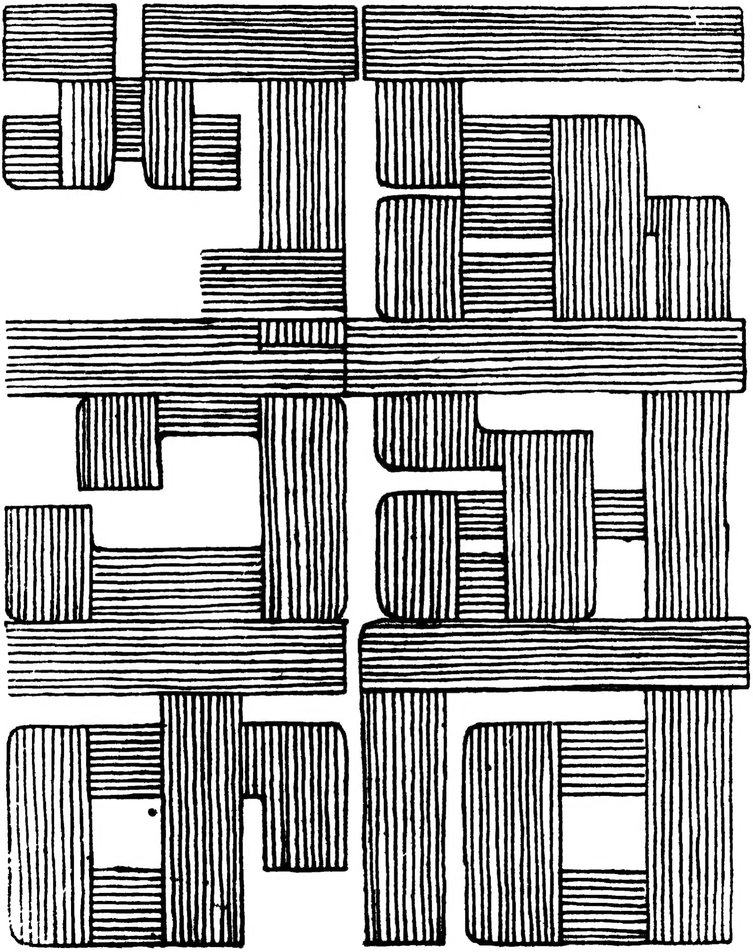

নলেজ হোম ॥ ঢাকা

পরিশোধিত ও পরিবর্ধিত
দ্বিতীয় সংস্করণ
২৫ বৈশাখ ১৩৭৭

প্রথম প্রকাশ
১৮ শ্রাবণ ১৩৭৫

*

ভারতে প্রাপ্তিস্থান
বুক সেন্টার
৭৬ বউবাজার স্ট্রিট
কলকাতা ১২

*

প্রকাশক
এ. এম. খান মজলিশ
নলেজ হোম
১৪৬ গভর্নমেন্ট নিউমার্কেট
ঢাকা ৫

মুদ্রক
বাংলা একাডেমীর মুদ্রণ শাখা
ঢাকা ২
.৮০.
প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী
[স্ব] সায়রা সৈয়দ

উৎসর্গ

মুনীর চৌধুরী

আবদুল মান্নান সৈয়দ-এর
অন্যান্য প্রবন্ধগ্রন্থ

জীবনানন্দ দাশের কবিতা
জীবনানন্দ দাশের গদ্য-লেখা
নজরুল ইসলাম / কবি ও কবিতা
দশ দিগন্তের দ্রষ্টা
নির্বাচিত প্রবন্ধ

সূচিপত্র

প্রথম খণ্ড

পরিচ্ছেদ	এক	শুদ্ধতম কবি	উনিশ
পরিচ্ছেদ	দুই	বর্ণ	একতিরিশ
পরিচ্ছেদ	তিন	শব্দ	পঁয়তিরিশ
পরিচ্ছেদ	চার	একটি অব্যয় নিয়ে	বিয়াল্লিশ
পরিচ্ছেদ	পাঁচ	বাংলা ছন্দোমুক্তির জীবনানন্দীয় সূত্র	পঞ্চাশ
পরিচ্ছেদ	ছয়	গদ্যকবিতা	উনষাট
পরিচ্ছেদ	সাত	সনেট	উনসত্তর
পরিচ্ছেদ	আট	জীবনানন্দ ও ইংরেজি কবিতা	আশি
পরিচ্ছেদ	নয়	জীবনানন্দ ও বাংলা কবিতা	নব্বই
পরিচ্ছেদ	দশ	কল্পনার তিন কণ্ঠ	একশো পঁচিশ

দ্বিতীয় খণ্ড

পরিচ্ছেদ	এক	'বনলতা সেন'	একশো তেতাল্লিশ
পরিচ্ছেদ	দুই	'মৃত্যুর আগে'	একশো সাতচল্লিশ
পরিচ্ছেদ	তিন	'সুচেতনা'	একশো পঞ্চান্ন
পরিচ্ছেদ	চার	'আট বছর আগের একদিন'	একশো ষাট

তৃতীয় খণ্ড

পরিচ্ছেদ	এক	প্রবন্ধ	একশো সাতাত্তর
পরিচ্ছেদ	দুই	ছোটোগল্প	একশো ছিয়াশি
পরিচ্ছেদ	তিন	উপন্যাস	দুশো
পরিচ্ছেদ	চার	জীবনায়ন	দুশো উনিশ

যোজনাংশ

পরিচ্ছেদ	এক	'বর্ষ-আবাহন'	দুশো একত্রিশ
পরিচ্ছেদ	দুই *	'স্বর্গীয় কালীমোহন দাশের শ্রাদ্ধবাসরে'	দুশো বত্রিশ
পরিচ্ছেদ	তিন	'পৃথিবী ও সময়'	দুশো আটত্রিশ
পরিচ্ছেদ	চার	'নজরুলের কবিতা'	দুশো বিয়াল্লিশ
পরিচ্ছেদ	পাঁচ	'লেখার কথা'	দুশো পঁয়তাল্লিশ
পরিচ্ছেদ	ছয়	রবীন্দ্র-জীবনানন্দ পত্রবিনিময়	দুশো পঞ্চাশ

পরিশিষ্ট : জীবনপঞ্জি — দুশো পঞ্চান্ন

প্রবেশক

দ্বিতীয় সংস্করণ

১· প্রস্তুতিপ্রসঙ্গ

"শুদ্ধতম কবি" প্রথম প্রকাশের অল্পকালের মধ্যেই ফুরিয়ে গিয়েছিলো। দ্বিতীয়বার বেরোতে যে এতো দেরি হ'লো (প্রেসেই প'ড়ে থেকেছে বছর-খানেক), তার কারণ আমারই আলস্য ও আসোঁয়া।

বইএর পৃষ্ঠাসংখ্যা গতবারের ঠিক দ্বিগুণ হ'লো এবার। তাহ'লেও, আমার রচিত বা পরিকল্পিত জীবনানন্দ-সম্পর্কিত আরো-কিছু লেখা যেতে পারলো না এই ভয়ে, যে, গ্রন্থের আয়তন তাতে হয়তো-বা সম্ভাব্যের সীমা ছাড়াবে।

বইএর কেন্দ্রাংশ যাতে জখম না-হয় সে-দিকে লক্ষ্য রেখে, এবার গ্রন্থটি নতুনভাবে বিন্যস্ত করেছি। প্রথম সংস্করণে ছিলো মোট চোদ্দোটি পরিচ্ছেদ ; এখন মোট পরিচ্ছেদসংখ্যা দাঁড়ালো চব্বিশ।

বর্জন করেছি চারটি পরিচ্ছেদ : 'একটি কবিতার লেখন', 'পরাবাস্তবতার পথ', 'বিলীয়মান জীবনানন্দ প্রাসঙ্গিক' ও 'গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত জীবনানন্দের কবিতা'। 'একটি কবিতার লেখন' পরিচ্ছেদটি পূর্ণতর আকারে 'কবিতার বিভিন্ন লেখন' শিরোনামে স্থান পেয়েছে আমার "জীবনানন্দ দাশের কবিতা" গ্রন্থে ; 'বিলীয়মান জীবনানন্দ প্রাসঙ্গিক' ঐ গ্রন্থের প্রবেশকে পুনরুদ্ধৃত ; গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত জীবনানন্দের চোদ্দোটি কবিতা ঐ গ্রন্থে পুনঃসংকলিত। 'পরাবাস্তবতার পথ' প্রবন্ধটি পূর্ণতর আকারে আমার অন্য-একটি গ্রন্থে প্রকাশিত হচ্ছে।

পরিমার্জনা করেছি বহুলাংশে 'জীবনানন্দ ও ইংরেজি কবিতা' প্রবন্ধটি। প্রয়োজনীয় অন্যান্য পরিশোধনও যথাসাধ্য সম্পন্ন করেছি।

সংযোজন করেছি 'সনেট', 'গদ্যকবিতা', 'জীবনানন্দ ও বাংলা কবিতা' (এই শিরোনামে আসলে স্থান পেয়েছে তিনটি বিভিন্ন প্রবন্ধ : 'জীবনানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ', 'জীবনানন্দ ও মোহিতলাল', এবং 'জীবনানন্দ ও নজরুল'); 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার আলোচনা ; জীবনানন্দের লেখা প্রবন্ধ, ছোটোগল্প ও উপন্যাসের পর্যালোচনা, এবং জীবন- ও সাহিত্য-বিষয়ক একটি প্রশ্ন-তোলা প্রবন্ধ।

কবির লেখা নতুন একটি সনেট খুঁজে পেয়েছি : 'সে'। সনেট-সম্পর্কিত রচনায় (প্রথম খণ্ড/পরিচ্ছেদ সাত) যেখানে বলেছি কবির মোট সনেটের সংখ্যা তিয়াত্তর, সেখানে এই সনেটটি যুক্ত হয়ে কবির লেখা সনেটের

সংখ্যা দাঁড়ালো চন্নাত্তরটি। এই সনেটটি কবির সনেটগুচ্ছের মধ্যে প্রকরণের দিক থেকেও নতুন। ঐ নিবন্ধে কবির যে-চার ধরনের চতুর্দশ-পদীর উদাহরণ উদ্ধৃত করেছি, তার সঙ্গে এই পঞ্চম ধরনটিও উল্লিখিত হওয়া উচিত ; কবির লেখা আঠারো মাত্রার আর-কোনো সনেট চোখে পড়েনি আমাদের। সনেটটি উৎকলন ক'রে দিচ্ছি এখানে :

সে

আলো যেন কমিতেছে—বিস্ময় যেতেছে নিভে আরো
আকাশ তেমন নীল ? আকাশ তেমন নীল নয়,
মেয়েমানুষের চোখে নেই যেন তেমন বিস্ময়,
মাছরাঙা শিশুদের পাখি আজ ; শিশুরাও কারো
রেশমি চুলের শিশু নয় আজ ; ভাবিতে কি পারো
প্রেমে সেই রক্ত আছে ? আঘাতে রয়েছে সেই ভয় ?
কুয়াশায় সেই শীত ? কে সাজায় কে করে সঞ্চয়
আজ আর ! জীবন তবুও যেন হয়েছে প্রগাঢ় !

নতুন সৌন্দর্য এক দেখিয়াছি—সকল অতীত
ঝেড়ে ফেলে—নতুন বসন্ত এক এসেছে জীবনে ;
শালিখেরা কাঁপিতেছে মাঠে মাঠে—সেইখানে শীত,
শীত শুধু—তবুও আমার বুকে হৃদয়ের বনে
কখন অঘ্রাণ রাত শেষ হ'ল—পৌষ গেল চ'লে
যাহারে পাইনি রোমে বেবিলনে, সে এসেছে ব'লে।

কবির প্রবন্ধ-বিষয়ক আলোচনা "কবিতার কথা" গ্রন্থ নিয়ে লেখা। জীবনানন্দের অগ্রন্থিত প্রবন্ধের সংখ্যা কম নয়—তার উপর আমার সন্দর্ভ অন্যত্র প্রাপ্তব্য।

কবির উপন্যাস-সম্পর্কিত আলোচনাটি পড়েছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের একটি সংস্থা 'বক্তব্য'-এর উদ্যোগে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে, ১৯৭৫-এর জানুআরি মাসে। (ঐ অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের জীবনানন্দ-সম্পর্কিত নানারকম জিজ্ঞাসার নিরসন করতে পেরে তৃপ্তি পেয়েছিলাম।) কবির গ্রন্থাকারে প্রকাশিত একমাত্র উপন্যাস "মাল্যবান"-এর আলোচনা করেছি ঐ নিবন্ধে। পাঠক-সাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যায়, যে, জীবনানন্দ-প্রণীত আর-একটি উপন্যাস, "সুতীর্থ", 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছে (১৯৭৬-এর ৩রা জানুআরি থেকে ৪ঠা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত)। বইটি গ্রন্থাকারে এখনো প্রকাশিত হয়নি ব'লে, আপাতত অনালোচিত র'য়ে গেলো।

'বিচিত্রা'-য় 'জীবনায়ন' লেখাটি প্রকাশের পরে কএকজন পাঠক চিঠি পাঠান ঐ পত্রিকার দফতরে ; কএকটি চিঠি প্রকাশিত হয়। কোনো-

কোনো পত্রলেখক জীবনানন্দের মৃত্যু-যে আসলে আত্মহত্যা আমি এরকম সিদ্ধান্ত করেছি, ধ'রে নেন। বস্তুত তাঁর মৃত্যু-বিষয়ে (এবং অন্যান্য কএকটি প্রসঙ্গে) আমি কিছু চাপা-পড়া সংশয়-সন্দেহকে যতোদূর সাধ্য যুক্তিগ্রাহ্য আকারে উপস্থিত করেছিলাম, কোনো শেষ-সিদ্ধান্ত টানিনি, লেখাটির শেষে 'বক্ষ্যমাণ অনুমানগুলি' কথাটি আমার মনোভাব স্পষ্ট প্রকাশ করে। লেখাটি আত্মসম্পূর্ণ ব'লে, এবং কোনো পাঠক কোনো নতুন তথ্য পেশ করতে না-পারায়, জবাব দেওয়ার দরকার হয়নি। আমার মূল বক্তব্য ছিলো : জীবনানন্দের জীবন, মৃত্যু ও সাহিত্যকর্ম বিষয়ে প্রকৃত তথ্য ও সত্য উদ্ঘাটিত হোক। যাই হোক, যে-সব পাঠক ও পত্র-লেখকের মধ্যে আমার লেখাটি যে-কোনোভাবে সাড়া জাগিয়েছিলো, এই সুযোগে তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

নতুন নিবন্ধগুলি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো 'ধানসিঁড়ি', 'ধানজমি', 'বই', 'বেতার বাংলা', 'পূর্বাচল' ও 'বিচিত্রা' পত্রিকায়।

২. যোজনাংশ

'যোজনাংশে' এবার কবির প্রথম প্রকাশিত কবিতা ও প্রথম প্রকাশিত গদ্য-রচনা দেওয়া সম্ভব হ'লো। যতোদূর জানা যায় : এর আগে কবির আর-কোনো কবিতা বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়নি। দুটি রচনাই প্রকাশিত হয়েছে বরিশালের 'ব্রহ্মবাদী' পত্রিকায়। এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন জীবনানন্দের পিতা সত্যানন্দ দাশ। জীবনানন্দের পিতা, মাতা, ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন ব্রাহ্মসমাজের এই স্থানীয় মুখপত্রটিতে প্রচুর লিখতেন। কবিতাটি প্রকাশকালে জীবনানন্দের বয়স একুশ, গদ্যরচনাটি প্রকাশকালে সাতাশ। জীবনানন্দের প্রথম কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাঁর আটাশ বছর বয়সে। মনে হয়, জীবনানন্দের অগ্রগতি হয়েছে অতি মন্থর-ভাবে। 'বর্ষ-আবাহন' কবিতাটি পত্রিকায় প্রকাশকালে কবিতার নিচে লেখা ছিলো : 'শ্রী—'। বর্ষশেষের সূচিপত্রে মুদ্রিত আছে : 'জীবনানন্দ দাস বি. এ.'। সাধুভাষায় লেখা হ'লেও জীবনানন্দের গদ্যরচনার এই আদি নিদর্শনটি তাঁর কবিস্বভাবের সমস্ত মুদ্রাই ধ'রে রেখেছে। এই রচনাটির প্রকাশকাল ১৩৩২, 'ব্রহ্মবাদী'-র তিনটি সংখ্যা ব্যেপে। "কবিতার কথা"-র প্রবন্ধগুচ্ছ ১৩৪৫ থেকে '৬০-এর মধ্যে রচিত। অর্থাৎ, ঐ গদ্যরচনার এক যুগ পরে জীবনানন্দ তাঁর স্থায়ী, নিজস্ব, কবিতাকেন্দ্রী গদ্যনিবন্ধগুলি লিখতে শুরু করেন।

জীবনানন্দের রাজনীতি-সমাজ-চেতন দুর্লভ প্রবন্ধ 'পৃথিবী ও সময়' প্রকাশিত হয় 'সোনার বাংলা' পত্রিকায়। একসময়কার এই ভালো ও লোক-

প্রিয় পত্রিকাটিতে খুবসম্ভবত কবির আরো কিছু রচনা স্বগোপন ক'রে আছে—এখনো আবিষ্কার ক'রে উঠতে পারিনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তিক-কালে, ১৯৪৭ সালে, লেখা এই প্রবন্ধটি। "সাতটি তারার তিমির" থেকেই জীবনানন্দের মধ্যে জেগেছিলো সমকালিক রাজনীতি, সমাজ, দেশ প্রভৃতি সম্বন্ধে চেতনা। তাঁর বেশ কিছু কবিতায় এই ভাবনার স্বাক্ষর পড়েছে। ঐসব সমাজ-রাজনীতি-তথা বিশ্ব-চেতন কবিতার পাশাপাশি এই প্রবন্ধ-টিকে অনায়াসে স্থাপন করা যায়। প্রবন্ধটিকে ঐসব কবিতার গদ্যভিত্তির মতো প্রোথিত করা চলে। ঐসব কবিতায় যেমন, তেম্নি এখানেও—শেষ পর্যন্ত—মানুষের উপরে আস্থা ও প্রতীতিই প্রকাশিত।

'নজরুলের কবিতা' সম্পর্কে আমার বিশ্লেষণ গ্রথিত হয়েছে এই বই-এর একশো-বাইশ-চব্বিশ পৃষ্ঠায়। (আরো দ্র. তৃতীয় খণ্ড / পরিচ্ছেদ এক।)

'লেখার কথা' প্রবন্ধে সাহিত্য রচনার নেপথ্য কিছু দিক উদ্ভাসিত—কবিতার সঙ্গে গদ্যসাহিত্যের পার্থক্যের দিক নির্দেশও করেছেন। এই ভিতরযাত্রায় তাঁর এক হিরন্ময় সিদ্ধান্ত : 'সাহিত্যিকের মন অন্য মানুষের মনের বাইরের কিছু বস্তু নয়, সেই মনেরই এক ধরনের সিদ্ধিলাভ, জীবন নিয়েই তার কাজ, অভিজ্ঞতার কেন্দ্রবিন্দু ও ভাবনাঘন যুক্তির আশ্রয়ে।'

রবীন্দ্রনাথের প্রথম পত্রখানি জীবনানন্দকে যখন লেখা হয়েছিলো, তখন জীবনানন্দের বয়স মাত্র সতেরো বছর। জীবনানন্দের প্রথম কবিতাগ্রন্থ, "ঝরা পালক", বেরিয়েছিলো তাঁর আটাশ বছর বয়সে—অর্থাৎ এরও দশ বছর পরে। সম্ভবত কিশোর-কবি তাঁর কিছু কবিতা পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে তাঁর বিবেচনার জন্যে। রবীন্দ্রনাথের চিঠি থেকেই মনে হয়, কবিতাগুলি আর-যাই-হোক গতানুগতির স্রোতে ভাসেনি—সেই দিক থেকে জীবনানন্দের নিজস্ব সন্ধান—মনে হয়—তখন থেকেই শুরু হ'য়ে গিয়েছিলো। এটাও একটু অবাক লাগে, যে, যে-রবীন্দ্রনাথ প্রায় সবাইকেই অনুমোদন করেন, যেন তিনিই জীবনানন্দকে একটু কড়া ক'রেই ধমকে দিলেন। 'দেশ' পত্রিকার ৪১ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা 'সাহিত্য সংবাদ' বিভাগে সনাতন পাঠক লিখেছিলেন, 'চিঠিখানি কাকে লেখা, ওপরে তার উল্লেখ নেই। তবে এই চিঠিখানি জীবনানন্দ দাশের কাগজ-পত্রের মধ্য থেকে খুঁজে বার করেছিলেন ভূপেন্দ্র গুহ। রবীন্দ্রনাথ যে সদ্য তরুণ জীবনানন্দ দাশকেই এ চিঠি লিখেছিলেন এটা স্বতঃসিদ্ধ।'

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় চিঠিখানি সম্ভবত জীবনানন্দ দাশের "ধূসর পাণ্ডুলিপি" (১৯৩৬) প'ড়ে লেখা হয়েছিলো। জীবনানন্দের দ্বিতীয় চিঠির জবাবে লেখা এই পত্রখানি। এই দুটি চিঠি বাদে, আর-একবার

রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন। ৩ অক্টোবর ১৯৩৫ সালে বুদ্ধদেব বসুকে লেখা একটি পত্রে 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত জীবনানন্দের 'মৃত্যুর আগে'· কবিতাটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য : **'জীবনানন্দ দাশের চিত্ররূপময় কবিতাটি আমাকে আনন্দ দিয়েছে।'** দ্বিতীয় চিঠির রস ও স্বকীয়তার সঙ্গে 'তাকিয়ে দেখার আনন্দ' এবং এই উক্তির 'চিত্ররূপময়' শব্দটি আসলে জীবনানন্দের কবিতার একটি বংশ-লক্ষণ—চিত্রলতাকেই—নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত ক'রে দ্যায়।

রবীন্দ্র-উত্তর রবীন্দ্র-বিধর্মী জীবনানন্দের কবিতায় রবীন্দ্রস্পর্শ যতো কমই থাকুক না কেন (প্রথম পর্যায়ে কবি রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে বরং অবলম্বন হিশেবে নিয়েছিলেন নজরুল-মোহিতলাল-সত্যেন্দ্রনাথ-যতীন্দ্রনাথকে ; "ধূসর পাণ্ডুলিপি"-তে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের "সন্ধ্যাসঙ্গীত"-এর প্রভাবচ্ছায়া ভালোরকম পড়েছে), তবু তাঁর কবিতায় রবীন্দ্রনাথ উল্লিখিত (১. আমার চোখের পথে আবর্তিত পৃথিবীর আঁকাবাঁকা রেখা/যতদূর চ'লে গেছে : কলকাতা নতুন দিল্লী ইয়াংকী আফ্রিক্/দান্তের ইটালী শেক্‌স্‌পীরিয় ইংল্যান্ড মেঘ-পাতাল-মর্ত্যের গল্পের/বিভিন্ন পর্বের থেকে উঠে এসে রবীন্দ্র লেনিন মার্কস ফ্রয়েড রোলাঁয়/আলোকিত হ'য়ে ওঠে।'—'নবপ্রস্থান' /৭, জী. দা.ক.। ২. 'রাত/এখানে রাতের স্রোতে মিশে থেকে সময়ের হাতে দীর্ঘতম/রাত্রির মতন কেঁপে মাঝে-মাঝে বুদ্ধ সোক্রাতেস/কনফুচ লেনিন গ্যেটে হ্যোল্ডেরলিন রবীন্দ্রের রোলে/আলোকিত হতে চায়।'—'পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে', বে. অ. কা.), রবীন্দ্র-প্রয়াণে তিনি অন্তত তিনটি কবিতা লিখে তাঁর প্রণতি জানিয়েছেন (তিনটিরই শিরোনাম 'রবীন্দ্রনাথ' ; দ্র. জী. দা ক.), লিখেছেন রবীন্দ্র-প্রসঙ্গিত অন্তত দুটি নিবন্ধ (১. 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা', ক. ক. ; ২. 'রবীন্দ্রনাথ', স্বরাজ সাময়িকী, দৈনিক স্বরাজ, ২৪ শ্রাবণ ১৩৫৪)। সমস্ত সত্ত্বেও, জীবনানন্দের প্রথম পত্রখানি অন্য কোণ থেকে দেখা ও লেখা। রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা কবিতার সর্বাধিক উজ্জ্বল পুরুষ-যে অসচেতনভাবে তাঁর আসনে উঠে এসেছেন, তা নয়—সেই জাগৃতিরই দীপ্র দৃষ্টান্ত এই পত্রটি। যে-কবি লিখেছেন. 'অর্থহীন অসন্তোষে বা দুর্বল বিদ্রোহের অভিমানে আমি আমার পূর্ববর্তী বড় কবিকে ডিঙিয়ে গেলাম অকাব্যের জঞ্জালের ভিতর—সাহিত্যের ইতিহাসে এরকম আন্দোলনের কোন স্থান নেই।' এই পত্রের ভিতরে ঐ বিনীত বিদ্রোহই জ্বলমান। রবীন্দ্রনাথের আরাধ্য ছিলো প্রাচীন গ্রীকরা যার সাধনা করেছেন সেই সিরিনিটি বা শান্ততার—শিল্পে সাহিত্যে যেখানে তার ব্যতিক্রম রবীন্দ্র-চিত্ত তাকে ঠিক যথার্থ মর্যাদায় স্বীকার ক'রে নিতে পারেনি, 'দুঃখ বা আনন্দের একটা তুমুল

তাড়না' রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায় শিল্পে উত্তীর্ণ হ'তে পারে না। জীবনানন্দ এই পত্রে প্রতিবাদ করেছেন তার : মানবচিত্তের অন্ধকার আগুন খোড়ল ঝোড়ো-হাওয়াকে অঙ্গীকার ক'রে নিয়েছেন, শান্ততার সমমূল্য দান করেছেন তাকেও, সে-সবেরও চিরত্বের দাবি তুলেছেন, দান্তে ও শেলি-র কবিতায় বীঠোভেন-এর সুর-সৃজনে সেই অন্ধকার অগ্নি-জ্বালার সুচির প্রদীপ্তি খুঁজেছেন। জীবনানন্দের কবিতার কাঙক্ষাও শান্ততা, তারও অন্তঃস্থ পরিসর জুড়ে বিরাজ করে গহন শান্ততা, কিন্তু জীবনের অন্ধকারকে অগ্রাহ্য ক'রে নয়, জীবনের নালানর্দমাগুলি লাফিয়ে পার হ'য়ে গিয়ে নয়। এই চেতনা থেকেই রবীন্দ্রনাথের পরে জীবনানন্দ বাংলা কবিতাকে নূতন আয়তনে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন—কোনো 'অর্থহীন অসন্তোষে বা দুর্বল বিদ্রোহের অভিমানে' প্রাগ্বর্তী মহান কবিকে ডিঙিয়ে না-গিয়ে। বস্তুত জীবনানন্দের এই দাবি যেন আধুনিক সাহিত্যের তরফ থেকেই পেশ করা হয়েছে—কারণ : আধুনিক সাহিত্য জীবনের জল-স্থল সমস্তে বিহার করে। আসলে জীবনানন্দ মূল জোর দিয়েছেন সৃষ্টি-প্রেরণার উপরে—বাকি সব যেন খানিকটা বহির্বিচার, যেন খানিকটা বস্তুবিচার মাত্র। জীবনানন্দের এই পত্রে আধুনিক সাহিত্যের একটি ভিত্তিপাথর প্রোথিত ও স্থাপিত হ'য়ে গেছে।

জীবনানন্দের দ্বিতীয় পত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর অটুট ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশিত। 'জার্মান সাহিত্যে Goethe ইংরেজি সাহিত্যে Shakespeare এর যে স্থান আমাদের দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে আপনার সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা।'—জীবনানন্দের এরকম বিশ্বাস তাঁর প্রবন্ধে পরিব্যক্ত হয়েছে : 'রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভাষা, সাহিত্য, জীবনাদর্শ ও সময়ের ভিতর দিয়ে সময়ান্তরের গরিমার দিকে অগ্রসর হবার পথ যেরকম নিরঙ্কুশভাবে গঠন ক'রে গেছেন পৃথিবীর আদিমকালের মহাকবি ও মহাসুধীরাই তা পারতেন ; ইদানীং বহু যুগ ধ'রে পৃথিবীর কোনো দেশই এরকম লোকোত্তর পুরুষকে ধারণ করেনি।' কিংবা, 'সকল দেশের সাহিত্যেই দেখা যায় একজন শ্রেষ্ঠতম কবির কাব্যে তাঁর যুগ এমন মানবীয় পূর্ণতায় প্রতিফলিত হয় যে. সেই যুগের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পথে যে-সব কবি নিজেদের ব্যক্ত করতে চান. ভাবে বা ভাষায়, কবিতার ইঙ্গিতে বা নিহিত অর্থে, সেই মহাকবিকে এড়িয়ে যাওয়া তাঁদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।' ('রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা', ক. ক.)।—পত্রে জীবনানন্দ লিখেছেন : 'প্রায় নয় বছর আগে আমি আমার প্রথম কবিতার বই একখানা আপনাকে পাঠিয়েছিলুম। সেই বই পেয়ে আপনি আমাকে চিঠি লিখেছিলেন ; চিঠিখানা আমার মূলবান সম্পদের মধ্যে একটি।' জীবনানন্দের পত্র থেকে

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, যে, তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থ "ঝরা পালক" (১৯২৭)-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি তিনি পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই মূল্যবান পত্রটি খুব-সম্ভবত চিরতরেই লুপ্ত হ'য়ে গেছে।

৩. শুদ্ধতার সূত্র

একটি প্রশ্ন উঠেছে "শুদ্ধতম কবি" এই নাম নিয়ে : শুদ্ধতম কবি—তাহ'লে কি শুদ্ধ কবিতা ব'লে কিছু আছে, সেই শুদ্ধতা জীবনানন্দেই সর্বাধিক কি হিশেবে—এইসব।

প্রথম সংস্করণের 'প্রাসঙ্গিকী'-তে এ বিষয়ে আমি একটু যে ইঙ্গিত দিয়েছিলাম—আশা করি—তা সুমনা পাঠকদের নজর এড়ায়নি। আমি বলেছিলাম :

> একদা বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দ দাশকে 'নির্জনতম কবি' এই সুশোভন ও চমৎকার অভিধা-অঙ্গুরী পরিয়ে দ্যান। প্রায় মায়াবী অঙ্গুরীর মতোই এই উক্তি তৎসাময়িক আলোচনাসমুচ্চয়কে প্রভাবিত করে ; এরকম প্রভাবিত করে যে "কালের পুতুল"-এর দ্বিতীয় সংস্করণে বুদ্ধদেব বসু লেখেন :
>
>> বইখানা প্রায় পূর্বের আকারেই পুনঃপ্রকাশ করা হ'লো এই ভরসায় যে পরবর্তী সমালোচকেরা, জীবনানন্দ দাশকে 'নির্জনতম কবি' বলার সময়, অন্তত তাতে উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহার করবেন।
>
> কিন্তু আমাদের বিশ্বাস 'নির্জনতম কবি' অভিধার ভিতরে জীবনানন্দ দাশের শনাক্ত-সম্ভব চরিত্র-পরিচয় নিহিত নেই। তাঁর "শ্রেষ্ঠ কবিতা"-র ভূমিকা থেকে এই বিষয়ে জীবনানন্দ দাশের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য উৎকলন করা যায় :
>
>> আমার কবিতাকে বা এ কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম আখ্যা দেওয়া হয়েছে : কেউ বলেছেন, এ-কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজ-চেতনার, অন্য মতে নিশ্চেতনার ; কারো মীমাংসায় এ কাব্য একান্তই প্রতীকী ; সম্পূর্ণ অবচেতনার ; সুররিয়ালিস্ট। আরো নানারকম আখ্যা চোখে পড়ছে। প্রায় সবই আংশিকভাবে সত্য—কোনো-কোনো কবিতা বা কাব্যের কোনো-কোনো অধ্যায় সম্বন্ধে খাটে ; সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়।
>
> বস্তুত কোনো একটি-দুটি শব্দে কোনো কবিকে চিহ্নিত করাই মুশকিল। বিশেষত জীবনানন্দের কাব্যলোক আপাতদৃষ্টে প্রায়-একটি চক্রে আবর্তিত মনে হ'লেও ঐ চংক্রমণ জীবনের প্রায় নিখিল রেখামালা স্পর্শ করেছে। "ঝরা পালক" থেকে "বেলা অবেলা কালবেলা" পর্যন্ত কবিমানস ক্রমাগত পরিবর্তমান—যদিচ তাঁর প্রকাশরীতির বড়োরকম বদল ঘটেনি ব'লেই তাঁর এই বিষয়বিবর্তন অনেক সময় চোখ এড়িয়ে যায়। 'সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিশেবে' জীবনানন্দের নিজের কাছে অন্নদাশংকর রায়-প্রযুক্ত 'শুদ্ধতম কবি' মনঃপূত হ'তো কি ? আমার তো প্রযোজ্য মনে হয়।

বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য এর সঙ্গে আরো-একটু যোগ করতে চাই।

প্রথম পরিচ্ছেদে লিখেছিলাম তখন : 'শুদ্ধতার সূত্র সর্বাধিক প্রযোজ্য জীবনানন্দ দাশ সম্বন্ধেই : শুদ্ধমাত্র কবিতা ও কবিতা বিষয়ক ভাবনা-বেদনায় নিবেদিত এই কবি যেন কবিতাসুন্দরীর কাছেই আপাদমাথা বিক্রয় ক'রে ব'সে আছেন।' তখন-পর্যন্ত সেটাই সত্য ছিলো : জীবনানন্দের গল্প ও উপন্যাস তাঁর মৃত্যুর বছর বিশেক পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। জীবদ্দশায় যাঁর কবি-স্বীকৃতিই ভালো ক'রে জোটেনি, তিনি স্বভাবতই কুণ্ঠিত ছিলেন তাঁর অন্যান্য সাহিত্যকর্ম বিষয়ে। গল্প ও উপন্যাস লিখলেও তা এক হিশেবে কবি জীবনানন্দেরই সম্প্রসার—রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁর কবিতা, গল্প ও উপন্যাস পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, সহযোগী বরং। কিন্তু জীবনানন্দেরই সমকালীন আর-দুএকজন কবি, যেমন বুদ্ধদেব বসুরও, গদ্যকর্ম তো তাঁর কবিতারই সম্প্রসারিত রূপ। তাহ'লে জীবনানন্দকে বিশেষভাবে 'শুদ্ধতম' বলা হচ্ছে কেন?

এর প্রধান সূত্র পাওয়া যাবে জীবনানন্দের বিশেষ কবিদৃষ্টির মধ্যে—তাঁর কবিতা ও কবিতা সম্বন্ধে তাঁর চিন্তার সারাৎসারের মধ্যে। দেশোন্নয়ন ও সমাজহিতের জন্যে অসংখ্য কবিতা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ; লিখেছেন "কথা ও কাহিনী" অথবা "পুনশ্চ" কিংবা "পলাতকা" অথবা "কণিকা"-র মতো বই। "খেয়া" কিংবা "বলাকা"-র কবিতাগুলো যে-অর্থে কবিতা, প্রাগুক্ত বইগুলোর রচনাগুচ্ছকে কবিতা বলতে হ'লে নিশ্চয় তাকে বহুদূরে অতিক্রম ক'রে আসতে হয়। "কথা ও কাহিনী", "পুনশ্চ", "পলাতকা" ও "কণিকা"-র কবিতাগুলি অ-কবিতা নয়। তাঁর "শ্রেষ্ঠ কবিতা"-র ভূমিকায় জীবনানন্দ পরিষ্কার লিখেছেন : 'কবিতা অনেক রকম।' জীবনানন্দ জানতেন ও উপভোগ করতেন এই অনেক রকম কবিতা। (অনেকরকম কবিতার অস্তিত্ব বিষয়ে অবহিত হ'য়েও বাচংযত জীবনানন্দ নিজে অবশ্য প্রায় একরকম কবিতারই চর্চা করেছেন—একটি ধারায় অগ্রসর হ'য়ে গেছেন। কেননা, এই আশঙ্কিত তথ্যটি তিনি ভালো ক'রে জানতেন : 'নিজের অল্প অভিজ্ঞতার পটে কম বেশি গভীরতা ফলিত হয়েছে, অভিজ্ঞতা বাড়াতে গেলে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বার সম্ভাবনা : আমাদের দেশের কবিদের ভিতর এদের সংখ্যাই বেশি।'—'কবিতার আলোচনা', ক. ক.। জীবনানন্দের কবিতাসমগ্রের বিশ্লেষণে এই উক্তিটি অতিমূল্যবান।) যদি 'অনেক রকম কবিতা' সম্ভব হয়, তাহলে কোনো-কোনো কবিতাকে কিংবা কোনো-কোনো কবিকে আলাদা ক'রে চিহ্নিত করা যায় না কি? আর সমালোচনা কি চিহ্নিত করবে না এক-এক জন কবির এক-একটি বৈশিষ্ট্যকে? তাহ'লে কবিতার আগে 'শুদ্ধ' শব্দটি বসিয়ে যদি বিশেষ ধরনের কবিতাকে চিহ্নিত করি, কিংবা শুদ্ধতা যাঁর কবিতায় আমূল আবহমান তাঁকে 'শুদ্ধতম কবি' বলি, তাতে তো কবিতাকে কিংবা কবিকেই চেনার সুবিধা হয়।

শুদ্ধ বা বিশুদ্ধ কবিতা বলতে আমরা তাহ'লে বোঝাচ্ছি নিশ্চিত-ভাবেই "কথা ও কাহিনী", "পুনশ্চ", "পলাতকা" বা "কণিকা"-র মতো বই নয়—"খেয়া" কিংবা "বলাকা" অথবা "ক্ষণিকা" কিংবা "কল্পনা"-র মতো বইগুলিই। ঐ শ্রেষ্ঠ কবিতা-র ভূমিকাতেই জীবনানন্দ 'অনেক রকম কবিতা'-র কথা ব'লেও পরক্ষণেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'কবিতা রসেরই ব্যাপার, কিন্তু এক ধরনের উৎকৃষ্ট চিত্তের বিশেষ সব অভিজ্ঞতা ও চেতনার জিনিস—শুদ্ধ কল্পনা বা একান্ত বুদ্ধির রস নয়।' শুদ্ধ-কল্পনা বা শুদ্ধ-বুদ্ধির উপরে জোর দিচ্ছেন না জীবনানন্দ—বলছেন স্পষ্ট তাঁর সিদ্ধান্ত : 'কবিতা রসেরই ব্যাপার।' এই রসবিশিষ্টতা কবিতার সেই আদি শুদ্ধতাকে নির্দেশ করে। 'কবিতার কথা' প্রবন্ধে বারবার তিনি বলেছেন একই কথা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে :

> ১. আমি বলতে চাই না যে, কবিতা সমাজ বা জাতি বা মানুষের সমস্যা-খচিত—অভিব্যক্ত সৌন্দর্য হবে না। তা হতে বাধা নেই। অনেক শ্রেষ্ঠ কাব্যেই তা হয়েছে। কিন্তু সে-সমস্ত চিন্তাধারণা, মতবাদ, মীমাংসা কবির মনে প্রাক্‌কল্পিত হয়ে কবিতার কংকালকে যদি দেহ দিতে যায় কিংবা সেই দেহকে দিতে চায় যদি আভা তাহলে কবিতা সৃষ্টি হয় না—পদ্য লিখিত হয় মাত্র—ঠিক বলতে গেলে পদ্যের আকারে সিদ্ধান্ত, মতবাদ ও চিন্তার প্রক্রিয়া পাওয়া যায় শুধু। কিন্তু আমি আগেই বলেছি কবির প্রণালী অন্যরকম, কোনো প্রাক্‌নির্দিষ্ট চিন্তা বা মতবাদের জমাট দানা [বেঁধে] থাকে না কবির মনে—কিংবা থাকলেও সেগুলোকে সম্পূর্ণ নিরস্ত করে থাকে কল্পনার আলো ও আবেগ ;
>
> ২. কাব্যের নিজের ইন্‌টিগ্রিটির প্রয়োজন রয়েছে।
>
> ৩. হতে পারে কবিতা জীবনের নানারকম সমস্যার উদ্‌ঘাটন ; কিন্তু উদ্‌ঘাটন দার্শনিকের মতো নয় ; যা উদ্‌ঘাটিত হল তা যে কোনো জঠরের থেকেই হোক আসবে সৌন্দর্যের রূপে, আমার কল্পনাকে তৃপ্তি দেবে ;
>
> ৪. প্রত্যেক মনীষীরই একটি বিশেষ প্রতিভা থাকে—নিজের রাজ্যেই সে সিদ্ধ। কবির সিদ্ধিও তার নিজের জগতে ; কাব্যসৃষ্টির ভিতরে।

আরো একটু এগিয়ে, জীবনানন্দ যে-শুদ্ধতা বা বিশুদ্ধতার প্রসঙ্গ তুলেছেন, এবং তাঁই তাঁর আরাধ্য, এ বিষয়ে তাঁর দুটি উক্তি উদ্ধৃত করবো (পাঠক লক্ষ্য করবেন 'শুদ্ধ কবিতা' এই শব্দবন্ধও কবি ব্যবহার করেছেন) :

> ১. কেউ-কেউ বলবেন কালের মুকুর হিসেবে সাহিত্যকে মেনে নিলে এই বিচ্ছিন্ন যুগে শুদ্ধ কবিতার কোনো মানে হয় না। কিন্তু সাহিত্যকে যদি যুগের দর্পণ হিসেবেই শুধু স্বীকার করে নেয়া যায়, একটি ক্ষয়িষ্ণু যুগের নির্মম দর্পণ হয়েও সাংবাদিকী ও প্রচারমর্মী রচনার সঙ্গে কবিতার পার্থক্য এই যে প্রথমোক্ত জিনিসগুলোর ভিতর অভিজ্ঞতা-বিশোধিত ভাবনা

প্রতিভার মুক্তি, শুদ্ধি ও সংহতি কিছুই নেই, কবিতায় তা আছে।

[রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা, ক. ক.]

২. কোনো কিছুকে 'চরম' মনে করে সুস্থিরতা লাভ করবার চেষ্টায় আত্মতৃপ্তি নেই; রয়েছে বিশুদ্ধ জগৎ সৃষ্টি করবার প্রয়াস—যাকে কবি-জগৎ বলা যেতে পারে—নিজের শুদ্ধ নিঃশ্রেয়স মুকুরের ভিতর বাস্তবকে যা ফলিয়ে দেখাতে চায়।

[কবিতা প্রসঙ্গে, ক. ক.]

—জীবনানন্দের কবিতা ও কাব্যবিশ্বাস থেকে এই সত্য বেরিয়ে আসে, যে, আঁদ্রে জিদ্-এর মতো তাঁরও অবিচল প্রতীতি ছিলো : কবিতায় শ্রেষ্ঠত্বের চেয়ে শুদ্ধতাই আসল জিনিশ।

৪. স্বীকৃতি ও কৃতজ্ঞতা

এই বইএর গ্রন্থাকারে প্রকাশের প্রথম পরিকল্পনা করেছিলেন আমার দুই শুভার্থী সুহৃদ : জনাব আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ও জনাব মোহাম্মদ হারুণ-উর-রশীদ। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশমুহূর্তে এঁদের কথা মনে পড়ছে : এঁরা দুজনই এখন দেশের বাইরে।

প্রকাশের পরে বিভিন্ন পত্রিকায় বইটি আলোচনা করেছেন অনেক সুধী সাহিত্যিক। অনেকে আমাকে মৌখিকভাবে, টেলিফোনে কিংবা পত্র লিখে প্রোৎসাহিত করেছেন। পশ্চিম বাংলা থেকেও স্মরণীয় সাড়া পেয়েছি।

এবারে জীবনানন্দের দুর্লভ রচনাদি সংগৃহীত হয়েছে যাঁদের কল্যাণ-সৌজন্যে, তাঁরা হচ্ছেন : কবি-গবেষক জনাব আবদুস সাত্তার, সাহিত্যামোদি শ্রীতরুণকুমার মহলানবিশ ও কথাশিল্পী জনাব রশীদ হায়দার।

এই বইএর দুরূহ-সুন্দর মুদ্রণ সম্ভব হয়েছে বাংলা একাডেমীর মুদ্রণ বিভাগের জনাব আফজাল হোসেন, জনাব আবদুল মতিন (ইনি এই বই-এর প্রথম সংস্করণেরও মুদ্রণ-অপারেটর ছিলেন), জনাব হারুন-উর-রশীদ প্রমুখের সহযোগিতায়।

প্রকাশক জনাব এ. এম. খান মজলিশ সাহেব আমাকে অবাধ, শুভার্থ ও সহৃদয় স্বাধীনতা দিয়েছেন।

এঁদের সবার কাছে রইলো আমার অনিঃশেষ কৃতজ্ঞতা ॥

৪০ গ্রীন রোড, ঢাকা ৫

আবদুল মান্নান সৈয়দ

প্রথম খণ্ড

শুদ্ধতম কবি

১

একদিন একজন কবি তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থের শিরোদেশে 'অভিনব কাব্য' এই অপূর্ব স্বঘোষণা মুদ্রিত করেছিলেন ; একদিন একজন কবি 'ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কালবোশেখীর ঝড়' : এই নির্ঘোষে কবিতাজগতে প্রবেশ করেছিলেন নূতনের কেতন তুলেই ; আর-একজন সদ্যসমাগত কবি আর-একদিন প্রবেশসময়ে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন : 'কেউ যাহা জানে নাই—কোনো-এক বাণী—/আমি ব'হে আনি।' শেষোক্ত কবি, জীবনানন্দ দাশ, কবি- ও ব্যক্তি-জীবনে একান্তরকম অতিঅন্তর্বৃত্ত। অন্তর্বৃতি ভেঙে যে তাঁকে উপরের উচ্চারণ লিখিয়ে নিয়েছিলো, তাকে কবি-অস্মিতা ছাড়া আর-কোন শনাক্তিকরণ চলবে। বস্তুত কবি-অস্মিতার প্রবেশ-প্রয়োগ, বাঙালি কবিতায় তো মাইকেল মধুসূদন দত্তের হৃদয়-মনীষা-হাত থেকেই ঝিনুকশরীর থেকে রত্নের মতো নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে এসেছে কিংবা তাঁর কবিতাদেহে আত্মার মতো লিপ্ত হ'য়ে আছে। অস্মিতার এই প্রয়োগে বিহারীলালকে তাঁরই আত্মীয় লাগে। কিন্তু এই অস্মিতাকে নির্বাপিত, বা অন্তত দমিত, ক'রে অপর-একটি স্রোতোরেখাও কি তখনই বেরিয়ে আসেনি—ভিজে সামাজিক বেদনা, রূঢ় সামাজিক ব্যঙ্গ, কঠিন সামাজিক বাস্তব : বেদনা-ব্যঙ্গ-বাস্তব ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যাচরণ থেকে ? আসলে বিহারীলাল চক্রবর্তী ও ঈশ্বর গুপ্ত থেকে আধুনিক বাংলা কবিতার যুগল ধারানদী উৎসারিত হ'য়ে এসেছে ; কখনো কোনো-কোনো কবির ভিতর তরঙ্গিনীযুগ পদ্মা-মেঘনার মতো মিশে গেছে ; বিমিশ্রণ মেনে—কোথাও দু-রঙা চিৎস্রোতেও-বা -বিভক্ত হ'য়ে গেছে ফের। স্মরণ্য অবশ্য : বিহারীলাল ও ঈশ্বর গুপ্তের মতো অপর-কোনো কবিকে অমন স্পষ্ট বিভাজনে ফেলা যায় না। অস্মিতার প্রশ্ন থেকেই জাগ্রত হয় দু-রঙা অন্তর্বৃতি-বহির্বৃতির সমস্যা। মাইকেলে বহুকথিত ক্লাসিকতা-রোম্যান্টিকতার সমস্যা—ফলত—অন্তর্বৃতি-বহির্বৃতিরই সমস্যা ; উনিবিংশ শতাব্দীর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুখ্যত অন্তর্বৃত্ত, বিংশ শতাব্দীর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলত বহির্বৃত ; তেমনি বহির্বৃতিপ্রধান হ'য়েও নজরুল ইসলামের একাংশ অন্তর্বৃত, যেমন অন্তর্বৃতিমুখ্য হ'য়েও জীবনানন্দের আধখানা বহির্বৃত। সেই মুখ্যের অনুসরণ করতে গিয়ে জীবনানন্দে লক্ষিতব্য ইএটস-কথিত 'প্রাতিস্বিক উচ্চারণে'-র প্রতি পাখ্যাবিস্তার। প্রাথম প্রাতিস্বিকতায় জীবনানন্দের কবি বেরিয়ে আসেন কএকটি মূর্তিমালিরিকে, "ধূসর পাণ্ডুলিপি" বস্তুত হৃদয়োম্ব ধূসর কিন্তু প্রাণগতিবান কবিতাগ্রন্থই ("ঝরাপালক" নয় ; কারণ : তা পূর্বজ কবিতাবলিরই অনুবর্তন, যদিচ সেই অনুবর্তিত ক্রমজমির ভিতরে কোথাও-কোথাও যেন আলের সীমা ভেঙে ফসল ফ'লে উঠেছে)। অনন্তর সব কবির আকাঙ্ক্ষার মতোই জীবনানন্দ চাইলেন ভিতরপ্রসার,—যার চাপে "ধূসর পাণ্ডুলিপি" কাব্যের 'নির্জন স্বাক্ষর' বা 'বোধ' কবিতার আমি 'মৃত্যুর আগে' বা 'ক্যাম্পে' কবিতার বহুবাচনিক আমরা-য় স্ফারিত হ'য়ে গেলো। যে-সমুদ্র দুলে উঠেছে "ধূসর পাণ্ডুলিপি" গ্রন্থে, বারংবার, ('সহজ', 'কয়েকটি লাইন', 'পরস্পর' প্রভৃতি) যেন সেই সমুদ্রচারণা শুরু হ'য়ে গেলো উত্তরবর্তী অজস্র কবিতাযাত্রায় ('বনলতা সেন', 'সুরঞ্জনা', 'সবিতা', 'সুচেতনা', 'সিন্ধুসারস' প্রভৃতি)। আসলে এ হচ্ছে হংসমুদ্রযাত্রা, এ হচ্ছে স্ববিস্তার। মনোবিদ্যার দিক থেকেও জীবনানন্দের মতো অন্তর্বৃত মানুষের এই স্ববিস্তারণপ্রয়াস অর্থগর্ভবতী। অথবা : একে বলা যেতে পারে, তিরিশেরই সমুদ্রযাত্রা ; কেননা জীবনানন্দের আত্মজগতে এইভাবে বহিঃপৃথিবী এসে উপস্থিত হয়েছিলো, পল্বলে জেগে উঠেছিলো কল্লোল। জীবনানন্দের মানসকক্ষে এইভাবে বহিঃপৃথিবী জগচ্চিত্র টাঙিয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু ততোক্ষণে আমি ও বিরুদ্ধ-আমির সংঘট্ট শুরু হ'য়ে গেছে। অতিঅন্তর্বৃত জীবনানন্দ mask হিশেবে নিলেন ইতিহাসচেতনা ; তাকেই ভরকেন্দ্র ক'রে তিনি প্রাতিস্বিকতা থেকে নৈর্ব্যক্তি-তে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। অথবা, ভিন্ন স্থাপনায়, ঐ ইতিহাসচেতনা হচ্ছে জীবনানন্দের বিরুদ্ধ-আমি, সমাজচেতনা হচ্ছে জীবনানন্দের বিরুদ্ধ-আমি। "ধূসর পাণ্ডুলিপি"-র কবি এই ভিতররাস্তা অতিক্রম ক'রে "সাতটি তারার তিমির"-এর বিশাল মহালে গিয়ে উঠলেন। যে-কবি একদিন আত্মপরিচয় দাখিল করেছিলেন : 'উৎসবের কথা আমি কহিনাকো ;/ পড়িনাকো ব্যর্থতার গান ;—/শুনি শুধু সৃষ্টির আহ্বান', তাঁকেও জ্ঞাপন করতে হয় : 'জীবনের ইতর শ্রেণীর মানুষ তো এরা সব ; ছেঁড়া জুতো পায়ে/বাজারের পোকাকাটা জিনিশের কেনাকাটা করে।'

এরই মধ্যবর্তী করিডোর ঐ "রূপসী বাংলা" : আনন ও মুখোশের

মধ্যকার নাট্যিক টেনশন থেকে জাত। মৃত্যুচেতনার আত্মআননে জীবনানন্দ পরিয়ে দিয়েছিলেন ঝাঁঝরা-ফোঁপরা স্বদেশের মুখ।[১] "ধূসর পাণ্ডুলিপি"-র প্রাতিস্বিক মরণমুদ্রা "রূপসী বাংলা"-র মুখে এইভাবে যেন চিহ্নাকীর্ণ হ'য়ে গেলো। উজ্জ্বল এক দীর্ঘশ্বাস, এক নস্টালজিয়া, "রূপসী বাংলা", প্রাক্তন ধূসরতাকে যেন রূপসী ক'রে তুললো। ইএটস যেমন একদিন আয়ার্ল্যাণ্ডের দেশপুরাণকে ব্যাপকগভীরভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন, জীবনানন্দ তেমনি "রূপসী বাংলা"-য় 'চারিদিকে বাঙালীর ভিড়/বহুদিন কীর্তন ভাসান গান রূপকথা যাত্রা পাঁচালীর/নরম নিবিড় ছন্দে' ক্বণিত-ঝঙ্কৃত ক'রে তুলেছেন। ঠিক শিক্ষিত লোকের নয়—বাংলার সব লোকজ কল্পকাহিনী ভিড় ক'রে এলো : ফড়িং-কাচপোকা-প্রজাপতি আর জাম-লিচু-কাঁঠালের উজ্জ্বল-চঞ্চল পটভূমিকায় আস্তীর্ণ হ'য়ে এলো লোককাহিনীর ধনপতি-শ্রীমন্ত-বেহুলা-লহনা আর রূপকথার কঙ্কাবতী-শঙ্খমালা-চন্দ্রমালা-মানিকমালা। সমস্তে জুড়ে রইলো—ইএটস-এর মতো নাট্যিক-কবির নয়—লিরিক-কবির এক স্বপ্নকল্পনা, এক বিষাদবাতাস। এবং এরই ভিতর দিয়ে জীবনানন্দ সম্পন্ন করলেন ইএটস-প্রোক্ত 'আধুনিক মানসের আত্ম-আবিষ্কার'।

উপর্যুক্ত বিস্তীর্যমানতা অতিসংবেদনশীল এই কবিমানসের ঘাস [২] থেকে নক্ষত্র পর্যন্ত বিহারে সূচিত হয়। জীবনানন্দের কবিতার এই মহাপৃথিবী-লোকে প্রয়াণ বাংলা কবিতায় তুলনা পায় একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মিকমানসিক বিশ্বপর্যটনে। কেবল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হৃদয়ারণ্য থেকে একদিন নিষ্ক্রমিত হ'য়ে গিয়েছিলেন ; আর জীবনানন্দের সমস্ত ভ্রমণ হৃদয়ের নীল-সবুজ পথরেখা ধ'রেই সম্পন্ন হয়। কেবল রবীন্দ্রনাথে দ্রষ্টব্য পথিকচিত্ততা ; আর জীবনানন্দে নাবিকবৃত্তি। অলঙ্কাররণনে জীবনানন্দ তাই সত্যেন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-নজরুলের সহোদর বটে ; কিন্তু মহাপার্থিব চেতনাপ্রসারে রবীন্দ্রনাথেরই আত্মীয় তিনি, যদিচ সেই চেতনা-প্রসারে যেতে তাঁর শরীর কাঁটায় ছিঁড়েখুঁড়ে রক্ত ক্ষরিত হ'য়ে আসে। দুই

[১] কখনো একটি সমগ্র দেশ বা জাতি আনন আবৃত করে মুখোশে। সবুজ বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে লাল-কালো ডোরা-কাটা একটি মুখোশ প'রে নেয়নি কি ?

[২] নজরুল রচেছিলেন : 'কেতকী-বধূ', 'পারুল-দিদি'। জীবনানন্দ "ঝরা পালকে" লিখেছিলেন : 'শকুন-বধূ', "মহাপৃথিবী"র 'ঘাস' কবিতায় লিখলেন : 'ঘাস-মাতা'।

ভিন্ন সময়পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান এই দুই অনন্তবিশ্বযাত্রীর হাতে-হাত ধ'রে দাঁড়ানোর ছবি :

যাত্রী (পরিশেষ) : রবীন্দ্রনাথ

যে-কাল হরিয়া লয় ধন
সেই কাল করিছে হরণ
সে ধনের ক্ষতি।
তাই বসুমতী
নিত্য আছে বসুন্ধরা।
একে একে পাখি গায়, গানের পসরা
কোথাও না হয় শূন্য,
আঘাতের অন্ত নেই, তবুও অক্ষুন্ন
বিপুল সংসার।
দুঃখ শুধু তোমার, আমার,
নিমেষের বেড়াঘেরা এখানে ওখানে।
সে-বেড়া পারায়ে তাহা পেঁছায় না নিখিলের পানে।
ওরে তুমি, ওরে আমি,
যেখানে তোদের যাত্রা একদিন যাবে থামি
সেখানে দেখিতে পাবি ধন আর ক্ষতি
তরঙ্গের ওঠানামা, একই খেলা, একই তার গতি।
কান্না আর হাসি
একই বীণাতন্ত্রীতারে একই গান উঠিছে উচ্ছ্বাসি,
একই শমে এসে
মহামৌনে মিলে যায় শেষে।
তোমার হৃদয়তাপ
তোমার বিলাপ
চাপা থাক আপনার ক্ষুদ্রতার তলে।
যেইখানে লোকযাত্রা চলে
সেখানে সবার সাথে নির্বিকার চলো এক-সারে,
দেখা দাও শান্তিসৌম্য আপনারে—
যে-শান্তি মৃত্যুর প্রান্তে বৈরাগ্যে নিভৃত,
আত্মসমাহিত ;

যাত্রী (শ্রেষ্ঠ কবিতা) : জীবনানন্দ

মনে হয় প্রাণ এক দূর স্বচ্ছ সাগরের কূলে
জন্ম নিয়েছিলো কবে ;
পিছে মৃত্যুহীন জন্মহীন চিহ্নহীন
কুয়াশার যে-ইঙ্গিত ছিলো—
সেইসব ধীরে-ধীরে ভুলে গিয়ে অন্য এক মানে
পেয়েছিলো এখানে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে—আলো জল আকাশের টানে,
কেন যেন কাকে ভালোবেসে।
মৃত্যু আর জীবনের কালো আর শাদা
হৃদয়ে জড়িয়ে নিয়ে যাত্রী মানুষ
এসেছে এ-পৃথিবীর দেশে ;
কঙ্কাল অঙ্গার কালি-চারিদিকে রক্তের ভিতরে
অন্তহীন করুণ ইচ্ছার চিহ্ন দেখে
পথ চিনে এ-ধুলোয় নিজের জন্মের চিহ্ন চেনাতে এলাম ;
কাকে তবু ?
পৃথিবীকে ? আকাশকে ? আকাশে যে সূর্য জ্বলে তাকে ?
ধুলোর কণিকা অণুপরমাণু ছায়া বৃষ্টি জলকণিকাকে ?
নগর বন্দর রাষ্ট্র জ্ঞান অজ্ঞানের পৃথিবীকে ?
যেই কুজ্ঝটিকা ছিলো জন্মসৃষ্টির আগে, আর
যে-সব কুয়াশা রবে শেষে একদিন
তার অন্ধকার আজ আলোর বলয়ে এসে পড়ে পলে-পলে ;
নীলিমার দিকে মন যেতে চায় ভেসে ;
সনাতন কালো মহাসাগরের দিকে যেতে বলে।
তবু আলো পৃথিবীর দিকে
সূর্য রোজ সঙ্গে ক'রে আনে

দিবসের যত
ধূলিচিহ্ন, যত কিছু ক্ষত
লুপ্ত হল যে-শান্তির অন্তিম তিমিরে ;
সংসারের শেষ তীরে
সপ্তর্ষির ধ্যানপূণ্য রাতে
হারায় যে-শান্তিসিন্ধু আপনারি অন্ত আপনাতে ;
যে-শান্তি নিবিড় প্রেমে
স্তব্ধ আছে থেমে,
যে-প্রেম শরীরমন অতিক্রম করিয়া সুদূরে
একান্ত মধুরে
লভিয়াছে আপনার চরম বিস্মৃতি।
সে পরম শান্তি-মাঝে হোক তব অচঞ্চল স্থিতি।

যেই ঋতু যেই তীর্থ যে-জীবন যেই মৃত্যু-রীতি
মহাইতিহাস এসে এখনও জানেনি যার মানে ;
সেদিকে যেতেছে লোক গ্লানি প্রেম ক্ষয়
নিত্য পদচিহ্নের মতো সঙ্গে করে ;
নদী আর মানুষের ধাবমান ধূসর হৃদয়
রাত্রি পোহালো ভোরে—কাহিনীর কতো শত ভোরে
নব সূর্য নব পাখি নব চিহ্ন নগরে নিবাসে
নব-নব যাত্রীদের সাথে মিশে যায়
প্রাণলোকযাত্রীদের ভিড় ;
হৃদয়ে চলার গতি গান আলো রয়েছে অকূলে
মানুষের পটভূমি হয়তোবা শাশ্বত যাত্রীর।

রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্যবান সরল বিশ্বাস যুগ্ম পঙক্তির মিলবিন্যাসেও দ্যোতিত; জীবনানন্দের বন্ধুর আস্থা মিলবিন্যাসের অনিয়মের মধ্য দিয়েও প্রকাশিত। রৈবিক উপান্ত্য পঙক্তির উপান্ত্য শব্দ 'স্থিতি' যেন মূলে বিশ্বাসের থাম-কে নিবিড় আশ্রয় দান করেছে ; যেমন অনেক কোণ-মোড়-বাঁক ঘুরে জীবনানন্দীয় ভিতরার্থ নিষ্কাশন 'মানুষের পটভূমি হয়তোবা শাশ্বত যাত্রীর' পঙক্তিবাক্যে হিরন্ময় : শেষ 'যাত্রীর' শব্দমিল 'ভিড়'-কে কেবল নয়—নিহিতার্থকেও আলিঙ্গন করেছে। অসমান অক্ষরবৃত্তে রচিত উভয় কবিতাই প্রাচ্য শান্তিপারাবারস্নাত।

প্রত্যেক কবি নিজের ভিতর দিয়ে একবার মানববাহিত আদ্যন্ত কাল পরিভ্রমণ ক'রে আসেন ; অতিজাগতিক ও মহাসমন্বয়বাহী একটি পৃথিবী কবির ভিতর দিয়ে অতিবাহিত হ'য়ে যায় যেন। জীবনানন্দেও মহাসমন্বয়-পরিভ্রমণের সেই পরিচিহ্ন পড়েছে : তার প্রান্তিক যুগ্ম উদাহরণ 'মাঠের নিস্তেজ রোদে নাচ হবে/শুরু হবে হেমন্তের নরম উৎসব।/হাতে হাত ধ'রে-ধ'রে গোল হ'য়ে ঘুরে-ঘুরে-ঘুরে' (অবসরের গান, ধূসর পাণ্ডুলিপি) যেন পৃথিবীর আদিমকালের ফসলোৎসব ; 'ওখানে চাঁদের রাতে প্রান্তরে চাষার নাচ হ'তো' (১৯৪৬-৪৭, শ্রেষ্ঠ কবিতা) সেই সুদূরাতীতের ফসলোৎসবের—তাঁর আপন কাব্যে উদ্‌যাপিতও বটে—স্মৃতিচারণার মতো মনে হয়।

মহাজাগতিক, মহাসময় বা অপর-সব জীবনানন্দীয় ভ্রমণ একটি শুদ্ধতার কেন্দ্র থেকে রওনা দ্যায় ; রবীন্দ্রনাথের মতো কল্যাণশীল নয় হয়তো, কিন্তু আত্মস্খালনকামী—এবং সেই আত্মস্খালনের মধ্য দিয়েই নিখিল-মূর্তি নিঃশব্দে তার দাবি পেশ করে ; জয়ী হয়। সেই শুদ্ধ কেন্দ্র কবিহৃদয়ের নান্দনিক বৃত্তচক্র—যেখানে এসে মেশে জীবনের স্বজ্ঞা-সমস্যা-সংবেদন, যে-শুদ্ধ চক্র থেকে ফোয়ারার মতো ছিটিয়ে পড়ে কবিতা চারপাশে : মহাজগৎ-মহাসময়ের প্রতি প্রতিন্যাস, সমাজ-রাজনীতির প্রতি প্রতিন্যাস, অস্তিত্ব ও চেতনার প্রতি প্রতিন্যাস, দীপ্তিভিক্ষা-অন্ধকারভিক্ষা—সমস্তই সেই শুদ্ধ কেন্দ্রনাভি থেকে উচ্ছৃত। কিন্তু সমগ্রে তলে-তলে ক্রিয়াশীল মধ্য সেই অন্তবৃ্ত

নদীর জলের ভিতর শম্বর, নীলগাই, হরিণের ছায়ার আসা-যাওয়া ;
একটা ধবল চিতল-হরিণীর ছায়া
আতার ধূসর ক্ষীরে-গড়া মূর্তির মতো
নদীর জলে
সমস্ত বিকেলবেলা ধ'রে
স্থির।

[আমাকে তুমি, বনলতা সেন]

এই-তো জীবনানন্দ, যিনি প্রত্যক্ষ দৃষ্টিস্থাপনা করেন না কিছুতেই—নদীজলের ভিতর দিয়ে লক্ষ্য করেন শম্বর-নীলগাই-হরিণের যাতায়াত, কিংবা চিতল-হরিণীর স্থিরমূর্তি। এই স্থৈর্য-চাঞ্চল্য নদীজলে নয়, কবির হৃদয়-দর্পণের মধ্য দিয়েই প্রতিফলন স্বীকার ক'রে নেয়। একদিন আলোচ্য আয়না ছিলো বিহারীলালেরও কাছে—কিন্তু অনচ্ছ কি ?—'অতি অপরূপ রূপ !/কেবল হৃদয়ে দেখি, দেখাইতে পারিনে' : "সাধের আসন"-এর উক্তি তুলে বিদ্রূপবঙ্কিত অর্থে তার প্রয়োগ সম্ভব। পক্ষান্তরে, জীবনানন্দীয় কাব্যের চরিতার্থতায় খুশি আমরা একে বলবো : হৃৎদর্পণের ব্যবহার।

২

বক্ষ্যমাণ শারীরপন্থী আলোচনা-চক্রেও শুদ্ধতার সূত্র সর্বাধিক প্রযোজ্য জীবনানন্দ দাশ সম্বন্ধেই : শুধু মাত্র কবিতা ও কবিতা-বিষয়ক ভাবনা-বেদনায় নিবেদিত এই কবি যেন কবিতাসুন্দরীর কাছেই আপাদমাথা বিক্রয়

ক'রে ব'সে আছেন। এবং সেই হৃদয়োথ কবিতায় এমন স্বাদ ফ'লে-ফুটে উঠলো যা "তিলোত্তমাসম্ভব" কাব্যের মতোই 'অভিনব' কিরীট প'রে নিতে পারতো মাথায়। অভিনব ; কেননা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত, বা এমনকি ঠাকুরোত্তর সেই প্রাথম তিন নিরুপম ত্রিজ—মোহিতলাল-যতীন্দ্রনাথ-নজরুল পর্যন্ত—কবিতার শাস্ত্রানুমোদিত আচরণই তৈরি হয়েছে : যেমন প্রসঙ্গে, তেম্নি প্রয়োগে। কবিতার অর্থেই, প্রাগ্বর্তী শ্রোণীভারাদলসগমনা অজস্র-অলংকার-শিঞ্জিত রমণীদের স্থানে এলো জীবনানন্দের গহনারিক্ত একালের মেয়ে : 'তোমার শরীর/তাই নিয়ে এসেছিলে একদিন' (১৩৩৩, ধূসর পাণ্ডুলিপি)। পূর্বোক্ত পঙক্তিতে বুদ্ধদেব বসু যে-বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন তা আসলে এতোকাল-প্রচলমান অভ্যস্ত পাঠকের নূতনে আশ্চর্যতা। ললিত-মধুর-মোহন শব্দপ্রয়োগে জীবনানন্দের অভ্যাসধারা মোহিতলাল-সত্যেন্দ্রনাথ-নজরুলের মতো হ'লেও তাঁর শব্দপ্রয়োগ কিছুতেই মোহিতলাল-সত্যেন্দ্রনাথ-নজরুলের অনুসরণ করেনি ; নিজের জন্যে বানিয়ে নিয়েছিলেন তিনি নব্য শব্দান্বয়—নূতন ললিত-মধুর-মোহন শব্দাবলি এনে ঘর সাজিয়েছিলেন। মোহিতলাল-সত্যেন্দ্রনাথ-নজরুলের কবিতার সময়-ভাষা থেকে জীবনানন্দের কবিতার সময়-ভাষা স্বাতন্ত্রিক হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলো ; খ্যাত-অখ্যাত অজস্র কবির ক্রমাগত ব্যবহারে ভাষা-নদী নিঃস্রোতা হ'য়ে পড়লে সময়েরই প্রয়োজনে শব্দের নবীন চরভূমি জেগে ওঠে ; এইভাবে মোহিতলাল-সত্যেন্দ্রনাথ-নজরুলের ললিত-মোহন-মধুর শব্দাবলি কবিতা-রঙ্গভূমি থেকে নেপথ্যনির্বাসনে গেলে জীবনানন্দ-বুদ্ধদেব বসু-অজিত দত্তের নব্য ললিত-মোহন-মধুর শব্দাবলি আদিম বিস্ময়ের প্রাণনা নিয়ে এসেছিলো একদিন। আবার : মোহিতলাল-যতীন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথ-নজরুলের কবিতা-নায়িকা থেকে জীবনানন্দের কবিতানায়িকা খুব স্বভাবীরকমেই পৃথক হ'য়ে গিয়েছিলো। তাই মোহিতলালের 'নির্ভাবনায় ঘুমাও তুমি, আমার স্বপন পাঠিয়ে দেবো তোমায়/আমায় তুমি হারাওনি তো! —সিঁদুর নিয়ে গেছ সিঁথির সীমায়' (মৃত প্রিয়া, বিস্মরণী) ও জীবনানন্দের 'শান্তি তবু : গভীর সবুজ ঘাস ঘাসের ফড়িং/আজ ঢেকে আছে তার চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ' (ধান কাটা হয়ে গেছে, বনলতা সেন) অভিন্ন মৃতা দয়িতার প্রতি আক্ষেপোক্তি হ'য়েও অভিন্ন শান্তিশিখা উঁচু ক'রে তুলে ধরলেও দুই আলাদা শামাদানে উজ্জ্বলন্ত।

আমরা দেখেছি বর্ণ- ও শব্দ-ব্যবহারে তাঁর সঞ্জীবনী সতর্কতা। মৃণালিনী ঘোষাল, বনলতা সেন, অরুণিমা সান্যাল, শেফালিকা বোস

প্রভৃতি নামশব্দ রূপাকাঙ্খীও বটে : বনলতা সেন নামের বনলতা-অংশ বা শেফালিকা বোস-এর শেফালিকা-অংশ ছবি ধরায়, অরুণিমা সান্যাল জ্যোৎস্নায় রক্তাভা জাগিয়ে দিয়ে যায়, মৃণালিনী ঘোষাল প্রবমান এক অদৃশ্য মৃণালে। একদিন এরকম শব্দসন্নিবেশ ছিলো যাঁর : 'ধূধূ মাঠ—ধানখেত——কাশফুল—বুনোহাঁস—বালুকার চর', (সেদিন এ ধরণীর, ঝরা পালক) তাঁর বিচ্ছিন্ন উদাহরণমালার একত্রসন্নিপাতে কেবল গ্রামীণতা থেকে শাহরিকতায় উত্তীর্ণ হওয়া নয়, আস্তিক সারল্য থেকে জটিলতার আয়তনে গ্রেফতার হওয়া : 'আমাদের আশা ভালোবাসা ব্যথা রণঘাঁড় সূর্যের ঘাঁড়/ চিন্তা বুদ্ধি চাকার ঘুরুনি গ্লানি দাঁতালো ইস্পাত' (পৃথিবীতে এই, শ্রেষ্ঠ কবিতা)। শব্দ, পঙক্তি ও স্তবকের আবৃত্ত ও পৌনঃপুনিক ব্যবহারে আচ্ছন্ন "ধূসর পাণ্ডুলিপি"—উপর্যুক্ত ব্যবহারে গীতলতা স্ফুট :

আমার পায়ের তলে ঝ'রে যায় তৃণ
তার আগে এই রাত্রিদিন
পাড়িতেছে ঝ'রে।
এই রাত্রি,—এই দিন রেখেছিলে ভ'রে
তোমার পায়ের শব্দে,—শুনেছি তা আমি।
কখন গিয়েছে তবু থামি
সেই শব্দ। —গেছ তুমি চ'লে
সেই দিন—সেই রাত্রি ফুরায়েছে ব'লে।
আমার পায়ের তলে ঝরে নাই তৃণ,—
তবু সেই রাত্রি আর দিন
প'ড়ে গেল ঝ'রে।
সেই রাত্রি—সেই দিন—তোমার পায়ের শব্দে রেখেছিলে ভ'রে।

[১৩৩৩, ধূসর পাণ্ডুলিপি]

এরকম ক্রমাগত-আবৃত্ত শব্দ-বাক্য-স্তবকে "ধূসর পাণ্ডুলিপি" ভরপুর গীতলতায় ও কণ্ঠকোমলতায়।[৩] স্মরণীয় : এ পর্যায়ে কীটসীয় রোম্যা-

[৩] কীটস-এর 'To Autumn' কবিতায় 'soft' শব্দের তিনবার ব্যবহারের (ক. 'Thy hair soft-lifted by the winnowing wind'; খ. 'soft-dying day'; গ. '..With treble soft/the redbreast whistles...') সঙ্গে জীবনানন্দের 'অবসরের গান' কবিতায় 'নরম' শব্দের ত্রয়ী প্রয়োগ (ক. 'হেমন্তের নরম উৎসব'; খ. 'রোদের নরম রং'; গ. 'নরম রাতের হাতে') তুলনীয়।

ণ্টিকতা দখল রেখেছে জীবনানন্দে ;—উত্তরকালে জীবনানন্দে ঘটেছে কীটসীয় রোম্যাণ্টিকতা থেকে ইএটসীয় অর্থময়তায় উত্তরণ। তবু-নামক অব্যয়-শব্দটি জীবনানন্দের কবিতার বিষয়নাভির মতো ('পৃথিবীর গভীর গভীর-তর অসুখ এখন ;/মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে।'—সুচেতনা)। 'উপমাতেই কবিত্ব' জীবনানন্দের এই এ্যারিস্টটলীয় সিদ্ধান্তের পটপরিসরে তাঁর কবিতাস্থাপন করা যেতে পারে। তাঁর অবিরল উপমাপ্রয়োগের এক-পাশে আছে নূতন দৃষ্টিগ্রাহ্য উপমা ;[৪] অপর-পাশে আত্মিক উপমা—যার সৃজনে বাংলা কবিতাবহে জীবনানন্দ একক ও তুলনাহীন[৫] : রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-মোহিতলাল-সত্যেন্দ্রনাথের উপমার তুলনায় জীবনানন্দের এই আত্মিক উপমারাশির বিশিষ্টতার প্রদীপন হবে। অথচ যে-সাহজিক সাধনা ইএটস-এর কাব্যে দ্রষ্টব্য, জীবনানন্দে তার স্থান করেছে স্বসমুত্থ উৎসারণ। স্বতঃস্ফূর্তির এই সাক্ষ্য রয়েছে কবির অন্ত্যামিলবিন্যাসে : অধিকাংশ ক্ষেত্রে

[৪] ক. বরফের মতো চাঁদ ঢালিছে ফোয়ারা [মাঠের গল্প : পেঁচা, ধূ. পা.] ; খ. নিশীথের সমুদ্রের মতো চমৎকার [অনেক আকাশ, ধূ. পা.] ; গ. করুণ শঙ্খের মতো স্তন [এ-সব কবিতা আমি, রূ. বা.] ; ঘ. নরম জামের মতো চুল তার, ঘুঘুর বুকের মতো অস্ফুট আঙুল [এইসব ভালো লাগে, রূ. বা.] ; ঙ. খর-রৌদ্রে পা ছড়িয়ে বর্ষীয়সী রূপসীর মতো ধান ভানে—/গান গায়—গান গায়/এই দুপুরের বাতাস [আমাকে তুমি, ব. সে.] ; চ. সিংহের হুংকারে উৎক্ষিপ্ত হরিৎ প্রান্তরের অজস্র জেব্রার মতো [হাওয়ার রাত, মহাপৃথিবী] ; ছ. মিলনো-ন্মত্ত বাঘিনীর গর্জনের মতো অন্ধকারের চঞ্চল বিরাট সজীব রোমশ উচ্ছ্বাস [হাওয়ার রাত, মহাপৃথিবী] ; জ. কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলো [ঘাস, মহাপৃথিবী] ; ঝ.বেতের ফলের মতো ম্লান চোখ [হায় চিল, মহাপৃথিবী] ; ঞ. শিঙের মতন বাঁকা নীল চাঁদ [শঙ্খমালা, মহাপৃথিবী]।

[৫] ক. তাই রাখিয়াছি ঢেকে পাখির মায়ের মতো প্রেম এসে আমাদের বুকে [প্রেম, ধূ. পা.] ; খ. পাখির নীড়ের মতো চোখ [বনলতা সেন, ব. সে.] ; ঘ. চারি-দিকে রাত্রি নক্ষত্রের আলোড়ন এখন দয়ার মতো [শিরীষের ডালপালা, ব. সে.] ; ঙ. তোমারে খুঁজেছি আমি নির্জন পেঁচার মতো প্রাণে [শঙ্খমালা, মহাপৃথিবী] ; চ. আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মতো অন্ধকার [নগ্ন নির্জন হাত, মহাপৃথিবী] ; ছ. শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো (আগুন) [শিকার, মহাপৃথিবী] ; জ. হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো [হাজার বছর শুধু খেলা করে, মহাপৃথিবী] ; ঝ. উটের গ্রীবার মতো কোনো-এক নিস্তব্ধতা [আট বছর আগের একদিন, মহাপৃথিবী] ; ঞ. নিমীল আগুনে ওই আমার হৃদয়/মৃত এক সারসের মতো [একটি কবিতা, সা. তা. তি.] ; ট. শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা [বনলতা সেন, ব. সে.]।

মিলের অনিয়মিতিকেই নিয়মে দাঁড় করিয়ে নিয়েছেন তিনি—স্বস্বভাবী এই মিলপদ্ধতি অনেক জায়গায় দুই লাইনে স্তব্ধ হ'য়ে যায়নি, তিন লাইনের ত্রিত্ব মিলে পর্যবসান মেনেছে যদিচ কোনো নিয়ম সৃষ্টি না-ক'রে [৬] ("বনলতা সেন"-এর 'অবশেষে' কবিতায় দ্বিত্ব মিল—প্রায় অকারণেই যেন—মাঝামাঝি হঠাৎ ব্যতিক্রান্ত হ'য়ে তিন লাইনের মিল তৈরি করেছে)। অথচ এরই ভিতরে কোথাও-কোথাও অনুসৃত মিলবিন্যাসের দৃঢ় রীতি ; কিন্তু কিরকম আচ্ছাদ প'ড়ে থাকে যেন তার উপরে ('মৃত্যুর আগে', 'বনলতা সেন', 'তুমি', 'সুরঞ্জনা', 'একটি কবিতা'-র দ্বিতীয়াংশ, 'রাত্রি', 'হাঁস', প্রভৃতি)। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামণ্ডল থেকে নিঃসৃত হ'য়ে এসেছে তাঁর কবিতা। তার সাক্ষ্য তুলে ধরি এখানেই। 'কোটি-কোটি শুয়রীর প্রসববেদনার আড়ম্বর', (অন্ধকার, বনলতা সেন)—এর উপস্থাপনা বাস্তব সত্য হিশেবেই : এক বন্ধুর মুখে শুনেছি। 'অথবা আশ্চর্য হংসী অব্যর্থ ডানার অসংযমে/নির্ঝরের কোনো-এক রুপালি শল্কের দ্রুত মাছকে প্রণয়ী বলে ভেবেছিলো ভ্রমে ;/আজো ভাবে ; বরফের মতো শাদা ডানা নিয়ে পিঙ্গল ঢেউয়ের পিঠে চ'ড়ে/যখন সে তীর খেয়ে—অথবা রক্তের হর্ষে সৌরপৃথিবীর মতো ঘোরে' (শিল্পী, বিংশ শতাব্দী, পৌষ ১৩৬৮—) বন্দুকের গুলির আঘাতে আর্ত ঘূর্ণ্যমান হংসপাখি নিজের চোখে না-দেখলে কি এই উক্তির নিহিতার্থ খুলে যেতো আমার কাছে ? আছে আরো : উৎপ্রেক্ষা (১. যেন কোন মায়াবীর নষ্ট ইন্দ্রজাল/কাঁদিতেছে ছিঁড়ে গিয়ে।—অনেক আকাশ ; ২. নক্ষত্রের রাতের আঁধারে/বিরাট নীলাভ খোঁপা নিয়ে যেন নারী মাথা নাড়ে।—শব), অনুপ্রাস (হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা।—মৃত্যুর আগে), নরত্বারোপ (শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে।

---

[৬] ক. সকল পড়ন্ত রোদ চারিদিকে ছুটি পেয়ে জমিতেছে এইখানে এসে,/গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে চোখের ঘুমের গান আসিতেছে ভেসে,/এখানে পালঙ্কে শুয়ে কাটিবে অনেকদিন জেগে থেকে ঘুমাবার সাধ ভালোবেসে। [অবসরের গান, ধূ. পা.] ; খ. ওইদিকে শোনা যায় সমুদ্রের স্বর/স্কাইলাইট মাথার উপর/আকাশে পাখিরা কথা কয় পরস্পর। [পাখিরা, ধূ. পা.] ; গ. —যেন কোনো দূর থেকে অস্পষ্ট বাতাস/বাঘের ঘ্রাণের মতো হৃদয়ে জাগায়ে যায় ত্রাস ;/চেয়ে দ্যাখে ইহাদের পরস্পর নীলিম বিন্যাস/নড়ে ওঠে ত্রস্ততায়।"[অবশেষে, ব. সে.] ; ঘ. তবুও তে পেঁচা জাগে/গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে/আরেকটি প্রভাতের ইশারায়—অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে। [আট বছর আগের একদিন, মহাপৃথিবী] ; ঙ. তোমার হৃদয় আজ ঘাস :/বাতাসের ওপারে বাতাস—/আকাশের ওপারে আকাশ। [আকাশলীনা, সা. তা. তি·]।

—অবসরের গান)। আর চিত্রকল্প ? কথা বললেই তিনি চিত্রকল্পের ইন্দ্রজাল সৃজিত হ'য়ে যায়। আছে কল্পনার সর্বমুখ সচ্ছলতা : পরাবাস্তবতার ব্যবহার, কবিতাসত্যের ব্যবহার। তাঁর কল্পনাকৌশলের অপর-এক সাক্ষ্য নিবেদন করতে চাই এখানেই। মরণমুদ্রা জীবনানন্দের কবিতার প্রথম থেকে শেষাবধি স্বাক্ষরিত। 'মৃত্যুই অনন্ত শান্তি হ'য়ে/অন্তহীন অন্ধকারে আছে' এই সিদ্ধান্তলেখ জীবনানন্দ বহুবার ব্যক্ত করেছেন। 'অন্ধকার' ও 'স্বপ্নের ধ্বনিরা' কবিতায় তিমির ও স্তব্ধতা ভিক্ষা ও আকাঙ্ক্ষা করেছেন। একদিন—যে তিনি প্রকল্পনার শরণ নিয়েছিলেন, তা ব্যথা-বিয়োগ-বাস্তবের কাছে গভীর মার খেয়েই। তাঁর মতো অপর-কোনো বাংলা কবি মরণাধিকৃত নন। এই মরণকল্পনা মরণচেতনার প্রাথমিক স্তর পরিত্যাগ ক'রে অপর-এক স্তরে আমগ্ন : মৃত্যুত্তীর্ণ সেই মজ্জমান অনুভূতিলোক থেকে কবিতা তাঁর নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে এসেছে—জীবনে থেকে যেখানে তিনি জীবনান্তের কল্পনাকে কল্পনা করেছেন : সেই আয়নার ভিতরকার আয়না থেকে প্রতিফলিত চিত্র :

১. কি যেন কখন আমি মৃত্যুর কবর থেকে উঠে আসিলাম
আমারে দিয়েছে ছুটি বৈতরণী নদী
শকুনের মতো কালো ডানা মেলে পৃথিবীর দিকে উড়িলাম
সাত-দিন সাত-রাত উড়ে গেলে সেই আলো পাওয়া যায় যদি
পৃথিবীর আলো প্রেম ?
আমারে দিয়েছে ছুটি বৈতরণী নদী।

[বৈতরণী]

২. কুয়াশা হতাশা নিয়ে স'রে আমি আসি নাই পৃথিবীর থেকে :—
তোমারে দেখেছি আমি পৃথিবীতে—নতুন নক্ষত্র আমি ঢের
আকাশে দেখেছি তাই—

[পৃথিবীতে থেকে]

৩. ভেবে ভেবে ব্যথা পাবো :—মনে হবে, পৃথিবীর পথে যদি থাকিতাম বেঁচে
দেখিতাম সেই লক্ষ্মীপেঁচাটির মুখ যারে কোনোদিন
ভালো করে দেখি নাই আমি—

[ভেবে-ভেবে ব্যথা পাবো]

আবৃত্তপদ, গীতলতা, চিত্রলতা—সব ক্রমশ স্তিমিত-শমিত হ'য়ে এসেছে জীবনানন্দের কবিতাধারায়। এ শুধুমাত্র বহিঃসময়প্রভাবের ফল নয় ; কবির

অন্তঃসময়সম্পাতীও বটে : বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে কবি-অনুভূতির শবলিত ইন্দ্রধনু এক-একটি রঙ ঝরিয়ে দিচ্ছিলো যেন। দেখা দিয়েছে ইংরেজি শব্দ-ব্যবহার, কবিতার বাণীবিন্যাসে গদ্যভঙ্গি। প্রাগোদ্ধৃত "ধূসর পাণ্ডুলিপি" গ্রন্থের '১৩৩৩' শীর্ষক কবিতার পাশে অন্ত্যপর্যায়ের একটি কবিতাংশের স্থাপনা যদি করি :

> সৃষ্টির মনের কথা মনে হয়—দ্বেষ।
> সৃষ্টির মনের কথা : আমাদেরি আন্তরিকতাতে
> আমাদেরি সন্দেহের ছায়াপাত টেনে এনে ব্যথা
> খুঁজে আনা। প্রকৃতির পাহাড়ে পাথরে সমুচ্ছল
> ঝর্ণার জল দেখে নিহত প্রাণীর রক্তে লাল
> হ'য়ে আছে ব'লে বাঘ হরিণের পিছু আজো ধায় ;
> মানুষ মেরেছি আমি—তার রক্তে আমার শরীর
> ভ'রে গেছে ;
>
> [১৯৪৬-৪৭, শ্রেষ্ঠ কবিতা]

প্রাক্তন সুররণন উড়ে-যাওয়া উক্ত কবিতাংশকে প্রায় গদ্যে রূপান্তরিত ক'রে ফেলা যায় :

> সৃষ্টির মনের কথা মনে হয়—দ্বেষ। সৃষ্টির মনের কথা : আমাদেরি আন্তরিকতাতে আমাদেরি সন্দেহের ছায়াপাত টেনে এনে ব্যথা খুঁজে আনা। প্রকৃতির পাহাড়ে পাথরে সমুচ্ছল ঝর্ণার জল দেখে নিহত প্রাণীর রক্তে লাল হ'য়ে আছে ব'লে বাঘ হরিণের পিছু আজো ধায় ; মানুষ মেরেছি আমি—তার রক্তে আমার শরীর ভ'রে গেছে ;

—বিচিত্রবিধ উক্ত উচ্চারণাবলির মধ্য দিয়ে উচ্ছ্রিত হ'য়ে আছে কবি জীবনানন্দ দাশের বাণী : 'অসম্ভব বেদনার সাথে মিশে র'য়ে গেছে অমোঘ আমোদ' ॥

[১৯৭২]

বর্ণ

জাঁ আর্তুর র‍্যাঁবো, সেই ফরাশি কবি-কিশোর, তাঁর ‘স্বরবর্ণ’ সনেটটি স্মরণে উঠে আসছে। এক-একটি স্বরবর্ণে তিনি দেখেছিলেন অমেয় বিভূতি—রূপের অসীমা। রূপ কি কেবল স্বরবর্ণেই সংগুপ্ত, বা প্রকাশমান?—আমরা এই জিজ্ঞাসা তুলে ধরতে পারি। জিজ্ঞাসার অনন্তরে জবাব ব’য়ে নিয়ে আসি : বিভা প্রতি বর্ণে বিচ্ছুরিত, এক-একটি বর্ণ অনন্ত ঐশ্বর্যের অতিক্ষুদ্র আশ্চর্য আধার।

১

জীবনানন্দ দাশ, যাঁর কবিতার ছত্রে-ছত্রে রূপের প্রতি সম্মান প্রকাশিত, স্বাভাবিকভাবে ঐ বর্ণময় বর্ণের দ্যুতিময়তা আরাধ্য হবে তাঁর। তাঁর যাবতীয় কবিতায় উপর্যুক্ত মর্যাদা রক্ষিত ; বিশেষত রূপবান কবিতানিচয়ে কএকটি উজ্জ্বল-কোমল বর্ণ ব্যবহৃত। কবির বিভিন্ন কাব্যপর্যায় থেকে উপর্যুক্ত রূপবান কবিতার একটি চয়নিকা তৈরি করলে স্পষ্ট হ’য়ে উঠবে সাক্ষ্য।

“ধূসর পাণ্ডুলিপি” গ্রন্থভুক্ত ‘মৃত্যুর আগে’ কবিতায় রূপের—পার্থিব রূপের প্রতি ভালোবাসা অতিসূক্ষ্ম স্তরগ্রামে ধরা পড়েছে। ‘চিত্ররূপময়’ এই রবীন্দ্রোক্তির উদাহরণস্বরূপ যে স্তবকদ্বয় বহুউদ্ধৃত, তার বিশ্লেষণ করা যাক : দেখা যাবে চ, জ, শ এই উজ্জ্বলতাজ্ঞাপক ও ন, ম, ল এই কোমলতাবোধক বর্ণগুলির জীবনানন্দীয় মর্যাদাদান :

১. দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ — জ-১ ল-১
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা — জ-২ ল-৬
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ, — শ-২ ম-৪

চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হ'য়ে ঝ'রেছে দুবেলা   ত-১ ল-২
নির্জন মাছের চোখে ;   জ-১ ম-১ চ-১ ন-১

২. মিনারের মতো মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে,
ম-৩ চ-১ ন-৩ জ-১ ল-৩
বেতের লতার নিচে চড়ুয়ের ডিম যেন নীল হ'য়ে আছে, চ-২ ন-২ ল-২
নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বারবার তীরটিরে মাখে   ন-২ জ-১ ম-১
খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নার উঠানে পড়িয়াছে,
চ-১ ন-১ ল-১ জ-১
বাতাসে ঝিঁঝিঁর গন্ধ—বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে ;
শ-১ জ-১
নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্খায় নেমে আসে ; ন-৫ ল-১

ছয়টি বর্ণের উপর্যুপরি প্রয়োগ স্তবকদ্বয়কে ক'রে তুলেছে কোমল-উজ্জ্বল। "বনলতা সেন" কবিতাগ্রন্থের 'তুমি' কবিতার একটি স্তবক পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক : কবিতাটির পটভূমি তারা-খচিত রাত্রির দীপ্তাকাশ :

নক্ষত্রের চলাফেরা ইশারায় চারিদিকে উজ্জ্বল আকাশ ;
শ-২ চ-২ জ-১ ন-১
বাতাসে নীলাভ হ'য়ে আসে যেন প্রান্তরের ঘাস ;   ন-২ ল-১
কাঁচপোকা ঘুমিয়েছে—গঙ্গাফড়িং সে-ও ঘুমে ;   ম-২
আম নিম হিজলের ব্যাপ্তিতে প'ড়ে আছো তুমি।   ম-৩ ল-১

"মহাপৃথিবী" কবিতাগ্রন্থের 'হাওয়ার রাত' কবিতা থেকে তিনটি উদ্ধার :

১. অন্ধকার রাতে অশ্বত্থের চূড়ায় প্রেমিক চিলপুরুষের   শ-৩ চ-৩
শিশির-ভেজা চোখের মতো ঝলমল করছিলো সমস্ত নক্ষত্রেরা। ম-৪

২. জ্যোৎস্নারাতে বেবিলনের রানির ঘাড়ের ওপর চিতার   জ-৫ চ-২
উজ্জ্বল চামড়ার শালের মতো জ্বলজ্বল করছিলো বিশাল আকাশ।
শ-৩ ম-১

৩. যে-রূপসীদের আমি এশিরিয়ায়, মিশরে, বিদিশায় ম'রে যেতে দেখেছি
কাল তারা অতি দূর আকাশের সীমানার কুয়াশায়-কুয়াশায়   শ-৭ ম-৩
দীর্ঘ বর্শা হাতে ক'রে কাতারে-কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে যেন।

শেষোক্ত কবিতাগ্রন্থের 'শিকার' কবিতা থেকে উজ্জ্বলতাবোধক তিনটি অংশ উৎকলন করলুম :

১. মিশরের মানুষী তার বুকের থেকে যে-মুক্তা আমার নীল মদের
শ-২ ম-৭
গেলাসে [১] রেখেছিলো হাজার-হাজার বছর আগে এক রাতে—
ন-৪ ল-৩ জ-৩
তেম্নি—তেম্নি একটি তারা আকাশে জ্বলছে এখনও।
২. হিমের রাতে শরীর 'উম' রাখবার জন্যে দেশোয়ালীরা সারারাত
শ-৪ জ-৩ ম-৬
মাঠে আগুন জেলেছে—মোরগ ফুলের মতো লাল আগুন ; শুকনো
ল-৪ ন-২
অশ্বত্থ পাতা দুমড়ে এখনও আগুন জ্বলছে তাদের।
৩. সকালের আলোয় টলমল শিশিরে চারিদিকের বন ও আকাশ ন-৩ জ-১
ল-৭ শ-৩ ম-৩
ময়ূরের সবুজ নীল ডানার মতো ঝিলমিল করছে। ন-৩ জ-১

২

যুক্তবর্ণের বিরলতা জীবনানন্দ দাশের কবিতার অপর-একটি সাধারণ লক্ষণ। তাঁর টানা ও এলানো ভঙ্গিতে এই যুক্তবর্ণবিরলতা একটি সুর সৃজন করেছে ; এমনকি যুক্তবর্ণকে তিনি অনেক সময় ভেঙে স্বতন্ত্র বর্ণ হিশেবে ব্যবহার করেছেন তাঁর কবিতায় : এটা তাঁর শ্রুতিবিশুদ্ধতাই প্রমাণ করে।[২] এই দিক থেকে তাঁর কবিতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বা কবির সমকালীন সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বিপ্রতীপ।

বৈদেহী বিচিত্রা আজি সংকুচিত শিশিরসন্ধ্যায়[৩]
প্রচারিল আচম্বিতে অধরার অহেতু আকৃতি :

[১] হয়তো পরবর্তী সংস্করণ সম্ভব হ'লে কবি নিজেই এই বানান শোধন ক'রে লিখতেন : 'গেলাশ'। তা না-হ'লেও এই বানানে পাই তালব্য শ-এরই অভিঘাত।
[২] পরবর্তী ছন্দ বিষয়ক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।
[৩] সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র 'শিশিরসন্ধ্যায়' ও জীবনানন্দ দাশের 'শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে' বস্তুত একই শব্দগুচ্ছ নিয়ে রচিত ভিন্ন দুজন কবির বাক-রীতির উজ্জ্বল সাক্ষ্য-স্বরূপ।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের এই পঙক্তিযুগে যুক্তবর্ণের ধ্বনি বেজে চলেছে যেমন, তেমনি যুক্তবর্ণবিরলতার মধ্য দিয়ে অন্য-একটি সুর সৃজন করেছেন জীবনানন্দ। একটি ক্ষুদ্র কবিতা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করি :

হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে-উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে।
তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে ;
পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চ'লে গেছে রূপ নিয়ে দূরে ;
আবার তাহারে কেন ডেকে আনো ? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে
বেদনা জাগাতে ভালোবাসে !
হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর উড়ে-উড়ে কেঁদোনাকো ধানসিড়ি নদীটির পাশে।

মাত্র দু-টি যুক্তবর্ণময় শব্দ—'কান্না' ও 'রাজকন্যা'—ব্যবহার করা হয়েছে এখানে। ফলে, কবিতাটির সুরের মধ্য দিয়ে যেন চিলের করুণ ক্রন্দন ক্বণিত হ'য়ে উঠেছে।

বর্ণ ব্যবহারের উক্ত দুই রূপ জীবনানন্দের চিত্রলতা ও গীতিলতার কেন্দ্রোৎস। অপরাপর বিচিত্রবিধ কুশলতাও-যে উপস্থিত, সে তো বলা বাহুল্য ॥

[১৯৭১]

শ ব্দ

সুন্দরতম শব্দাবলির সুন্দরতম বিন্যাস—কবিতার এই সংজ্ঞা অসম্পূর্ণ ; কবিতা শব্দোত্তর আরো-কিছু। তথাচ, শব্দ কবিতার এক অত্যুজ্জ্বল দিক : —তার আলোচনায় খুলে যেতে পারে একজন কবির বিশিষ্টতা, একটি কাব্যস্বভাব।

"ঝরা পালক" পর্বে জীবনানন্দ দাশ সত্যেন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-নজরুলের দ্বারা আশ্লিষ্ট হয়েছিলেন, তুলনায় রবীন্দ্রসান্নিহিত বিরল। এর কারণ : জীবনানন্দ প্রথমাবধি রূপতৃষ্ণার্ত ;—এবং সত্যেন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-নজরুলে এই রূপান্বেষণের রীতি বদলে গিয়েছিলো নিজস্বের মুদ্রাচিহ্নিত হ'য়ে উঠেছিলো "ধূসর পাণ্ডুলিপি" থেকেই ; কিন্তু বাংলা রূপান্বেষী কবিদের তালিকায় সত্যেন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-নজরুলের পরেই জীবনানন্দের অবস্থান। শব্দ রূপার্ত কবির রঙ্‌-ধরানোর অস্ত্র এক—যদিচ নির্বস্তুক ; মালার্মে-র শিল্পীবন্ধু ঐ নির্বস্তুক শব্দে প্রাকৃতিক রূপাঙ্কন কিভাবে সম্ভব হয় তাতে যে-বিস্ময়প্রকাশ করেছিলেন কবি বাদে অন্য সকলের কাছে তা স্বাভাবিক ও সংগত প্রশ্ন। স্মরণীয় : জীবনানন্দের চয়নিকায় ছিলো ললিত, মধুর, রঙিন শব্দ—কেবল তার বিন্যাস সত্যেন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-নজরুল থেকে আলাদা ও নিজস্ব। এই পৃথকতার মূল অবশ্য বিভিন্ন বিষয়প্রবেশের কারণে।

১. ডালপালাতে বৃষ্টি পড়ে, শব্দ বাড়ে ঘিড়ক-ঘিড়,
লক্ষ্মী দেবীর সামনে কারা হাজার হাতে খেলছে কড়ি !
হঠাৎ গেল বন্ধ হ'য়ে মধ্যিখানে নৃত্য খেলা,
ফেঁসে গেল মেঘের কানাৎ উঠল জেগে আলোর মেলা।
কালো মেঘের কোলটি জুড়ে আলো আবার চোখ চেয়েছে !
মিশির জমী জমিয়ে ঠোঁটে শরৎ রাণী পান খেয়েছে !

মেশামিশি কান্নাহাসি, মরম তাহার বুঝবে বা কে !
এক চোখে সে কাঁদে যখন আরেকটি চোখ হাসতে থাকে !

[চিত্র-শরৎ, কাব্যসঞ্চয়ন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত]

২. সেদিন বরষা-রাতি,
ঘনঘোর মেঘে জ্যোৎস্না ডুবেছে, বাতাসে নিবেছে বাতি।
সাঁই-সাঁই করে' গাছের পাতায় থেকে থেকে নামে জল,
কখনো মেঘের আড়ালে ফুটিছে চন্দ্রিকা সুবিমল।
বাতায়ন-পথে মাঠ-ঘাট-বাট যতদূর যায় দেখা—
সকলেরি পরে ছায়া-আলোকের সজল চিত্র-লেখা।...
একবার ফিরে' চাহিয়া দেখিনু প্রিয়া ঘেঁষে আছে শুয়ে,
কঠিন কেয়ূর বাজিছে পারশে, মুখখানি আছে নুয়ে।

[শ্রাবণ-রজনী, স্বপন-পসারী, মোহিতলাল মজুমদার]

৩. শূন্য ছিল নিতল দীঘির শীতল কালো জল,
কেন তুমি ফুটলে সেথা ব্যথার নীলোৎপল ?
আঁধার দীঘির রাঙলে মুখ,
নিটোল ঢেউএর ভাঙলে বুক,—
কোন্ পূজারী নিল ছিঁড়ে ? ছিন্ন তোমার দল
ঢেকেছে আজ কোন্ দেবতার কোন্ সে পাষাণ-তল ?

[চৈতী হাওয়া, ছায়ানট, নজরুল ইসলাম]

এরই পার্শ্বে স্থাপন করা যাক আমাদের আলোচ্য কবিকে :

ধান কাটা হ'য়ে গেছে কবে যেন—ক্ষেতে মাঠে পড়ে আছে খড়
পাতা কুটো ভাঙা ডিম—সাপের খোলস নীড় শীত।
এইসব উৎরায়ে ঐখানে মাঠের ভিতর
ঘুমাতেছে কয়েকটি পরিচিত লোক আজ—কেমন নিবিড়।
ঐখানে একজন শুয়ে আছে—দিনরাত দেখা হত কত কত দিন,
হৃদয়ের খেলা নিয়ে তার কাছে করেছি যে কত অপরাধ ;
শান্তি তবু : গভীর সবুজ ঘাস ঘাসের ফড়িং
আজ ঢেকে আছে তার চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ।

[ধান কাটা হয়ে গেছে, বনলতা সেন, জীবনানন্দ দাশ]

১
উপর্যুক্ত জীবনানন্দীয় আলাদা বিন্যাসের দুটি উপকরণ লভ্য ক্রিয়াবাচক শব্দ ও বিশেষণ শব্দের নূতন ও বিস্ময়কর ব্যবহারে। বাংলা ক্রিয়াপদের দীনতা, অন্তত এই একজন কবি, খানিকটা ঘুচিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কএকটি দৃষ্টান্ত দাখিল করা হ'লো :

১. কতোবার চাঁদ আর তারা
মাঠে-মাঠে **ম'রে** গেলো।

[পঁচিশ বছর পরে : মাঠের গল্প, ধূসর পাণ্ডুলিপি]

২. যদি আমি **ঝ'রে** যাই একদিন কার্তিকের নীল কুয়াশায়

[যদি আমি ঝ'রে যাই, রূপসী বাংলা]

৩. চেয়ে দেখি নির্জন আমোদে
পৃথিবীর রাঙা রোদ **চড়িতেছে** আকাঙ্ক্ষায় চিনিচাঁপা গাছে।

[কখন সোনার রোদ, ঐ]

৪. চোখের উপরে
রাত্রি **ঝরে**।

[উন্মেষ, সাতটি তারার তিমির]

৫. যোদ্ধা—জয়ী—বিজয়ীর পাঁচ ফুট জমিনের কাছে—পাশাপাশি—
জিতিয়া রয়েছে আজ তাদের খুলির অট্টহাসি।

[অবসরের গান, ধূসর পাণ্ডুলিপি]

৬. কে হায় হৃদয় **খুঁড়ে** বেদনা জাগাতে ভালোবেসে।

[হায় চিল, মহাপৃথিবী]

৭. ঘরের ভিতর থেকে **খ'সে** গিয়ে সন্ততির মন

[বিভিন্ন কোরাস, সাতটি তারার তিমির]

৮. **ভেঙে** যাই,—**নিভে** যাই,—আমরা চলিতে গিয়ে-গিয়ে।

[প্রেম, ধূসর পাণ্ডুলিপি]

৯. শরীর **ছিঁড়িয়া** গেছে,—হৃদয় **পড়িয়া** গেছে ধ্ব'সে।

[জীবন, ঐ]

১০. শেষ ট্রাম **মুছে** গেছে, শেষ শব্দ, কলকাতা এখন

[একটি নক্ষত্র আসে, শ্রেষ্ঠ কবিতা]

দেশজ শব্দ ব্যবহারে যেমন তেমনি দেশজ ক্রিয়াপদ প্রয়োগেও কবি শিল্পদক্ষ :

১. হেমন্ত বিয়ায়ে গেছে শেষ ঝরা মেয়ে তার
শাদা মরা শেফালির বিছানার 'পর।

[অবসরের গান, ধূসর পাণ্ডুলিপি]

২. ছিঁড়ে গেছি—ফেঁড়ে গেছি—পৃথিবীর পথে হেঁটে হেঁটে

[১৩৩৩, ঐ]

৩. এরকম চক্রাকারে ঘুরে গিয়ে কাল
সহসা খিঁচড়ে উঠে খচ্চরের মতন ফলত

[বিভিন্ন কোরাস, মহাপৃথিবী]

৪. যদি তারা টেঁসে যায় করাল কালের স্রোতে ধরা প'ড়ে গিয়ে

[বিভিন্ন কোরাস, ঐ]

৫. বেবিলন, নিনেভ, মিশর, চীন উরের আরসী থেকে ফেঁসে
অন্য এক সমুদ্রের দিকে তুমি চ'লে যাও—দুপুরবেলায়।

[নাবিক, সাতটি তারার তিমির]

জীবনানন্দ ক্রিয়াপদ দু-রকম প্রয়োগ করেছেন : একদিকে দেশজ ক্রিয়াপদের সুপ্রয়োগ ; আর-দিকে সবরকম ক্রিয়াপদের অপ্রত্যাশিত অপিচ অনুপম প্রয়োগ।

২

বিশেষণপ্রযুক্তির জীবনানন্দীয় বিশিষ্টতা "ধূসর পাণ্ডুলিপি" কবিতা-গ্রন্থে ধূসরই ছিলো, ক্রমশ উজ্জ্বল হয়েছে পরবর্তী কাব্যযাত্রায়। "রূপসী বাংলা" গ্রন্থে আমরা '**ব্যথিত** গন্ধের **ক্লান্ত** নীরবতা'-র মতো প্রয়োগ দেখেছি। "মহাপৃথিবী"তে ফ'লে উঠেছে এবকম উপর্যুপরি ফসল : 'হৃদয় ভ'রে গিয়েছে আমার **বিস্তীর্ণ** ফেল্টের **সবুজ** ঘাসের গন্ধে,/দিগন্তপ্লাবিত **বলীয়ান** রৌদ্রের আঘ্রাণে,/**মিলনোম্মত্ত** বাঘিনীর গর্জনের মতো অন্ধকারের **চঞ্চল বিরাট সজীব রোমশ** উচ্ছ্বাসে, জীবনের **দুর্দান্ত** নীল মত্ততায়।' "বনলতা সেন" বইএ এরকম ব্যবহার : 'মানুষ কাউকে চায়—তার সেই **নিহত** উজ্জ্বল/ঈশ্বরের পরিবর্তে অন্য কোনো সাধনার ফল।' বিশেষণ ব্যবহারেও দ্রষ্টব্য জীবনানন্দের অপ্রত্যাশিত ও চোখ-ধাঁধানো, এতোকাল-অভ্যস্ত বাংলা

কবিতাবিশ্বে ম্যাজিকের মতো, নিষ্ণাত ও আশ্চর্য, কুশলী ও অনির্বচন প্রয়োগ। এরকম একটি গুচ্ছ :

১. হলুদ পাতার গন্ধে ভ'রে ওঠে **অবিচল** শালিকের মন।

[সিন্ধুসারস, মহাপৃথিবী]

২. চাঁদ ডুবে গেলে পরে **প্রধান** আঁধারে তুমি অশ্বত্থের কাছে
এক গাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু একা-একা।

[আট বছর আগের একদিন, ঐ]

৩. আরো-এক **বিপন্ন** বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে।

[আট বছর আগের একদিন, ঐ]

৪. দাঁত নেই—চোখে তার **অক্ষম** পিঁচুটি!

[সমারূঢ়, সাতটি তারার তিমির]

৫. একটি বাদুড় দূর **স্বোপার্জিত** জ্যোৎস্নার মনীষায় ডেকে নিয়ে যায়।

[কবিতা, ঐ]

৬. হরিণ খেয়েছে তার **আমিষাশী** শিকারীর হৃদয়কে ছিঁড়ে।

[সৃষ্টির তীরে, ঐ]

৭. পৃথিবীতে নেই কোনো **বিশুদ্ধ** চাকরি।

[সৃষ্টির তীরে, ঐ]

৮. কী ক'রে তাহ'লে তারা এ-রকম **ফিচেল** পাতালে।

[সৃষ্টির তীরে, ঐ]

৯. **অনির্বচনীয়** হুণ্ডি একজন-দুজনের হাতে।

[১৯৪৬-৪৭, শ্রেষ্ঠ কবিতা]

১০. সূর্য অস্তে চ'লে গেলে কেমন **সুকেশী** অন্ধকার
খোঁপা বেঁধে নিতে আসে।

[১৯৪৬-৪৭, শ্রেষ্ঠ কবিতা]

২-সংখ্যক উদাহরণে অন্ধকার, 'প্রধান আঁধার', মানসলোকী; সম্পূর্ণ বিপ্রতীপ ১০-সংখ্যক উদাহরণের চিত্রল ও বহির্লোকস্থ 'সুকেশী অন্ধকার', যা একটি কাব্যপ্রচলের রূপান্তরণ মাত্র। কিন্তু অন্ধকার আর তমসার

প্রতিরূপ নয়, বিশেষ্য নয়, কোনো-এক রহস্যময় অপর অর্থদ্যোতনায় বারংবার ব্যবহার করেছেন এই কবি :

১. আজ ঢেকে আছে তার চিন্তা আর জিজ্ঞাসার **অন্ধকার স্বাদ**।

[ধান কাটা হ'য়ে গেছে, বনলতা সেন]

২. বলতেই নিখিলের **অন্ধকার দরকারে** পাখি গেল উড়ে।

[তুমি, ঐ]

৩. মুছে যায় পাহাড়ের শিঙে শিঙে গৃধিনীর **অন্ধকার গান**।

[সিন্ধুসারস, মহাপৃথিবী]

৪. সৌন্দর্য রাখিছে হাত **অন্ধকার ক্ষুধার** বিবরে।

[সিন্ধুসারস, মহাপৃথিবী]

জীবনানন্দের শব্দব্যবহার যেমন বহির্লোকের সংবাদবহ, তেম্নি অন্তর্লোক-বিহারী, 'সুকেশী অন্ধকার' ও 'প্রধান আঁধার' যেন এই দুই লোকপ্রান্তকে স্পর্শ ক'রে আছে। **'নীল'**—এই একটি শব্দের তিন স্তরগ্রামে ব্যবহার : 'বেতের ফলের মতো **নীলাভ** ব্যথিত তোমার দুই চোখ' (শঙ্খমালা, মহাপৃথিবী) বর্ণনা দিচ্ছে কোনো-এক রূপসীর চক্ষুযুগলের ; 'কাল রাতের প্রবল **নীল** অত্যাচার আমাকে ছিঁড়ে ফেলেছে যেন' (হাওয়ার রাত, মহাপৃথিবী) বিবরণবাহী কোনো-এক ঝোড়ো অথচ স্বচ্ছ রাত্রির ; 'গভীর **নীলাভতম** ইচ্ছা চেষ্টা মানুষের' (সিন্ধুসারস, মহাপৃথিবী) অবচেতন-লোকের পাতালপরশী।

বস্তুত জীবনানন্দ ক্রিয়াপদ ও বিশেষণের নূতন ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তাঁর কবিতার লোক-টিকে ধরবার চেষ্টা করেন ; অথবা, ঘুরিয়ে বলতে গেলে, এ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বিশিষ্ট হ'য়ে উঠলেন তিনি।

৩

জীবনানন্দের সর্বাধিক সমকালচেতন কবিতাগ্রন্থ "সাতটি তারার তিমির" ; আবার এই কবিতাগ্রন্থে এমন কতোগুলি কবিতা আছে, যার উত্থান গভীর মনোলোক থেকে। এই কবিতাগ্রন্থে শব্দান্বয়ের একটি নূতন কুশলতা আবিষ্কার করলেন কবি : বিচ্ছিন্ন, অনেকসময় বিরোধী-বিপ্রতীপ, উদাহরণমালার একত্রসন্নিপাত,—এ সন্নিপাত প্রাগ্বর্তী কোনো-কোনো কবি-

তাংশের সমার্থবোধকতা অতিক্রম ক'রে গেছে। বিচিত্র বিরোধের এই সান্নিপাত, বস্তুত, "সাতটি তারার তিমির" কবিতাগ্রন্থের অন্তর্বিষয়-বহির্বিষয় ধারণের এক শারীর প্রক্রিয়া। অন্তর্বিষয়-বহির্বিষয়কে সমবায়ী এক মূল্যে এক সমান্তরালে গ্রথিত করবার চেষ্টার একমুষ্টি দৃষ্টান্ত :

১. চারিদিকে পামগাছ—ঘোলা মদ—বেশ্যালয়—সেঁকো—কেরোসিন
[নিরঙ্কুশ]

২. অনেক গন্ধর্ব, নাগ, কুকুর, কিন্নর, পঙ্গপাল
[অভিভাবিকা]

৩. আমাদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, নারী, হেমন্তের হলুদ ফসল
[বিভিন্ন কোরাস : ১]

৪. সেই থেকে কলরব, কাড়াকাড়ি, অপমৃত্যু, ভ্রাতৃবিরোধ,
[বিভিন্ন কোরাস : ২]

৫. চেয়ে দ্যাখে মানুষের দুঃখ, ক্লান্তি, দীপ্তি, অধঃপতনের সীমা
[বিভিন্ন কোরাস : ৩]

৬. আশা নিয়ে মঞ্জুভাষা, ডোরিয়ান গ্রীস,
চীনের দেয়াল, পীঠ, পেপিরাস, কারার-পেপার।
[প্রতীতি]

৭. কখন সে বজেট-মিটিং, নারী, পার্টি-পলিটিক্স,
মাংস, মার্মালেড ছেড়ে
অবতার বরাহকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছিলো।
[জুহু]

৮. কুকুরের উৎসাহ, ঘোড়ার সওয়ার পার্শী, মেম, খোজা,
বেদুইন, সমুদ্রের তীর
জুহু, সূর্য, ফেনা বালি।
[জুহু]

৯. চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষয় হৃদয়
[সময়ের কাছে]

১০. বন্দরের অধিবাসীদের হাল, কৃচ্ছ, আলোড়ন ॥
[বিস্ময়]

[১৯৭১]

একটি অব্যয় নিয়ে

১

দুই অক্ষরের ছোট্টো একটি শব্দ, একটি অব্যয় : 'তবু'—এই হচ্ছে জীবনানন্দ দাশের রহস্যসান্দ্র বিস্ময়-সিন্দুকের সোনার চাবি। যে-জটিল মানসতা জীবনানন্দের, তাকে খুলে ফেলতে হ'লে, এই চাবি আবশ্যিক। জীবনানন্দের উক্ত জটিল মানসতা বাক্য ও বক্তব্যের প্যাঁচানো প্যাটার্নে প্রকাশিত। বক্তব্যের দ্বৈরথে, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোটানায়, সহজীবীদের মধ্যে জীবনানন্দ একক : তাঁর একপারে প্রতিষ্ঠিত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের[১] নাস্তি, আর একদিকে অধিষ্ঠিত আপনাপন বিশ্বাসবাসী বিষ্ণু দে ও অমিয় চক্রবর্তী : তাঁর সহকালীন অপর-কোনো কবি জীবনানন্দের মতো অমন ভিতরদ্বৈরথে দ্বিধাদীর্ণ হননি। এই দোটানাই কী তাঁকে সরিয়ে নিয়েছিলো জনসমাবেশ থেকে একাকিত্বে? তাই কী আগুন ধ'রে গিয়েছিলো ভিতরমহলে? যে-কাব্যগ্রন্থে কবি আত্মকণ্ঠ উপার্জন করেছিলেন প্রথম, সেই "ধূসর পাণ্ডুলিপি"-তে তবু তাঁর মানসতা ছিলো সরলরৈখিক—আত্মদ্বৈরথদীর্ণ নয় ; "রূপসী বাংলা"-য় ভিন্ন এক প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন ; "বনলতা সেন" মুখ্যত প্রেমকাব্য হ'য়েও অবশ্য ভিন্ন-পরিসরপ্রবেশী। বস্তুত উপর্যুক্ত দ্বৈরথের প্রথম প্রোজ্জ্বল সাক্ষ্য ফ'লে উঠলো "মহাপৃথিবী" কাব্যের সেই খ্যাতিমান 'আট বছর আগের একদিন' শীর্ষক কবিতায়। এর আগে অনেক অভিজ্ঞতাজট অতিক্রম ক'রে এসেছেন কবি :

১. রৌদ্র নিভে গেলে পাখি পাখালির ডাক
শুনিনি কি? প্রান্তরের কুয়াশায় দেখিনি কি উড়ে গেছে কাক!
[মৃত্যুর আগে, ধূসর পাণ্ডুলিপি]

---

[১] সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় অব্যয়শব্দের যে-অতিব্যবহার, তা বাংলা কাব্যেতিহাসে নূতন। তা কেবল সুধীন্দ্রনাথীয় প্রকরণের ঠাশবুনুনির সাক্ষ্য নয় ; বস্তুত তা নবাগত জটিলতাকেই ধারণ ও সুবিন্যস্ত করবার শারীরিক প্রচেষ্টাস্বরূপ।

২. স্বপ্নের ধ্বনিরা এসে ব'লে যায় : স্থবিরতা সবচেয়ে ভালো।

[স্বপ্নের ধ্বনিরা, বনলতা সেন]

৩. গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত ;
আমাকে কেন জাগাতে চাও ?
হে সময়গ্রন্থি, হে সূর্য, হে মাঘনিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি,
হে হিম হাওয়া,
আমাকে জাগাতে চাও কেন।

[অন্ধকার, বনলতা সেন]

৪. মাটি-পৃথিবীর টানে মানব-জন্মের ঘরে কখন এসেছি,
না এলেই ভালো হ'তো অনুভব ক'রে :
এসে যে গভীরতর লাভ হ'লো সে-সব বুঝেছি
শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে।

[সুচেতনা, বনলতা সেন]

এইসব—এবং আরো অজস্র কবিতার পট—তৈরি করেছে শেষ পর্যন্ত ঐ দ্বৈরথ। হয়তো ভিতরে-ভিতরে দ্বৈরথ চলছিলো দীর্ঘকাল, হয়তো প্রথম থেকে, কিন্তু এক-একটি কবিতায় এক-একটি অভিজ্ঞান ভাগ বসিয়েছে। উদ্ধৃত শেষ কবিতাংশে দেখা দিলো সেই গ্রন্থিজটিল মনোলোক, যেখানে 'না এলেই ভালো হ'তো অনুভব ক'রে' লাইনের পরবর্তী পঙক্তিই বিপ্রতীপ ঘোষণা হাঁকে : 'এসে যে গভীরতর লাভ হ'লো সে-সব বুঝেছি।' এমনি ক'রে এ হ'য়ে ওঠে অলংকারভুক্ত oxymoron-এর অধিক—ভিতরের এক চরম দোটানার ক্ষতাক্ত ক্রীড়াভূমি। এই মানসতা 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় স্বাশ্রয় খুঁজে পায়। একটি পরম্পর স্তবকের যুগ্মোল্লেখ উদ্ধার ক'রে ব্যাপারটি পরিষ্কার ক'রে নেয়া যাক :

'কোনোদিন জাগিবে না আর
জাগিবার গাঢ় বেদনার
অবিরাম—অবিরাম ভার
সহিবে না আর—'
এই কথা বলেছিলো তারে
চাঁদ ডুবে চ'লে গেলে—অদ্ভুত আঁধারে
যেন তার জানালার ধারে
উটের গ্রীবার মতো কোনো-এক নিস্তব্ধতা এসে।

তবুও তো পেঁচা জাগে
গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
আরেকটি প্রভাতের ইশারায়—অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।

নিস্তব্ধতা মৃত্যুর লোভ জাগিয়ে দেবার পরমুহূর্তেই জীবনের জয় ঘোষিত হ'লো প্যাঁচা আর ব্যাঙের আকাঙ্ক্ষায়। একপ্রান্তের সেই বেয়াড়া অদ্ভুত অশুভ জন্তু উট : মৃত্যু ; অপর কোটিতে অতিচেনা প্যাঁচা আর ব্যাঙ : জীবন। বিপ্রতীপের এই সংঘট্ট এই কবিতার স্তবকপরম্পরার মধ্য দিয়ে ব'য়ে গেছে ; অন্তিমে উঠেছে জীবনেরই জয়মিনার : 'আমরা দু'জনে মিলে শূন্য ক'রে চ'লে যাবো জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার।' ঐ স্তবকপরম্পরাকে গ্রথিত করেছে 'তবুও' নামক অব্যয়টি : 'উটের গ্রীবার মতো কোনো-এক নিস্তব্ধতা এসে'-র পরের পঙক্তি তাই 'তবুও তো পেঁচা জাগে'। এবং 'লাশ-কাটা ঘরে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে'-র পরবর্তী পঙক্তিনিচয় 'তবু রোজ রাতে আমি চেয়ে দেখি, আহা/থুরথুরে অন্ধ পেঁচা অশ্বত্থের ডালে ব'সে এসে/চোখ পাল্টায়ে কয়...।'

২

কবির শেষ দুটি কবিতাগ্রন্থ "সাতটি তারার তিমির" ও "বেলা অবেলা কালবেলা"-য় 'তবু'-র ব্যবহার উপর্যুপরি ও পৌনঃপুনিক। স্মরণীয় যে এই পর্যায়ে কবি বৃহৎ জীবনলোক সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। জীবনানন্দের কবিতার বিচ্ছিন্ন ধারানদী এই কবিতাগ্রন্থদ্বয়ে যেন বিষয়ের দিক থেকে সমুদ্রে এসে পড়েছে। এই পর্যায়ে জীবন সম্বন্ধে কোনো বিচ্ছিন্ন ধারণা নয়, একটি সমগ্র বোধ ও অভিজ্ঞান—তাঁর কবিতাগুচ্ছের মধ্য দিয়ে তিনি ক্রমাগত আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন। "সাতটি তারার তিমির"-এর একাংশে পরাবাস্তবতা ; অপর অংশে এই বিশাল জীবনবোধ। এখানে আকাশ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের অভিভাবিকা-স্বরূপ : সমস্ত-কিছু এক পরিব্যাপ্ত পটভূমিকায় এসে দাঁড়িয়েছে।

"সাতটি তারার তিমির" কবিতাগ্রন্থের কয়েকটি কবিতার উপান্ত্য পঙক্তি এরকম :

১. **তবুও** মিথ্যা নয় : সাগরের বালি পাতালের কালি ঠেলে
সময়সুখ্যাত গুণে অন্ধ হ'য়ে, পরে আলোকিত হ'য়ে গেলে !
[বিভিন্ন কোরাস]

২. তবুও একটি নারী 'ভোরের নদীর
জলের ভিতর জল চিরদিন সূর্যের আলোয় গড়াবে'
এ-রকম দু-চারটে ভয়াবহ স্বাভাবিক কথা
ভেবে শেষ হ'য়ে গেছে একদিন সাধারণভাবে।

[স্বভাব]

৩. মাটির নিঃশেষ সত্য দিয়ে গড়া হয়েছিল মানুষের
শরীরের ধুলো ;
তবুও হৃদয় তার অধিক গভীরভাবে হ'তে চায় সৎ।

[প্রতীতি]

৪. তিমিরহননে তবু অগ্রসর হ'য়ে
আমরা কি তিমিরবিলাসী ?
আমরা তো তিমিরবিনাশী
হ'তে চাই।
আমরা তো তিমিরবিনাশী।

[তিমিরহননের গান]

৫. মৃত্তিকার মর্মে ম্লান উপকূলে হয়তো বা
আর একবার তবু ওড়বার মতো ;
মরণ বা প্রলোভন উপচায়ে—জীবনের নির্দেশবশত।

[বিস্ময়]

৬. তবুও নক্ষত্র নদী সূর্য নারী সোনার ফসল মিথ্যা নয়।
মানুষের কাছে থেকে মানুষের হৃদয়ের বিবর্ণতা ভয়
শেষ হবে ; তৃতীয় চতুর্থ—আরো সব
আন্তর্জাতিক ভেঙে গ'ড়ে দীপ্তিমান কৃষিজাত জাতক মানব।

[সৌরকরোজ্জ্বল]

৭. সৃজনের ভয়াবহ মানে
তবু জীবনের বসন্তের মতন কল্যাণে
সূর্যালোকিত সব সিন্ধুপাখিদের শব্দ শুনি।

[সূর্যতামসী]

৮. অগণন তাপী সাধারণ প্রাচী অবাচীর উদীচীর মতন একাকী
আজ নেই কোথাও দিৎসা নেই—জেনে
তবু রাত্রিকরোজ্জ্বল সমুদ্রের পাখি।

[রাত্রির কোরাস]

পঁয়তাল্লিশ

৯. নব নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় ক'রে মানুষের
চেতনার দিন
অমেয় চিন্তায় খ্যাত হ'য়ে তবু ইতিহাসভুবনে নবীন
হবে না কি মানবকে চিনে—তবু প্রতিটি ব্যক্তির ষাট
বসন্তের তরে!

[সময়ের কাছে]

১০. তবু পৃথিবীর বড়ো রৌদ্রে
আরো প্রিয়তর জনতায়
'নেই' এই অনুভব জয় ক'রে আনন্দ ছড়ায়ে যেতে চায়।

[লোকসামান্য]

১১. গর্ভাঙ্কে তবুও লুপ্ত হ'য়ে যাবো নাকি!—
সূর্য আরো নব সূর্যে প্রাণ দাও—প্রাণ দাও পাখি।

[মকর-সংক্রান্তির রাতে]

১২. এছাড়া কোথাও কোনো পাখি
বসন্তের অন্য কোন সাড়া নেই।
তবু এক দীপ্তি র'য়ে গেছে।

[দীপ্তি]

"বেলা অবেলা কালবেলা" কবিতাগ্রন্থের কএকটি কবিতার উপান্ত্য লাইনমালা :

১. তবুও তোমারে জেনেছি, নারি, ইতিহাসের শেষে এসে ; মানব-
প্রতিভার রূঢ়তা ও নিষ্ফলতার অধম অন্ধকারে।

[তোমাকে]

২. শাদাশিদে মনে হয় সে-সব ফসল ;
পায়ের চলার পথে দিন আর রাত্রির মতন ;—
তবুও এদের গতি স্নিগ্ধ নিয়ন্ত্রিত করে বারবার উত্তরসমাজ
ঈষৎ অনন্যসাধারণ।

[চারিদিকে প্রকৃতির]

৩. তবু এই পৃথিবীর জীবনই গভীর।

[পৃথিবীর রৌদ্রে]

৪. যদিও কাহারো প্রাণে আজ রাতে স্বাভাবিক মানুষের মতো
ঘুম নেই,
তবু এই দ্বীপ, দেশ, ভয় অভিসন্ধানের অন্ধকারে ঘুরে
সসাগরা পৃথিবীর আজ এই মরণের কালিমাকে ক্ষমা করা যাবে।
[জয়জয়ন্তীর সূর্য]

৫. ইতিহাসের ব্যাপক অবসাদের সময় এখন, তবু, নরনারীর ভিড়
নব নবীন প্রাকসাধনার ;—নিজের মনের সচল পৃথিবীকে
ক্রেমলিনে লণ্ডনে দেখে তবুও তারা আরো নতুন
অমল পৃথিবীর।
[প্রয়াণ পটভূমি]

৬. সকল লোকের কাজ বিষন্ন জেনেও তবু কাজ ক'রে—গানে
গেয়ে লোকসাধারণ ক'রে দিতে পারি যদি আলোকের মানে।
[হেমন্তরাতে]

৭. যদিও আজ রাষ্ট্র সমাজ অতীত অনাগতের কাছে তমসুকে বাঁধা,
প্রাণাকাশে বচনাতীত রাত্রি আসে তবুও তোমার
গভীর এরিয়েলে।
[গভীর এরিয়েলে]

৮. তবুও প্রেমিক তাকে হ'তে হবে ;—সময় কোথাও
পৃথিবীর মানুষের প্রয়োজন জেনে বিরচিত নয় ; তবু
সে তার বহির্মুখ চেতনার দান সব দিয়ে গেছে ব'লে
মনে হয় ; এর পর আমাদের অন্তর্দীপ্ত হবার সময়।
[ইতিহাসযান]

৯. তবু,—অগণন অর্ধসত্যের
উপরে সত্যের মতো প্রতিভাত হয়ে নব নবীন ব্যক্তির
সর্গে সঞ্চারিত হয়ে মানুষ সবার জন্যে শুভ্রতার দিকে
অগ্রসর হ'তে চায়—অগ্রসর হ'য়ে যেতে পারে।
[পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে]

১০. তবু জ্ঞানের বিষন্নলোকী আলো
অধিক নির্মল হলে নটীর প্রেমের চেয়ে ভালো
সকল মানবপ্রেমে উৎসারিত হয় যদি, তবে
নব নদী নব নীড় নগরী নীলিমা সৃষ্টি হবে।
আমরা চলেছি সেই উজ্জ্বল সূর্যের অনুভবে।
[অন্ধকার থেকে]

১১. আঁধার নেপথ্য চারিদিকে—কূল থেকে অকূলের দিক নিরূপণে
শক্তি নাই আজ আর পৃথিবীর—তবু এই স্নিগ্ধ রাত্রি নক্ষত্রে ঘাসে।

[মানুষ যা চেয়েছিলো]

১২. আমি তবু বলি ;
এখনও যে-কটা দিন বেঁচে আছি সূর্যে-সূর্যে চলি।

[হে হৃদয়]

দ্বৈরথ আছে উপর্যুক্ত কবিতাগুচ্ছে ; কিন্তু দ্বৈরথ পেরিয়ে প্রতিটি কবিতায় আছে আলোকের আকাঙখা। এই আলোক-আকাঙখা কবি অন্ধকারে বন্ধ ব'লেই ; সময়-, ইতিহাস- ও সমাজ-চেতনা এই সব কবিতার পরিসর নির্মাণ করেছে ; কিন্তু বারংবার ভিতর থেকে বিচ্ছুরিত হ'য়ে উঠেছে আলোকের অভীপ্সা। রবীন্দ্রনাথের 'কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো।/বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো।' (১৭-সংখ্যক কবিতা, গীতাঞ্জলি) এই উচ্চারণের অভ্যন্তরে যে-আলোঅভীপ্সা সক্রিয়, তা কোনো দ্বৈরথের সন্তান নয়, এক শুভংকর ও ক্ষেমংকর চৈতন্যের প্রার্থনা। কিন্তু জীবনানন্দের কণ্ঠে যখন ধ্বনিত হয় : 'আমি তবু বলি :/এখনও যে-কটা দিন বেঁচে আছি সূর্যে-সূর্যে চলি,/দেখা যাক পৃথিবীর ঘাস/সৃষ্টির বিষের বিন্দু আর /নিষ্পেষিত মনুষ্যতার/আধারের থেকে আনে কী ক'রে যে মহানীলাকাশ' তখন তাঁকে এক বিশাল ধূসর ঊষরতা পেরিয়ে উত্তীর্ণ হ'তে হয় সবুজ কেন্দ্রে, সৃষ্টির বিষের বিন্দু ধারণ ক'রেই তাঁকে মধুসঞ্চয়ের আগ্রহ জ্বালাতে হয়, সেখানে নিষ্পেষিত মনুষ্যতার মধ্য থেকেই পরিব্যাপ্ত হ'তে থাকে মহানীলাকাশ। রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ যে দুই ভিন্ন সময়ের কবি, উভয়ের কবিতাশরীরে এইভাবে তার পরিচিহ্ন লেগে থাকে। এই কবিতাবলিতে জীবনানন্দ ক্রমাগত ব্যবহার করেছেন আলোক ও অন্ধকারকে—ঐ ব্যবহারের ভিতর অনেক সময় নিজের অভিপ্রায় সঞ্চারিত ক'রে। কাব্যপাঠকের পরিচিত ও স্বাভাবিক, অথচ রচনাকুশলতায় কোথাও একটুও অতিব্যবহৃত মনে হয় না। আবার কখনো আছে বিপরীত ব্যবহার : "বেলা অবেলা কালবেলা" থেকে উপরে উদ্ধৃত ৭ ও ১১-সংখ্যক কবিতাংশযুগে রাত্রি আর হতাশাধূসর তথা তমসাপ্রতীকী নয়, আশাকরোজ্জ্বল বরং, নিশীথ তাই এখানে 'বচনাতীত রাত্রি' ও 'স্নিগ্ধ রাত্রি'। বিশেষণের অত্যাশ্চর্য ধনুঃশর যোজনায় জীবনানন্দ বিশিষ্ট ; এখানে 'বচনাতীত' ও 'স্নিগ্ধ' শব্দদ্বয়ের প্রয়োগে তার একটি সাক্ষ্য ফুটে রইলো।

৩

উপর্যুক্ত অব্যয়শব্দের ভূমিকা-স্বরূপ যে-কবিতাটি তুলে ধরা যায়, তা জীবনানন্দের “শ্রেষ্ঠ কবিতা”-ভুক্ত ‘তবু’ কবিতাটি। কবির সময়-, ইতিহাস- ও সমাজ-চেতনা এই কবিতায় একত্রসন্নিপাত মেনেছে। ‘বুদ্ধকে স্বচক্ষে মহানির্বাণের আশ্চর্য শান্তিতে চ’লে যেতে দেখে’-র স্বচক্ষে-কথাটি অলীক অপিচ সত্য, কবিতাসত্যের মর্যাদা অর্জেছে। শেষ লাইন-ক’টিতে প্রদীপিত হ’য়ে উঠেছে কবির বাণী :

কোথাও বাতাস নেই, তবু
মর্মরিত হ’য়ে ওঠে উদয়ের সমুদ্রের পারে।
কোনো পাখি
কালের ফোকরে আজ নেই, তবু নব সৃষ্টিমরালের মতো কলস্বরে
কেন কথা বলি ; কোনো নারী
নেই, তবু আকাশহংসীর কণ্ঠে ভোরের সাগর উতরোল ॥

[১৯৭১]

বাংলা ছন্দোমুক্তির জীবনানন্দীয় সূত্র

মুখ্য অবলম্বন তাঁর, জীবনানন্দ দাশের, অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ; তত্রাচ অপরাপর ছন্দেও-যে তিনি কবিতা রচনা করেননি, তা নয়।

কবিজীবনের লগ্নপ্রাথমে, "ঝরা পালক"-এর বেশ কএকটি কবিতায়, মাত্রাবৃত্ত ছন্দ প্রযুক্ত—বিশেষত অভিনন্দন- বা তর্পণ-সূচক কবিতায়। বস্তুত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-নজরুল ইসলাম উক্ত রীতির যে-সুপ্রচুর প্রয়োগ করেন তাঁদের কাব্যে, জীবনানন্দে ফলেছে তারই উত্তর-ফসল। আত্মকণ্ঠ আবিষ্কারের পরে তিনি প্রায় আর এই ছন্দের অনুবৃত্তি করেননি। ব্যতিক্রম "শ্রেষ্ঠ কবিতা"-গ্রন্থভুক্ত 'লোকেন বোসের জর্নাল' ;—এবং এই কবিতায় জীবনানন্দীয় আবহ অনুপস্থিত। ব্যতিক্রম "মহাপৃথিবী"-গ্রন্থভুক্ত কবিতা-ত্রয় : 'প্রার্থনা', 'সূর্যসাগরতীরে' ও 'মনোবীজ' কবিতার শেষাংশ।

তেম্নি কাব্যজীবনের উপান্ত্যকালে, যখন কবি একটি আলাদা আয়তনে প্রবেশাকাঙ্ক্ষী, তদানীন্তন কবিতাকতিপয়ে স্বরবৃত্তের প্রয়োগ দ্রষ্টব্য। তাঁর শেষতম কবিতাগ্রন্থ "বেলা অবেলা কালবেলা"-র দশটি কবিতা ও "শ্রেষ্ঠ কবিতা"-গ্রন্থভুক্ত 'তোমাকে ভালোবেসে' ও 'অনন্দা' কবিতাদ্বয় এই পর্যায়ী। লক্ষণীয় : 'তোমাকে ভালোবেসে'-র মতো নিপট প্রেমকবিতা স্বরবৃত্তে কবি লেখেননি আর ; 'তোমাকে' নাম্নী প্রেমকবিতায় বা অন্যান্য স্বরবৃত্তিক কবিতাগুচ্ছেও তাঁর কবিতার জটিলগভীর লোকচক্রটিকেই তিনি প্রবেশ ও মূল্য দিতে চেয়েছিলেন।

গদ্যে রচিত কবিতার প্রসঙ্গটিও এখানে চুকিয়ে দেয়া ভালো। গদ্যকবিতা লিখতে শুরু করেন তিনি কবিজীবনের মধ্যপর্বে : "বনলতা সেন" কাব্য-গ্রন্থেই প্রথম গদ্যকবিতার সূচনা, তৎপরবর্তী কাব্য "মহাপৃথিবী"-তেও ছোটোবড়ো বাক্যের ঢেউ তুলে পৌঁছেছে একেবারে অন্ত্যপার্বণীর "বেলা অবেলা কালবেলা"-র 'আমাকে একটি কথা দাও' ও 'সময়ের তীরে'।

অনন্তর প্রধান প্রসঙ্গপ্রবেশ।

১

প্রথম কবিতাগ্রন্থ "ঝরা পালক" থেকে শেষ কবিতাগ্রন্থ "বেলা অবেলা কাল-বেলা" পর্যন্ত অক্ষরবৃত্তের একচ্ছত্র শাসন চলেছে। কিন্তু "ঝরা পালক"-এ জীবনানন্দীয় বিশিষ্টতা ফলবান হ'য়ে ওঠেনি ; এবং তাই যে-অক্ষরবৃত্ত আলম্বন তাঁর, তার ভিতরেও জ্ব'লে ওঠেনি কোনো নূতন সাহস,—কারণ : ছন্দের সাহস কবিতারই অন্তর্গত সার্বিক সাহসেরই আর-একটি বাহু। তাই "ধূসর পাণ্ডুলিপি"-তে যখন জীবনানন্দের আত্মতা জেগে উঠেছিলো, তখন তাঁর ছন্দব্যবহারও দীপ্তিমতী হ'য়ে উঠেছে। তাঁর আত্মতার রূপমুদ্রা—অনন্তর—এই "ধূসর পাণ্ডুলিপি" থেকে অন্ত্যকাব্য অবধি বিসারী ; এবং ছন্দেও।

পঙক্তিস্বাধীন তথা অসমান অক্ষরবৃত্তে জীবনানন্দের প্রিয়তা। অক্ষরবৃত্তকে খুব নিয়মের প্রপীড়নের মধ্যে না-নিয়ে গিয়ে তিনি তাকে মুক্তি দিয়েছিলেন। যে-রোম্যান্টিক উচ্ছ্বাস তাঁকে বক্তব্যের সংযমন থেকে পঙক্তিবিন্যাসের সংযমন থেকে শিকার ক'রে নিয়ে গিয়েছিলো একরকম এলায়িত প্রসারিত ক্রমায়ত গীতল উন্মুক্তিতে, তাই তাঁকে তাঁর নিজের মতো অক্ষরবৃত্তের একটি রূপ নির্মাণে সাহায্য করেছিলো। এই মনোভাব থেকেই "ধূসর পাণ্ডুলিপি"-ভুক্ত 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় বাইশ মাত্রার অক্ষরবৃত্তে ('আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষসন্ধ্যায়') হঠাৎ ব্যতিক্রম সেধেছে ছাব্বিশ মাত্রার তিনটি পঙক্তি : ১. 'যত নীল আকাশেরা র'য়ে গেছে খুঁজে ফেরে আরো নীল আকাশের তল' ; ২. 'পৃথিবীর কঙ্কাবতী ভেসে গিয়ে সেইখানে পায় ম্লান ধূপের শরীর' ;৩ 'ধূসর মৃত্যুর ; একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিলো—সোনা ছিলো যাহা'। এই মনোভাবের ফলেই "রূপসী বাংলা" -র কবিতাগুচ্ছ সনেট না-হ'য়ে চতুর্দশপদী কবিতাতে রূপান্তরিত হয়েছে। [১] বাইশ মাত্রার পঙক্তিশরীর, এখানে, মাঝে-মাঝে সম্প্রসারিত হ'য়ে গেছে ; যেমন : 'যখন মৃত্যুর আগে শুয়ে র'বো—অন্ধকার নক্ষত্রের নিচে' এই বাইশ মাত্রা ষষ্টকের একটি পঙক্তিতে স্ফারিত হ'য়ে গেছে ছাব্বিশ মাত্রায় : 'ভোমরা উড়িছে শুনি—গুবরে পোকার ক্ষীণ গুমরানি ভাসিছে বাতাসে'। এরকম ব্যতিক্রমের উপর্যুপরি সম্মুখীন হই এই কাব্যে ; স্ফারিত কখনো, যেমন : 'যদি আমি ঝ'রে যাই', 'যে-শালিখ ম'রে যায়', 'তোমার বুকের থেকে', 'একদিন পৃথিবীর পথে', 'ঘাসের বুকের থেকে' কবিতানিচয় ; কখনো

[১] রবীন্দ্রনাথও সনেট না-লিখে চতুর্দশপদী কবিতাই লিখেছিলেন একদিন।

সংকুচিত, যেমন : 'তবু তাহা ভুল জানি', 'একদিন পৃথিবীর পথে' কবিতামালা। শেষ পর্যন্ত বাইশ মাত্রার পঙক্তিও তাঁর কাছে সংকুচিত ও রুদ্ধশ্বাস বোধ হওয়ায় আরম্ভ করেন লিখতে দীর্ঘ ছাব্বিশ মাত্রার মুক্তি-লাইন। বস্তুত, "রূপসী বাংলা"-ও নির্দিষ্ট ও অতিনিরূপিত ছন্দস্তবকবিন্যাসের বই নয় : বরং—মনে হয়—অক্ষরবৃত্তের যে-ছোটোবড়ো চালে জীবনানন্দ স্বস্তি বোধ করতেন অধিকতর, এখানে তারই আর-একটি আয়তন রচিত। এই উক্তির প্রকৃষ্ট নজির-স্বরূপ একটি কবিতার মাত্রাবিন্যস্ত উদ্ধার প্রয়োজনীয় :

(এইসব ভালো লাগে) : জানালার ফাঁক দিয়ে ভোরের
সোনালি রোদ এসে ২৬
আমারে ঘুমাতে দেখে বিছানায়—আমার কাতর চোখ—
আমার বিমর্ষ ম্লান চুল, ৩০
এই নিয়ে খেলা করে : জানে সে যে বহুদিন আগে আমি
করেছি কি ভুল ২৬
পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমাহীন গাঢ় রূপসীর মুখ ভালোবেসে ; ২৪
পউষের শেষ রাতে আজো আমি দেখি চেয়ে আবার সে
আমাদের দেশে ২৬
ফিরে এলো ; রং তার কেমন তা জানে এই টসটসে ভিজে
জামরুল, ২৬
নরম জামের মতো চুল তার, ঘুঘুর বুকের মতো
অস্ফুট আঙুল ; ২৬
পউষের শেষ রাতে নিমপেঁচাটির সাথে আসে সে যে ভেসে ২২
কবেকার মৃত কাক : পৃথিবীর পথে আজ নাই সে তো আর ; ২২
তবুও সে ম্লান জানালার পাশে উড়ে আসে নীরব সোহাগে, ২২
মলিন পাখনা তার খড়ের চালের হিম শিশিরে মাখায় ; ২২
তখন এ পৃথিবীতে কোনো পাখি জেগে এসে বসেনি শাখায় ; ২২
পৃথিবীও নাই আর ;—দাঁড়কাক একা-একা সারারাত জাগে ; ২২
'কিবা হায়, আসে যায় তারে যদি কোনোদিন না পাই আবার।' ২২

[এই সব ভালো লাগে, রূপসী বাংলা]

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের এই পঙক্তিস্বাধীন মুক্তির চেয়েও যে-মুক্তিতে জীবনানন্দের বিশিষ্টতা, তা ছন্দের দিক থেকে দুঃসাহসিক। কারণ, অক্ষরবৃত্তের নিয়মের মধ্যে তিনি মাত্রাবৃত্তের একটি সূত্র যোজনা ক'রে দিয়েছিলেন। অক্ষরবৃত্তে মুক্ত ও রুদ্ধ সিলেবল তুল্যমূল্য ; কিন্তু মাত্রাবৃত্তে মুক্ত সিলেবল এক মাত্রা

ও রুদ্ধ সিলেবল দু-মাত্রা হিশেবে গণ্য। জীবনানন্দ অক্ষরবৃত্তে কোনো-কোনো রুদ্ধ সিলেবল দু-মাত্রা হিশেবে প্রয়োগ করতে শুরু করেন ; যেন প্রথম জীবনের পর যে-ছন্দকে তিনি আর প্রয়োগোপযোগী মনে করেননি, তা এইভাবে তাঁর উপর শোধ তুলে নেয়। সুখের কথা এই যে অক্ষরবৃত্তে রুদ্ধ সিলেবল যুগ্ম মাত্রায় ব্যবহার করলেও তা কোথাও শ্রবণপীড়ক হ'য়ে ওঠেনি, বরং জীবনানন্দীয় গীতলতার চমৎকার চারিত্র্যে পরিণত। আরো স্মরণীয় : উক্ত রীতি-যে একা জীবনানন্দ ব্যবহার করেছেন—তা নয়, কিন্তু তাঁর মতো এমন প্রবল, প্রচুর ও অব্যর্থভাবে অপর-কেউ ব্যবহার করেননি।

২

উপর্যুক্ত ছন্দোমুক্তির সূচনা "ধূসর পাণ্ডুলিপি" গ্রন্থে। একগুচ্ছ উদাহরণ :

১. মেঠো চাঁদ—কাস্তের মতো বাঁকা, চোখা—
চেয়ে আছে ; এমনি সে তাকায়েছে কতোরাত—নাই লেখা-জোখা।

[মাঠের গল্প : মেঠো চাঁদ]

২. নিড়ানো হয়েছে মাঠ পৃথিবীর চারিদিকে
শস্যের খেত চ'ষে-চ'ষে
গেছে চাষা চ'লে ;

[মাঠের গল্প : কার্তিক মাঠের চাঁদ]

৩. ক্যাম্পের বিছানায় রাত তার অন্য এক কথা বলে।

[ক্যাম্পে]

৪. রাত্রির ফুলের মতো—ঘুমন্ত হৃদয়ের মতো
অন্তর ঘুমায়ে গেছে,—ঘুমায়েছে মৃত্যুর মতন !—

[জীবন : ২২]

৫. মানুষের মতো পায়ে চলিতেছি যতোদিন—তাই,—
ক্লান্তির পরে ঘুম,—মৃত্যুর মতন শান্তি চাই !

[পিপাসার গান]

৬. চুমে ল'য়ে রৌদ্রের রস
হেমন্ত বৈকালে

উড়ো পাখপাখালির পালে
উঠানের ;

[পিপাসার গান]

স্থূলাক্ষর শব্দসমূহে রুদ্ধ সিলেবল দু-মাত্রা হিশেবে ব্যবহৃত। তবে অক্ষরবৃত্তের সনাতন মূল্যও দান করেছিলেন তিনি অধিকাংশ সময়ে, এমনকি স্থূলাক্ষর ঐ শব্দগুচ্ছকে ঐ কাব্যেই তিনি তার প্রাক্তন দাম চুকিয়ে দিয়েছিলেন :

১. —কে বা সেই চাষা ;
কাস্তে হাতে,—কঠিন,—কামুক,—
আমাদের সবটুকু ব্যথাভরা সুখ
উচ্ছেদ করিবে এসে একা !

[পিপাসার গান]

২. **শস্যের** খেতের পাশে আজ রাতে আমাদের জেগেছে পিপাসা।

[প্রেম]

৩. এখানে বনের কাছে **ক্যাম্প** আমি ফেলিয়াছি।

[প্রেম]

৪. পায়ের পথের মতো **ঘুমন্তেরা** প'ড়ে আছে কতো।

[প্রেম]

৫. জীবনের রোমাঞ্চের শেষ হ'লে **ক্লান্তির** মতন।

[পিপাসার গান]

৬. লাল আলো,—**রৌদ্রের** চুমুক
অন্ধকার,—কুয়াশার ছুরি
মোরে যেন কেটে লয়।

[লোকসামান্য]

দেখা যাচ্ছে : 'কাস্তে', 'শস্য', 'ঘুমন্ত', 'ক্লান্তি', 'রৌদ্র' প্রভৃতি শব্দকে একই ছন্দে তিনি দু'রকম মাত্রায় ব্যবহার করেছেন। এমনকি "সাতটি তারার তিমির" বই-এর একটি কবিতাংশে দেখা যাবে একই 'সূর্য' শব্দকে তিনি দু'রকম মাত্রায় বিন্যস্ত করেছেন :

নিজের মৎসর নিয়ে নিশানের 'পরে **সূর্য** এঁকে
চোখ মেরেছিলো তারা নীলিমার সূর্যের দিকে।

কবির বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে, আমার সিদ্ধান্তের সপক্ষে, দৃষ্টান্তমালা চয়ন করতে চাই। "ধূসর পাণ্ডুলিপি" থেকে উদাহরণ উপস্থিত করেছি পূর্ব পরিচ্ছেদে। "রূপসী বাংলা" থেকে :

১. দেখিব খয়েরী ডানা শালিখের সন্ধ্যায় হিম হ'য়ে আসে
[তোমরা যেখানে সাধ]

২. মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
[বাংলার মুখ আমি]

৩. আজ সারাদিন এই বাদলের জলে ধলেশ্বরী চড়ায়
[হায় পাখি, একদিন]

৪. হৃদয়ে জলের গন্ধ কন্যার—ঘুম নাই, নাইকো মরণ
[কতো ভোরে,—দু'পহরে]

৫. কতোদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়াছি আমরা দুজন
[কতোদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে]

৬. নীলপাতা মৃদু ঘাস রৌদ্রের দেশে
ফিঙ্গা যেমন তার দিনগুলো ভালোবেসে—
[এই জল ভালো লাগে]

৭. আকাশে কমলা রঙ ফুটে ওঠে সন্ধ্যায়—কাকগুলো নীল মনে হয়
[একদিন পৃথিবীর পথে]

৮. সূর্যের রাঙা ঘোড়া : পক্ষিরাজের মতো কমলারঙের পাখা ঝাড়ে
[মানুষের ব্যথা আমি]

৯. প্রাণ যে ব্যাকুল রাত্রি প্রান্তরের গাঢ় নীল অমাবস্যায়
[হৃদয়ে প্রেমের দিন]

১০. খড়ের চালের নিচে, অন্ধকারে,—সন্ধ্যায় ধূসর সজল
[কতো দিন তুমি কার]

"বনলতা সেন" থেকে :

১. কাঁচপোকা ঘুমিয়েছে—গঙ্গাফড়িং সে-ও ঘুমে
আম নিম হিজলের ব্যাপ্তিতে প'ড়ে আছো তুমি।
[তুমি]

পঞ্চাশ,

২. তুমি ছাড়া সময়ের এ-উদ্ভাবনে।

[তুমি]

৩. প্রকৃতিস্থ প্রকৃতির মতো শব্দে—প্রেম অপ্রেম থেকে দূরে।

[তুমি]

৪. ধর্মাশোকের ছেলে মহেন্দ্রের সাথে।

[সুরঞ্জনা]

৫. চারিদিকে ছায়া ঘুম সপ্তর্ষি নক্ষত্র ;
মধ্যযুগের অবসান
স্থির ক'রে দিতে গিয়ে ইওরোপ গ্রীস
হতেছে উজ্জ্বল খ্রীষ্টান।

[সবিতা]

"মহাপৃথিবী" থেকে :

১. মেঘের দুপুর ভাসে—সোনালি চিলের বুক হয় উন্মন।

[সিন্ধুসারস]

২. চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম।

[শঙ্খমালা]

৩. মর্গে কি হৃদয় জুড়োলো
মর্গে— গুমোটে
থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁটে।

[আট বছর আগের একদিন]

৪. সবুজ পাতার 'পরে যখন নেমেছে এসে সূর্যের আঁচ।

[অবশেষে]

৫. বিকেলের শিশুসূর্যকে ঘিরে মায়ের আবেগে।

"সাতটি তারার তিমির" থেকে :

১. আস্তাবলের ঘ্রাণ ভেসে আসে এক ভিড় রাত্রির হাওয়ায়।

[শিরীষের ডালপালা]

২. প্যারাফিন লণ্ঠন নিভে গেল গোল আস্তাবলে।

[ঘোড়া]

৩. সময় পোহায়ে যায়, মলয়ালি ভয় পায় ভ্রান্তিবশত।

[ঘোড়া]

৪. সূর্যসাগরতীরে তবুও জননী ব'লে সন্ততিরা চিনে নেবে কারে।

[মনোসরণি]

৫. তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব—অতিবৈতনিক
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।

[নিরঙ্কুশ]

"বেলা অবেলা কালবেলা" থেকে :

১. সূর্য আর সূর্যের বনিতা তপতী।

[রাত্রি]

২. কোঁচকায়ে পৃথিবীর মসৃণ গিলা।

[চারিদিকে প্রকৃতির]

৩. নদীর ভিতরে জলে তলতা বাঁশের
প্রতিবিম্বের মতন নিখুঁত।

[সামান্য মানুষ]

৪. সেখানে তম্বুরার শব্দে ছিলো।
পৃথিবীতে দুন্দুভি বেজে ওঠে—বেজে ওঠে ;

[মহিলা]

৫. সাগরের কূলে ফিরে আমাদের পৃথিবীকে যদি
প্রিয়তর মনে করি প্রিয়তম মৃত্যু অবধি!

[অবরোধ]

৪

অক্ষরবৃত্ত ছন্দোমুক্তির এই বিপজ্জনক সূত্রটি জীবনানন্দে গীতমর্মরিত ফসলায়তন হ'য়ে উঠেছে। কএকটি শব্দ—'সূর্য', 'মৃত্যু', 'সন্ধ্যা'— জীবনানন্দ অধিকাংশ সময় তিন মাত্রা হিশেবে ব্যবহার করেছেন। অক্ষরবৃত্তের নিয়মানুযায়ী 'জ্যোৎস্না' দুই অথবা তিন মাত্রার যে-কোনো একটি হিশেবে ব্যবহার করা যায়, এবং জীবনানন্দ দু'রকম ব্যবহারে অভ্যস্ত। বিবৃত ভঙ্গির ব্যবহারেই অবশ্য জীবনানন্দের বিশিষ্টতা : 'উড়ুক উড়ুক তারা পউষের জ্যোৎস্নায় নীরবে উড়ুক' (বুনোহাঁস, মহাপৃথিবী) পঙক্তিতে 'পৌষ' ও 'জ্যোৎস্না' বিবৃতভাবে উচ্চারিত। জীবনানন্দ নিজের নিয়ম থেকে চ্যুত নন কোথাও : উপরের উদাহরণমালায় সর্বত্র দেখা যাবে জীবনানন্দ রুদ্ধ সিলেবলকে ভেঙে ও বিশ্লিষ্ট ক'রে দু-মাত্রা ব্যবহারের যে-সুযোগ, কেবলমাত্র তা-ই গ্রহণ করেছেন ; মুক্ত সিলেবল দিয়ে সে-কাজ সম্পাদন করা

ছিলো অসম্ভব, এবং জীবনানন্দ একবারও সে-অপচেষ্টা করেননি। তবে উপর্যুক্ত মুক্তির সীমা এই যে একে একটি নির্দিষ্ট নিয়মবলয়ে দাঁড় করালে তা মাত্রাবৃত্তে বা স্বেচ্ছাচারী ছন্দে তথা ছন্দহীনতায় পর্যবসিত হবে। একে জীবনানন্দের উত্তর-কবিতায় ছন্দোমুক্তির কাজে বীজের মতো ব্যবহার করতে হ'লে তা করতে হবে খুব কুশলতার সঙ্গে ॥

[১৯৭১]

গ দ্য ক বি তা

জীবনানন্দের গ্রন্থিত গদ্যকবিতার সংখ্যা : "বনলতা সেন"-এ নয়টি ('হাওয়ার রাত', 'আমি যদি হতাম', 'ঘাস', 'নগ্ন নির্জন হাত', 'শিকার', 'বেড়াল', 'অন্ধকার', 'কমলালেবু', 'আমাকে তুমি') ; "মহাপৃথিবী"-তে সাতটি ('শ্রাবণরাত', 'মুহূর্ত', 'শহর', 'শীতরাত', 'আদিম দেবতারা', 'আজকের এক মুহূর্ত', 'ফুটপাথে') : মোট সংখ্যা ষোলো। অগ্রন্থিত গদ্যকবিতা : "মহাপৃথিবী"-র কবির মৃত্যুত্তর সংস্করণে যোজিত একটি কবিতা ('হঠাৎ-মৃত') ; "জীবনানন্দ দাশের কবিতা" গ্রন্থে সংকলিত আরো নয়টি কবিতা ('কবি', 'দিনরাত্রি', 'আমি', 'চিঠি এল', 'শবের পাশে', 'বড়ো বড়ো গাছ', 'উনিশ শো চৌত্রিশের', 'এইসব পাখি', 'সুন্দরবনের গল্প') : মোট সংখ্যা দশ। তাহ'লে, জীবনানন্দের গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত মোট গদ্যকবিতার সংখ্যা, এখন-পর্যন্ত-প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, ছাব্বিশটি।

লক্ষণীয় : গদ্যকবিতার চর্চা করেন জীবনানন্দ তাঁর কবি-জীবনের মধ্যপর্যায়ে। "বনলতা সেন" তাঁর তৃতীয় কবিতাগ্রন্থ, "মহাপৃথিবী" চতুর্থ। তাঁর জীবদ্দশাতেই কবির আরো কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে কোনো গদ্যকবিতাকে কবি স্থান দ্যাননি। ব. সে.-এর কবিতাবলি ১৩৩২-৪৬-এর মধ্যে লেখা ; মহা.-র কবিতাগুচ্ছ ১৩৩৬-৪৮-এর ভিতরে। তাঁর সমস্ত গদ্যকবিতা মোটামুটিভাবে ১৩৩২ থেকে '৪৮-এর ভিতরে রচিত ব'লে মনে হয়।

এই শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকেই বাংলা গদ্যকবিতার সূচনা হয়। সূচনা হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [১] ও তিরিশের বিখ্যাত কবিদের [২] হাতে।

[১] "পুনশ্চ", "শেষ সপ্তক", "পত্রপুট" ও "শ্যামলী"।

[২] বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্ত, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখ তিরিশের সব প্রধান কবিই গদ্যকবিতার চর্চা করেন ; একা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত জীবনে কখনো গদ্যকবিতা লেখেননি। এঁদের পূর্বসূরীদের

চতুর্থ দশকে গদ্যকবিতার চর্চা সাধারণভাবে বামপন্থী কবিদের হাতে বিশাল বিস্তারলাভ করে। [৩]

সাধারণভাবে বলা যেতে পারে : জীবনানন্দ হয়তো এইসব সমকালিক সূচনার দ্বারা প্রাথমিক উদ্বোধিত হয়েছিলেন ; তাঁর কবিতার আভ্যন্তর যাত্রার কারণও ছিলো। এসবের ফলাফল : জীবনানন্দের কবিতা আর-একটু বিস্তারিত হয়।

প্রথম পর্যায়ে (ব. সে.) জীবনানন্দের গদ্যকবিতা ছিলো তাঁর তৎকালিক অপরাপর কবিতার মতোই পরম রোমান্টিক : আলো-প্রেম-নিসর্গের রূপ সন্ধান ক'রে ফিরেছে। 'হাওয়ার রাত' কবিতায় দীর্ঘ-দীর্ঘ পঙক্তি যেন বিস্তীর্ণ বায়ুস্রোতকে ধরবার চেষ্টা করেছে, স্মৃতির ভিতর দিয়ে রাত্রি জ্বলমান। নিসর্গকেন্দ্রিক উপর্যুপরি উপমার ব্যবহারে নিশীথসৌন্দর্য আরো সজীব ও প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠেছে :

১. মশারিটা ফুলে উঠেছে কখনো মৌশুমী সমুদ্রের পেটের মতো,

২. স্বাতী তারার কোল ঘেঁষে নীল হাওয়ার সমুদ্রে
শাদা বকের মতো উড়ছে সে।

৩. অন্ধকার রাতে অশ্বত্থের চূড়ায় প্রেমিক চিলপুরুষের
শিশির-ভেজা চোখের মতো
ঝলমল করছিল সমস্ত নক্ষত্রেরা ;

মধ্যে মোহিতলাল মজুমদার ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কখনো গদ্যকবিতা লেখেননি ; নজরুল ইসলাম তাঁর একটিমাত্র গদ্যকবিতায় গদ্যকবিতাকে আতীব্র আক্রমণই করেছিলেন ; কেবল আশ্চর্য আধুনিক যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তই কএকটি সফল গদ্যকবিতার সৃজয়িতা।

[৩] এঁরা হচ্ছেন : সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, গোলাম কুদ্দুস, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, জগন্নাথ চক্রবর্তী, চিত্ত ঘোষ, অরুণ মিত্র, দিনেশ দাশ, কৃষ্ণ ধর, রাম বসু, লোকনাথ ভট্টাচার্য, সিদ্ধেশ্বর সেন প্রমুখ।

মহীউদ্দীন, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, আ. ন. ম. বজলুর রশীদ—তৃতীয় দশকের আমাদের এইসব কবিও অল্পবিস্তর গদ্যকবিতার চর্চা করেন। চতুর্থ দশকের আমাদের কবি ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান, সিকান্দার আবু জাফর, আহসান হাবীব, আবুল হোসেন, সানাউল হক প্রমুখ প্রচুর গদ্যকবিতা লেখেন।

৪. জ্যোৎস্নারাতে বেবিলনের রাণীর ঘাড়ের ওপর চিতার
উজ্জ্বল চামড়ার
শালের মতো জ্বলজ্বল করছিল বিশাল আকাশ।

৫. আর উত্তুঙ্গ বাতাস এসেছে আকাশের বুক থেকে নেমে
আমার জানালার ভিতর দিয়ে, শাঁই শাঁই করে,
সিংহের হুঙ্কারে উৎক্ষিপ্ত হরিৎ প্রান্তরের অজস্র জেব্রার মতো।

৬. মিলনোম্মত্ত বাঘিনীর গর্জনের মতো অন্ধকারের
চঞ্চল বিরাট সবুজ রোমশ উচ্ছ্বাসে

৭. আমার হৃদয় পৃথিবী ছিঁড়ে উড়ে গেল,
নীল হাওয়ার সমুদ্রে স্ফীত মাতাল বেলুনের মতো গেল উড়ে,
একটা দূর নক্ষত্রের মাস্তুলকে তারায় তারায় উড়িয়ে নিয়ে চলল
একটা দুরন্ত শকুনের মতো।

'শিকার' কবিতাটিতে উপমার হাট ব'সে গেছে যেন :

১. আকাশের রঙ ঘাসফড়িঙের দেহের মতো কোমল নীল :

২. চারিদিকে পেয়ারা ও নোনার গাছ টিয়ার পালকের মতো সবুজ।

৩. একটি তারা এখনো আকাশে রয়েছে :
পাড়াগাঁর বাসরঘরে সবচেয়ে গোধূলি-মদির মেয়েটির মতো ;

৪. মোরগ ফুলের মতো লাল আগুন,

৫. সকালের আলোয় টলমল শিশিরে চারিদিকের বন ও আকাশ
ময়ূরের সবুজ নীল ডানার মতো ঝিলমিল করছে।

৬. কচি বাতাবি লেবুর মতো সবুজ সুগন্ধি ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে
খাচ্ছে ;

৭. ঘুমহীন ক্লান্ত বিহ্বল শরীরটাকে স্রোতের মতো একটা
আবেগ দেওয়ার জন্য

৮. অন্ধকারের হিম কুঞ্চিত জরায়ু ছিঁড়ে ভোরের রৌদ্রের মতো
একটা বিস্তীর্ণ উল্লাস পাবার জন্য ;

৯. এই নীল আকাশের নিচে সূর্যের সোনার বর্শার মতো
জেগে উঠে

১০. নদীর জল মচকাফুলের মতো লাল।

বস্তুত "বনলতা সেন"-এর গদ্যকবিতাগুচ্ছে উপমার অজস্রতা চোখে আঙুল দিয়ে এর রূপের দিকে দেখিয়ে দ্যায়। বিচ্ছিন্ন একমুঠো :

১. নীল আকাশে খই ক্ষেতের সোনালি ফুলের মতো অজস্র তারা,
[আমি যদি হতাম]

২. সোনার ডিমের মতো
ফাল্গুনের চাঁদ।
[ঐ]

৩. খররৌদ্রে পা ছড়িয়ে বর্ষীয়সী রূপসীর মতো ধান ভানে—গান
গায়—গান গায়
এই দুপুরের বাতাস।
[আমাকে তুমি]

৪. আমারো ইচ্ছা করে ঘাসের এই ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো
গেলাসে গেলাসে পান করি,
[ঘাস]

যে-নির্বস্তুক উপমায় জীবনানন্দীয় বিশিষ্টতা, কবির গদ্যকবিতায়ও তা স্বাভাবিকভাবে ফলবান :

১. আবার আকাশে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠছে :
আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মতো এই অন্ধকার।
[নগ্ন নির্জন হাত]

২. নিজের হৃদয়কে নিয়ে মৌমাছির মতো নিমগ্ন হ'য়ে আছে দেখি।
[বেড়াল]

৩. সূর্যের আলোয় তার রঙ কুঙ্কুমের মতো নেই আর ;
হয়ে গেছে রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো।
[শিকার]

৪. মরণের পরপারে বড় অন্ধকার
এই সব আলো প্রেম ও নির্জনতার মতো।
[আমাকে তুমি]

৫. যে আমাকে চিরদিন ভালোবেসেছে
অথচ যার মুখ আমি কোনোদিন দেখিনি,
সেই নারীর মতো
ফাল্গুন আকাশে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠছে।
[নগ্ন নির্জন হাত]

জীবনানন্দের স্বভাবী চিত্রময়তা "বনলতা সেন"-এর গদ্যকবিতাবলিতে অজস্রভাবে রূপ-রঙ ফলিয়ে তুলেছে। উদ্ধৃতাংশগুলি অপরূপ চিত্রল। কবির বর্ণ, শব্দ, উপমা, প্রতিমা ইত্যাদি অজস্রধারে বর্ষেছে যেন এইসব কবিতায়। জীবনানন্দের ছন্দোবন্ধ কবিতায় যেমন, তেম্নি গদ্যকবিতায়ও দীর্ঘ-দীর্ঘ পঙক্তি ব্যবহৃত। এরকম একএকটি দীঘল পঙক্তি অনেকসময় এক লাইনে ধরেনি, ভেঙে গাড়িয়ে গেছে পরের লাইনে :

১. অন্ধকার রাতে অশ্বত্থের চূড়ায় প্রেমিক চিলপুরুষের
শিশির-ভেজা চোখের মতো ঝলমল করছিল সমস্ত নক্ষত্রেরা ;

[হাওয়ার রাত]

২. জ্যোৎস্নারাতে বেবিলনের রাণীর ঘাড়ের ওপর চিতার
উজ্জ্বল চামড়ার শালের মতো জ্বলজ্বল করছিল বিশাল আকাশ।

[ঐ]

৩. কাল তারা অতিদূর আকাশের কুয়াশায় কুয়াশায়
দীর্ঘ বর্শা হাতে করে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে যেন—

[ঐ]

৪. ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।

[ঘাস]

৫. অন্ধকারের হিম কুঞ্চিত জরায়ু ছিঁড়ে ভোরের রৌদ্রের মতো
একটা বিস্তীর্ণ উল্লাস পাবার জন্য।

[শিকার]

৬. সকালের আলোয় টলমল শিশিরে চারিদিকের বন ও আকাশ
ময়ূরের সবুজ নীল ডানার মতো ঝিলমিল করছে।

[ঐ]

৭. হঠাৎ ভোরের আলোর মূর্খ উচ্ছ্বাসে নিজেকে পৃথিবীর জীব
বলে বুঝতে পেরেছি আবার ;

[অন্ধকার]

৮. সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন কোটি কোটি
শুয়োরের আর্তনাদে উৎসব শুরু করেছে।

[ঐ]

তেষট্টি

৯. অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো
মিশে থাকতে চেয়েছি।

[ঐ]

১০. খররৌদ্রে পা ছড়িয়ে বর্ষীয়সী রূপসীর মতো ধান ভানে—
গান গায়—গান গায়—

[আমাকে তুমি]

রবীন্দ্রনাথও তাঁর গদ্যকবিতায় অনেকসময় দীর্ঘ পঙ্‌ক্তি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তার স্বরস্বনন আলাদা। যেমন :

অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোক উধাও পৃথিবী,
গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যাননিমগ্না পৃথিবী,
নীলাম্বুরাশির অতন্দ্রতরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী,
অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।
একদিকে আপক্বধান্যভারনম্র তোমার শস্যক্ষেত্র,
সেখানে প্রসন্ন প্রভাতসূর্য প্রতিদিন মুছে নেয় শিশিরবিন্দু
কিরণ-উত্তরীয় বুলিয়ে দিয়ে।
অস্তগামী সূর্য শ্যামশস্যহিল্লোলে রেখে যায় অকথিত এই বাণী—
'আমি আনন্দিত'।
অন্যদিকে তোমার জলহীন ফলহীন আতঙ্কপান্ডুর মরুক্ষেত্রে
পরিকীর্ণ পশুকঙ্কালের মধ্যে মরীচিকার প্রেতনৃত্য।

[তিন সংখ্যক কবিতা, পত্রপুট]

জীবনানন্দের দীর্ঘপঙ্‌ক্তিময় গদ্যকবিতাগুচ্ছের সুর-স্বর-স্বনন সম্পূর্ণ অন্যরকম। রবীন্দ্রনাথের এই সংস্কৃত, গম্ভীর, যুক্তাক্ষরবহুল শব্দমালার বিপরীতে সেখানে চলিত, হালকা, ছিপছিপে, যুক্তাক্ষরবর্জিত শব্দসমাবেশ। তার ভিতর কখনো আছে দীর্ঘ পঙ্‌ক্তিবহুল কবিতা ('হাওয়ার রাত'), কখনো ছোটো গদ্যছন্দস্পন্দময় আবৃত্তপদপঙ্‌ক্তিময় কবিতা ('আমি যদি হতাম'), কখনো পর-পর ছোটো-বড়ো পঙ্‌ক্তি বুনে কবিতা ('শিকার', 'আমাকে তুমি')। পুনরাবৃত্ত শব্দ ও পঙ্‌ক্তি তাঁর গদ্যকবিতাকেও ক'রে তুলেছে সুরেলা ও গতিমান। 'হাওয়ার রাত' কবিতায় প্রথম স্তবকের শেষে 'কাল এমন চমৎকার রাত ছিল।' দ্বিতীয় স্তবকান্তে ঈষৎ-পরিবর্তিত হ'য়ে 'কাল এমন আশ্চর্য রাত ছিল।' তৃতীয় স্তবকে পর-পর কএকটি প্রশ্নের অভি-ঘাত : 'মৃত্যুকে দলিত করবার জন্য ?/ জীবনের গভীর জয় প্রকাশ করবার জন্য ?/প্রেমের ভয়াবহ গম্ভীর স্তম্ভ তুলবার জন্য ?' 'আমি যদি হতাম'

কবিতার প্রথম চারটি পঙ্‌ক্তি ('আমি যদি হতাম বনহংস/বনহংসী হতে যদি তুমি ;/ কোনো এক দিগন্তের জলসিঁড়ি নদীর ধারে/ধানক্ষেতের কাছে।') ফিরে এসেছে পঙ্‌ক্তিশেষে—প্রথম স্তবকটি অবশ্য আরো দীর্ঘ, শেষে ঐ প্রথমাংশ ফিরে এসে সেই আবহে স্থাপিত করেছে ফের আমাদের। 'ঘাস' কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তিতে ঘাস শব্দটির মুহুর্মুহু প্রয়োগ : 'ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার/শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।' 'নগ্ন নির্জন হাত' কবিতায় কবি যখন বলেন 'অনেক কমলা রঙের রোদ ছিল,/অনেক কাকাতুয়া পায়রা ছিল,/মেহগনির ছায়াঘন পল্লব ছিল অনেক ;/অনেক কমলা রঙের রোদ ছিল,/অনেক কমলা রঙের রোদ' তখন 'ছিল' ক্রিয়াপদটি ক্রমাগত ব্যবহৃত হ'য়ে এক অতীত জগতের জন্যে দৃশ্যমান ব্যথা জাগিয়ে দিয়ে যায়। 'অন্ধকার' কবিতার প্রথমাংশ :

> গভীর অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর চ্ছলচ্ছল শব্দে জেগে উঠলাম
> আবার
> তাকিয়ে দেখলাম পাণ্ডুর চাঁদ বৈতরণীর থেকে তার অর্ধেক ছায়া
> গুটিয়ে নিয়েছে যেন
> কীর্তিনাশার দিকে।
> ধানসিঁড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়েছিলাম--পউষের রাতে—
> কোনোদিন আর জাগব না জেনে
> কোনোদিন জাগব না আমি,—কোনোদিন জাগব না আর—

কবিতান্ত্যে ফিরে আসে তাৎপর্যময় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে :

> অরব অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর চ্ছলচ্ছল শব্দে জেগে উঠব না আর
> তাকিয়ে দেখব না নির্জন বিমিশ্র চাঁদ বৈতরণীর থেকে
> অর্ধেক ছায়া গুটিয়ে নিয়েছে
> কীর্তিনাশার দিকে।
> ধানসিঁড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়ে থাকব—ধীরে—পউষের রাতে—
> কোনোদিন জাগব না জেনে—
> কোনোদিন জাগব না আমি—কোনোদিন আর।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্যকবিতার চর্চায় সৌন্দর্যসন্ধান থেকে অনেক সময় নেমে এসেছিলেন সাধারণ মানুষের ও আটপৌরে জীবনের মধ্যে—এমনকি

৫—

কবিতাকে আহত ক'রেই। জীবনানন্দে আমরা দেখতে পাই তাঁর ছন্দোবন্ধ কবিতার মতোই গদ্যকবিতাও সুন্দরকে ধরবার আয়োজন করেছে। 'হাওয়ার রাত' ও 'ঘাস' কবিতায় নিসর্গপ্রতিমা, 'নগ্ন নির্জন হাত' কবিতায় দূর ইতিহাসবেদ, 'আমি যদি হতাম' কবিতায় প্রেমমূলকতা, 'শিকার' ও 'অন্ধকার' কবিতায় মৃত্যুচ্ছায়া— এসব জীবনানন্দের কবিতায় ঘুরে-ফিরে এসেছে বারবার। "বনলতা সেন"-পর্যায়ী সমস্ত গদ্যকবিতার কেন্দ্রে ও প্রসারে আছে নিসর্গ। অবশ্য জীবনানন্দের কবিতার সাধারণ লক্ষণই এই প্রাকৃতিক কেন্দ্রমাণ। রবীন্দ্রনাথের মতো গদ্যকবিতায় তিনি কোনো আলাদা পৃথিবী তৈরি করেননি—তা তাঁর ছন্দোবন্ধ কবিতারই সম্প্রসার। কবির উপমা ও প্রতিমা ব্যবহারের পৌনঃপুনিকতা, শব্দ ও পঙক্তি ও স্তবকের পুনরাবৃত্তি, ললিত শব্দের ব্যবহার—কবির এসব কুশলতাগুলি এখানেও প্রযুক্ত।

দ্বিতীয় পর্যায়ের (মহা.) গদ্যকবিতায় পটভূমি স'রে গেছে—গ্রাম থেকে শহরে। এইখানে নিসর্গপ্রকৃতির পিছুটানই প্রধান দ্রষ্টব্য : 'শহরের গ্যাসের আলো ও উঁচু উঁচু মিনারের ওপরেও দেখেছি—নক্ষত্রেরা/অজস্র বুনো হাঁসের মতো কোন দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে উড়ে চলেছে।' (শহর) প্রথম পর্যায়ের তীব্র ইন্দ্রিয়ঘনিমা ও উপর্যুপরি উপমাপ্রয়োগ নেই আর এখন। মৃত্যু, ধ্বংস ও বিনষ্টির ভাবনা দখল করেছে কবিকে :

১. যত দূর যাই কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ
শেষ সোনালি হরিণ-শস্য কেটে নিয়েছে যেন।

[মুহূর্ত]

২. এইসব শীতের রাতে আমার হৃদয় মৃত্যু আসে।

[শীতরাত]

৩. স্থূল হাতে ব্যবহৃত হ'য়ে তবু তুমি মাটির পৃথিবীতে
হারিয়ে যাচ্ছো ;
আমি হারিয়ে যাচ্ছি সুদূরদ্বীপের নক্ষত্রের ছায়ার ভিতর।

[আদিম দেবতারা]

৪. কোন দূর সবুজ ঘাসের দেশ নদী জোনাকির কথা মনে পড়ে
আমার ;

তারা কোথায় ?
তারা কি হারিয়ে গেছে ?

[ফুটপাথে]

আবেগের উত্তালতা, ভাষার উদ্দামতা—আগের পর্বের—এখন অনেক শমিত হ'য়ে এসেছে। বদলে দেখা দিয়েছে বঙ্কিম ও তির্যক দ্যুতি, অবচেতনের উদ্ঘাট, ব্যঙ্গ, ঘৃণা, ক্রোধ। 'শিকার' কবিতার মৃত্যুচেতনা "মহাপৃথিবী"-পর্যায়ী কবিতায় আরো প্রবল ও দীপ্র হয়েছে ; যে- নাস্তিচৈতন্য চূড়া স্পর্শ করেছিলো 'অন্ধকার' কবিতায় এখানে তা তীব্রতা মুছে ছড়িয়ে গেছে চতুর্দিকে, যা ছিলো ক্ষণিক একটি বোধ তা এখন ব্যাপ্ত বোধে পরিণত হয়েছে।

অগ্রন্থিত গদ্যকবিতা-দশমীর মধ্যে 'হঠাৎ-মৃত্যু' (মহা. সংযোজনাংশ : 'আমিষাশী তরবার') বুনো হাঁস-রূপসী-কবি এইসব আকস্মিক-মৃতদের জন্যে এক করুণার্দ্র পরিবেশন। ব. সে.-র গদ্যকবিতাগুচ্ছে যদি হৃদয়ের উম্মুক্তি প্রধান হয়, তবে মহা.-র গদ্যকবিতাবলিতে মননশাসনই মুখ্য।... 'সুন্দরবনের গল্প' কবিতাটি প্রায়-যতিচিহ্নহীন (কেবল তিনটি ড্যাশ বাদে) ; সেই হিশেবে সপ্তম দশকের বাংলা কবিতায় যতিচিহ্নহীনতার যে-রীতি প্রবর্তিত হয়েছে—তার প্রথম অগ্রসূরী হিশেবে চিহ্নিত হ'তে পারে। ইন্দ্রিয়বেদে এই কবিতাটি "বনলতা সেন"-পর্যায়ী গদ্যকবিতার স্মারক।

গদ্যকবিতাকেও হ'তে হবে কবিতা, জীবনানন্দের এই নিশ্চিত বিশ্বাস ছিলো ব'লেই, তখনই, তাঁর সমকালে রচিত গদ্যকবিতা যখন ভ্রষ্ট হয়েছে জীবনানন্দ তখনই তাকে আশ্চর্যভাবে কিংবা অনায়াসে শনাক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কিংবা চল্লিশের গদ্যকবিতা যখন বিপথগামী হয়েছে, জীবনানন্দ তাকে চিহ্নিত করতে ভোলেননি—

১. আমাদের দেশে গদ্যকবিতার দাবি নানারকম অদেয় জিনিস চাইছিল যখন খানিকটা রবীন্দ্রনাথেরও সমর্থনে ;

[দেশ কাল ও কবিতা, ক. ক.]

২. আমাদের দেশে যে-সব নতুন কবিরা দিব্যানুভূতিকে ঘৃণা করেন এবং স্থূল ও চিক্কন সুর মিশিয়ে কবিতা লেখেন—পদ্যে বা গদ্য-ছন্দে—তাঁদের কবিতা প্রধানত শ্লেষাত্মক এবং বর্তমান কালের সমগ্র পৃথিবীর সমাজব্যবস্থার অন্যায় ও অত্যাচারের মুখোস বার করে ফেলবার জন্যে প্রযুক্ত। রবীন্দ্রনাথও তাই চান, কিন্তু নিজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন প্রায়শই বিশুদ্ধ কাব্যের আবেগে।... আধুনিক বাংলা কবিতায় এইসব কবিই গদ্যপ্রায় পদ্যছন্দ অথবা

গদ্যছন্দ অবলম্বন করে চলেছেন—এবং বর্তমান সমাজ ও সভ্যতার শববাহনের কাজ চলেছে এঁদের কবিতায়। কিন্তু এসব লেখায় কোনো নতুন আশা ও দীপ্তির পরিচয় পাওয়া গেলে এহেন আধুনিক বাংলা কবিতার উপকার হত—সে পরিচয় তাঁদের আঙ্গিকে সঞ্চারিত হলে পদ্য বা গদ্য শরীরেও কবিতার জন্ম হত—আশা করা যায়।

[রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা, ক. ক.]

৩. জনগণ তখন আজকের মত ঈষৎ উন্নীত—কিংবা রূপান্তরিত ছিল না ; চমৎকার কবিতা চাচ্ছিল, (আজো জনমানস রকমফেরে তাই-ই চায়—যদিও) ; নজরুল সেই মন স্পর্শ করতে পেরেছিলেন এমনভাবে যে আজকের কারো কোনো জনসাধারণের জন্যে তৈরি কবিতা ফলত পদ্যের স্তরে নেমেও তা পেরেছে কিনা বলা কঠিন।

[নজরুলের কবিতা, জী. দা. গ-লে.]

একদিকে পতিত গদ্যকবিতার বিরুদ্ধে জীবনানন্দের এই আক্রমণ, অন্যদিকে গদ্যকবিতাকে আমর্ম অনুভব করেছিলেন ব'লেই তাঁর হাত থেকে এরকম বিশ্লেষণ বেরিয়ে আসে :

কাব্যের ছন্দ তো অনেক রকম ; গদ্যও তো একরকম ছন্দ। কবি যখন ভাবাক্রান্ত হন তখন চোখ তাঁর ছবি দেখে, কান শোনে ছন্দ এবং চোখও অনুভব করে যেন ছন্দবিন্দুৎ ; কোন ছন্দে কবিতাটি রচিত হবে মুহূর্তের ভিতরেই নির্ণীত হ'য়ে যায় অনেক সময় ; কারণ যে কোনো আবেগ যে কোনো ছন্দের রূপ পরিগ্রহ করতে পারে না, কবিপ্রেরণার তারতম্য অনুসারে ছন্দের জাতিনির্ণয় হয় ॥

[কবিতার আত্মা ও শরীর, ক. ক.]

[১৯৭৪-৭৫]

স নে ট

জীবনানন্দ দাশের কবিতা সাধারণভাবে শিথিলায়ত ; প্রকরণের প্রতি তাঁর নজর নেই তেমন যেন : শিথিলতাই তাঁর চারিত্র্য হ'য়ে উঠেছে। তাহ'লেও স্তবকবন্ধের প্রতি তাঁর মনোনিবেশের কএকটি উদাহরণ প্রাপ্তব্য ধূ. পা. গ্রন্থে ; এখানকার বেশ কএকটি দীর্ঘকবিতায় কবির স্তবক নির্মাণের সাক্ষ্য ধরা আছে : 'অনেক আকাশ', 'জীবন', 'প্রেম'।[১] এর মধ্যেকার দুটি কবিতা 'অনেক আকাশ' ও 'জীবন' স্পেনসরীয় স্তবকবনোট অনুসরণ করেছে। ঝ. পা. গ্রন্থে মোহিতলাল মজুমদারের প্রভাব, মনে হয়, পরবর্তী ধূ.পা.-র ভিতর এইভাবে প্রসারিত হ'য়ে এসেছে। মোহিতলালের 'নারীস্তোত্র' ("স্মরগরল") কবিতাটি এই স্তবকবন্ধে গঠিত। তিরিশের প্রধান কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ ও অজিত দত্ত এই স্তবকবন্ধে কবিতা লিখেছেন। স্পেনসরীয় স্তবকের উদ্ভাবক এডমাণ্ড স্পেনসর (?১৫৫২-৯৯), তাঁর "রাণী সন্দর্শনা" কবিতাগ্রন্থে প্রথম ব্যবহার করেন। পরে কীটস, বায়রন প্রমুখের দ্বারা ব্যবহৃত হ'য়ে চলে। এর মিল-বনোট ক খ ক খ খ গ খ গ গ ; প্রতি স্তবকে নয় পঙক্তি। জীবনানন্দ তাঁর উক্ত কবিতাদ্বয়ে এই পঙক্তিবিন্যাস ও মিলপদ্ধতি অবিকল অনুসরণ করেন। বাংলা কবিতায় স্পেনসরীয় স্তবকবন্ধ নির্মাণের তিনটি নজির এখানে পর-পর উদ্ধৃত ক'রে দিই :

১. হের, ওই চলিয়াছে পথে নারী যৌবন-উন্মনা—
অপাঙ্গ লালসা-লোল, স্মিত হাসি স্ফুরিছে অধরে ;
অধীর মঞ্জীর, তবু শ্রোণীভারে অলস-গমনা,
বসনের তলে দুটি স্তনচূড়া এখনো শিহরে।

[১] কবির অগ্রন্থিত দুটি কবিতা, 'আজ' ও 'আমরা'-ও প্রসঙ্গত স্মরণীয় (প্রযোজনাংশ)।

কাংস্যঘটে গঙ্গাজল—সদ্যস্নাতা ফিরে যায় ঘরে,
তপ্ততনু স্নিগ্ধ এবে, গেছে ক্লান্তি গত যামিনীর,
নাই লজ্জা, নাই খেদ ; মুক্তগতি মৃদুলীলাভরে
যায় চলি'—শুভ্রপক্ষ মরালী সে, ত্যজি' পঙ্ক-নীর !
অকুণ্ঠিত আনন্দের নির্ভয় মুরতি ও যে ভ্রষ্টা কামিনীর।

[নারীস্তোত্র, স্মরগরল : মোহিতলাল]

২. আজি চৈত্র-পূর্ণিমায় মালতী দুলালো হীরা-দুল্,
সিন্দুর-বিন্দুর 'পরে সাজাইল সোনালিয়া টিপ,
অলক দুলায়ে দিল, খোঁপায় গুঁজিল লাল ফুল,
সোনার প্রদীপ-ভাণ্ডে গন্ধতেলে জ্বালিল প্রদীপ—
চন্দন-অঙ্কনে স্নিগ্ধ স্তনযুগ—বিকশিত নীপ—
অতিসূক্ষ্ম হেমাঙ্কিত কাঁচুলিতে আবরিল সুখে,
দর্পণে হেরিল ছায়া বারম্বার, দেহ-মোহ-দ্বীপ
বিমুগ্ধা ধরণী-বক্ষে বিরচিল অসীম কৌতুকে,
অপরূপ মালতী সে—অধরে অমৃত তার, চুম্বন-কামনা তার বুকে।

[মালতী, কুসুমের মাস : অজিত দত্ত]

৩. মৃত্যুরে বন্ধুর মত ডেকেছি তো,—প্রিয়ার মতন !
চকিত শিশুর মত তার কোলে লুকায়েছি মুখ ;
রোগীর জ্বরের মত পৃথিবীর পথের জীবন ;
অসুস্থ চোখের 'পরে অনিদ্রার মতন অসুখ ;
তাই আমি প্রিয়তম ;—প্রিয়া ব'লে জড়ায়েছি বুক,—
ছায়ার মতন আমি হয়েছি তোমার পাশে গিয়া !—
যে-ধূপ নিভিয়া যায় তার ধোঁয়া আঁধারে মিশুক,—
যে-ধোঁয়া মিলায়ে যায় তারে তুমি বুকে তুলে নিয়া
ঘুমোনো গন্ধের মত স্বপ্ন হয়ে তার ঠোঁটে চুমো দিও, প্রিয়া !

[জীবন, ধূসর পাণ্ডুলিপি : জীবনানন্দ]

১

প্রকরণের প্রতি কবির মনোযোগের অপর উদাহরণ তাঁর সনেটগুচ্ছ। কবির জীবদ্দশায় গ্রন্থভুক্ত হয় মাত্র দু-টি সনেট :

ধূ. পা.-তে একটি ('শকুন') ও ব. সে.-তে একটি ('পথ হাঁটা')। কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত রূ. বা.-য় গৃহীত হয় সাতান্নোটি সনেট (১. তোমরা

যেখানে সাধ ; ২. বাংলার মুখ আমি ; ৩. যতদিন বেঁচে আছি ; ৪. একদিন জলসিঁড়ি ; ৫. আকাশে সাতটি তারা ; ৬. কোথাও দেখিনি, আহা ; ৭. হায় পাখি, একদিন ; ৮. জীবন অথবা মৃত্যু ; ৯. যেদিন সরিয়া যাব ; ১০. পৃথিবী রয়েছে ব্যস্ত ; ১১. ঘুমায়ে পড়িব আমি ; ১২. ঘুমায়ে পড়িব আমি ; ১৩. যখন মৃত্যুর ঘুমে ; ১৪. আবার আসিব ফিরে ; ১৫. যদি আমি ম'রে যাই ; ১৬. মনে হয় একদিন ; ১৭. যে শালিখ মরে যায় ; ১৮. কোথাও চলিয়া যাবো ; ১৯.তোমার বুকের থেকে ; ২০. গোলপাতা ছাউনির ; ২১. অশ্বত্থে সন্ধ্যার হাওয়া ; ২২. ভিজে হ'য়ে আসে মেঘ ; ২৩. খুঁজে তারে মরো মিছে ; ২৪. পাড়াগাঁর দু'পহর ; ২৫. কখন সোনার রোদ ; ২৬. এই পৃথিবীতে এক ; ২৭. কতো ভোরে—দু-পহরে ; ২৮. এই ডাঙা ছেড়ে হায় ; ২৯. এখানে আকাশ নীল ; ৩০. কোথাও মঠের কাছে ; ৩১. চ'লে যাবো শুকনো ; ৩২. এখানে ঘুঘুর ডাকে ; ৩৩. শ্মশানের দেশে তুমি ; ৩৪. তবু তাহা ভুল জানি ; ৩৫. সোনার খাঁচার বুকে ; ৩৬. কতোদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে ; ৩৭. এ-সব কবিতা আমি ; ৩৮. কতোদিন তুমি আর ; ৩৯. এখানে প্রাণের স্রোত ; ৪০. একদিন যদি আমি ; ৪১. দূর পৃথিবীর গন্ধে ; ৪২. অশ্বত্থ বটের পথে ; ৪৩. ঘাসের বুকের থেকে ; ৪৪. এই জল ভালো লাগে ; ৪৫. একদিন পৃথিবীর পথে ; ৪৬. পৃথিবীর পথে আমি ; ৪৭. মানুষের ব্যথা আমি ; ৪৮. তুমি কেন বহু দূরে ; ৪৯. আমাদের রূঢ় কথা ; ৫০. এই পৃথিবীতে আমি ; ৫১.বাতাসে ধানের শব্দ ; ৫২. একদিন এই দেহ ; ৫৩.আজ তারা কই সব ; ৫৪. কোনোদিন দেখিব না ; ৫৫. হৃদয়ে প্রেমের দিন ; ৫৬. ঘাসের ভিতরে যেই ; ৫৭. এইসব ভালো লাগে)। ধূ. প.-র কবির মৃত্যুপরবর্তী সংযোজন-অংশে যুক্ত হয় ন'টি সনেট (১. 'অঘ্রাণ' ; ২. 'শীতশেষ' ; ৩. 'এইসব' ; ৪. 'তাই শান্তি' ; ৫. 'পায়রারা' ; ৬. 'যেন এক দেশলাই' ; ৭. 'এই শান্তি' ; ৮. 'বুনো হাঁস' ; ৯. 'নদীরা')। ধূ. পা.-র সংযোজনাংশের 'পৃথিবীতে থেকে' শিরোনামে যে-চারটি কবিতা আছে, তার তিনটি সনেট (১. 'তোমার শরীরে' ; ২. 'একরাশ পৃথিবীরে' ; ৩. 'তোমারে দেখেছি তাই')। এছাড়া কবির একেবারে প্রথম-জীবনে রচিত দুটি চতুর্দশপদীর সন্ধান পাওয়া গেছে (১. 'ভারতবর্ষ' ; ২. 'বিজয়ী')।—তাহ'লে জীবনানন্দের এখন-পর্যন্ত প্রাপ্ত বা প্রকাশিত সনেট বা সনেটকল্প কবিতার মোট সংখ্যা : তিয়াত্তর।

কবির জীবদ্দশায় গ্রন্থমধ্যে স্থানপ্রাপ্ত সনেটদ্বয় নিটোল-শরীরী। 'শকুন' ও 'পথ হাঁটা'—দুটিই অক্ষরবৃত্তে ছাব্বিশ মাত্রার পঙক্তিসম্পন্ন : ৮. ৮. ১০. পর্বে বিভক্ত এক-একটি পঙক্তি। রূ. বা.-র বহু সনেটে এই নিটোলতা নষ্ট হ'য়ে গেছে ; তার কারণ প্রথমবার লিখবার পরে কবি পরিশোধনের সময় পাননি—সারা বইখানি একটি খশড়ার মতো মনে হয়। এখানকার অধিকাংশ কবিতা বাইশ মাত্রায় সম্পন্ন : ৮. ৮. ৬. পর্বে বিভক্ত এক-একটি পঙক্তি। মনে হয় : এই বইএ বাইশ মাত্রার পঙক্তিতেই কবি সনেটগুলি লিখতে চেয়েছিলেন ; শেষদিকে, দেখা যাচ্ছে, একই সনেটে বিভিন্ন মাপের এক-একটি পঙক্তি—সম্ভবত এগুলি প্রথম লেখন, এবং লিখেছিলেন হয়তো অতিদ্রুত, একটি ভাবাবেগে তাড়িত হ'য়ে, একটি সংবেদন নষ্ট হ'য়ে যাবার ভয়ে—অতিদ্রুত। (কবিভ্রাতা অশোকানন্দ দাশের সাক্ষ্য অনুসারে : 'পঁচিশ বছর আগে খুব পাশাপাশি সময়ের মধ্যে একটি বিশেষ ভাবাবেগে আক্রান্ত হ'য়ে কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল।' ভূমিকা, রূ. বা.)। মনে হয় : রূ. বা. যথার্থভাবে সম্পাদিত হয়নি : সনেট নয়—এরকম চারটি কবিতা এখানে প্রক্ষিপ্তভাবে ঢুকে পড়েছে (সেইদিন এই মাঠ ; সন্ধ্যা হয়—চারিদিকে ; একদিন কুয়াশায় ; ভেবে-ভেবে ব্যথা পাবো)। আভ্যন্তর বিষয়ের দিক থেকে দেখলে, এগুলি, অবশ্য, এই কাব্যে, প্রবেশাধিকার পায়। কিন্তু এই দাবি তো করতে পারে ধূ. পা.-তে কবির মৃত্যুর পরে সংযোজিত সনেটগুচ্ছও—বিষয় ও বিন্যাস দু-দিক থেকেই। রূ. বা. ও ধূ. পা.-র সংযোজিত সনেটগুচ্ছ প্রায় সমসময়েই রচিত ব'লে মনে হয়। বস্তুত এই পর্বেই জীবনানন্দ সর্বাধিক সনেট লিখেছেন : তাঁর তিয়াত্তরটি সনেটের মধ্যে উনসত্তরটিই এই পর্যায়ে রচিত। প্রথম-বয়সে-লেখা সনেট-দু'টি চোদ্দো মাত্রার অক্ষরবৃত্তে—পরে কবি চোদ্দো মাত্রায় লেখেননি আর।

কবি বাইশ, ছাব্বিশ ও অসমান মাত্রার সনেট রচনা করেছেন[২] sonnet-sequence বা সনেট-পরম্পরা রচনাতেই জীবনানন্দ যেন আগ্রহী ছিলেন বেশি : রূ. বা. বইখানি আসলে একটি দীর্ঘ সনেট-পরম্পরা : লক্ষণীয়—প্রথম পঙক্তির অংশ দিয়ে কবিতাগুলি আমরা চিহ্নিত করলেও

[২] বস্তুত সে-সময়ে দীর্ঘ পঙক্তিসম্পন্ন কবিতা লেখার একটা ঢেউ গেছে : বুদ্ধদেব বসুর "পৃথিবীর পথে" বইএর 'অসূর্যম্পশ্যা' ও 'আর-কিছু নাহি সাধ' ছাব্বিশ মাত্রার ও 'সুদূরিকা' বাইশ মাত্রার সনেট ; ১৩৪৮ সালে লিখিত মোহিতলালের "স্বপনপসারী"-র মাত্রাসম্পন্ন পঙক্তির সনেট রচনাকেই আদর্শ

মূলত কবিতাগুলি নামহীন, সমস্ত কবিতা অধীন একটিমাত্র "রূপসী বাংলা" নামের। অশোকানন্দ দাশ লিখেছিলেন, 'কবির কাছে "এরা প্রত্যেকে আলাদা-আলাদা স্বতন্ত্র সত্তার মতো নয় কেউ, অপরপক্ষে সার্বিকবোধে একশরীরী ; গ্রামবাংলার আলুলায়িত প্রতিবেশ-প্রসূতির মতো ব্যষ্টিগত হয়েও পরিপূরকের মতো পরস্পরনির্ভর।..." ' (ভূমিকা, রূ. বা.) ধূ. পা.-র সংযোজিত 'পৃথিবীতে থেকে' শীর্ষক কবিতা-চতুরঙ্গও (একটি কবিতা বাদে) সনেট-পরম্পরা।

জীবনানন্দ ইতালীয় বা শেক্‌স্‌পীয়রীয় কোনো-একটি সনেটবন্ধের অনুসরণ করেননি : বরং বলা চলে তাঁর রচনায় আছে উভয়ের মিশোল। 'ভারতবর্ষ' ও 'বিজয়ী' সনেটদ্বয় সনেটের নিয়মানুগ। 'শকুন' ও 'পথ হাঁটা' সনেটদ্বয় অষ্টক-ষটকে বিভক্ত না-হ'য়ে, কোনোরকম চতুষ্ক গঠন না-ক'রে, বরং তিন পঙক্তির চারটি স্তবক রচনা করেছে ; শেষ পঙক্তিযুগ শেক্‌স্‌পীয়রীয় রীতির মতো পরস্পর মিলবদ্ধ (লেগুন/হূন ; ভিতর/পর)। রূ. বা.-র সনেটমালা অষ্টক-ষটকে বিভক্ত বটে, কিন্তু ভাবের পৃথকতা নেই, কাজেই অষ্টক-ষটকের মূল নিয়ম পালিত হয়নি, বরং এক-একটি চতুর্দশপদী এক-একটি মনোভাবনার প্রতিফলক। মনোভাবনার প্রতিফলক হিশেবে রচিত ব'লেই সনেটের নিটোলতা তাঁর কোনো সনেটেই রক্ষিত হয়নি ; বাইশ ও ছাব্বিশ মাত্রার পঙক্তিতে এমনিতেই শিথিল ও বিস্তৃত হ'য়ে পড়েছে। তবে, একটি মনোভাবনার প্রতিফলক হিশেবে—মৌহূর্তিক মনুমেন্ট হিশেবে—কবিতা হিশেবে জীবনানন্দের এইসব চতুর্দশপদী সফল।[৩]

জীবনানন্দের চার ধরনের চারটি চতুর্দশপদী কবিতার নিদর্শন এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হ'লো। চোদ্দো মাত্রার অক্ষরবৃত্তে কবি ফিরে যাননি আর, প্রথম উদাহরণটি তার নিদর্শন। দ্বিতীয় সনেটটিতে কবির দীঘল

মনে করতেন। আসলে বুদ্ধদেব-জীবনানন্দরাই সনেটের পঙক্তির মাত্রা আরো দীর্ঘ ক'রে বাইশ ও ছাব্বিশ মাত্রায় পৌঁছিয়ে দ্যান। মধুসূদনের চোদ্দো মাত্রা থেকে বুদ্ধদেব-জীবনানন্দের ছাব্বিশ মাত্রার পঙক্তি রচনা সনেটের ইতিহাসে তাৎপর্যময়। আরো : রূ. বা.-য় অসমান পঙক্তির সনেট রচনার সাহসেই কি বুদ্ধদেব বসু অসমান পঙক্তির সনেট রচনা করেন তাঁর "যে-আঁধার আলোর অধিক" গ্রন্থে ?

[৩] রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ—বাংলা সাহিত্যের এই দুই প্রধান কবির মধ্যে আবার আর-একটি সাযুজ্য ধরা পড়ছে : রবীন্দ্রনাথও জীবন ভ'রে বহু চতুর্দশপদী কবিতা লিখেছেন, কিন্তু খাঁটি সনেট লিখবার আগ্রহ ছিলো তাঁর কম : দুই কবিই যুক্তির চেয়ে অনেক-বেশি আবেগ- ও যুক্তি-প্রধান।

মাত্রা ও স্তবকবিন্যাসের প্রয়োগ দ্রষ্টব্য—কবির কএকটি সনেট এরকম (ধূ. পা.-র 'শকুন', ব. সে.-র 'পথ হাঁটা', ধূ. পা.-র সংযোজনাংশের 'অঘ্রাণ', 'শীত শেষ', 'এইসব', 'তাই শান্তি', 'পায়রারা', 'যেন এক দেশলাই', 'এই শান্তি', 'বুনো হাঁস'—মোট দশটি)। তৃতীয় সনেটটির ধরনে কবি অধিকাংশ সনেট লিখেছেন। চতুর্থ সনেটটিতে কবি অসমান মাত্রার পঙক্তি ব্যবহার করেছেন—এরকম সনেটও বেশ-কিছু আছে কবির।

১. বিজয়ী

নহি আমি উঞ্ছবৃত্তি, উদাসী ভিক্ষুক ;
দ্বারে দ্বারে যাচ্ঞা মাগি' বেড়ায় না মন।
মোর তাই নাই শঙ্কা, নাই নিষ্পেষণ ;
নম্র নহে শির মোর,—নত নহে বুক।
বিজয়ী সৈনিক আমি, আমার কার্মুক
করিতেছে অহরহ অসত্য খণ্ডন ;
টঙ্কারে টঙ্কারে ভরি' ধরার অঙ্গন
ছুটিতেছে চিত্ত মোর উৎসাহী, উৎসুক।

কোথায় চকিত ভীত যাত্রিকের দল ?
নির্জিতা বসুধা কোথা ? নিপীড়িত জীব !
কোথা হিংসা, অত্যাচার, অসুরের বল !
কোথা সিংহাসন জুড়ে' জেগে' আছে ক্লীব !
আছি আমি সব্যসাচী,—দৃপ্ত, অচঞ্চল,
হস্তে মোর অনিদ্রিত উদ্যত গাণ্ডীব।

['গণবাণী', ২৭ শ্রাবণ ১৩৩৩]

২. পথ হাঁটা

কি এক ইশারা যেন মনে রেখে একা একা শহরের পথ থেকে পথে
অনেক হেঁটেছি আমি ; অনেক দেখেছি আমি ট্রাম-বাস সব ঠিক চলে ;
তারপর পথ ছেড়ে শান্ত হয়ে চলে যায় তাহাদের ঘুমের জগতে :

সারা রাত গ্যাসলাইট আপনার কাজ বুঝে ভালো করে জ্বলে।
কেউ ভুল করে নাকো—ইঁট বাড়ি সাইনবোর্ড জানালা
কপাট ছাদ সব
চুপ হয়ে ঘুমাবার প্রয়োজন বোধ করে আকাশের তলে।

একা একা পথ হেঁটে এদের গভীর শান্তি হৃদয়ে করেছি
অনুভব ;
তখন অনেক রাত—তখন অনেক তারা মনুমেন্ট মিনারের মাথা
নির্জনে ঘিরেছে এসে ;—মনে হয় কোনোদিন এর চেয়ে
সহজ সম্ভব

আর কিছু দেখেছি কি : একরাশ তারা-আর-মনুমেন্ট-ভরা
কলকাতা ?
চোখ নিচে নেমে যায়—চুরুট নীরবে জ্বলে—বাতাসে অনেক
ধুলো খড় ;
চোখ বুজে একপাশে সরে যাই—গাছ থেকে অনেক বাদামী জীর্ণ
পাতা

উড়ে গেছে ; বেবিলনে একা একা এমনই হেঁটেছি আমি
রাতের ভিতর
কেন যেন ; আজো আমি জানিনাকো হাজার হাজার ব্যস্ত
বছরের পর।

[বনলতা সেন]

৩. আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে ;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায় ;
হয়তো বা হাঁস হ'ব—কিশোরীর—ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,
সারা দিন কেটে যাবে কলমীর গন্ধ ভরা জলে ভেসে ভেসে ;
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে
জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায় ;

হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে ;
হয়তো শুনিবে লক্ষ্মীপেঁচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে ;
হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে ;
রূপসীর ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক শাদা ছেঁড়া পালে
ডিঙা বায় ;—রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে
দেখিবে ধবল বক : আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে—
[রূপসী বাংলা]

৪. পৃথিবীর পথে আমি বহুদিন বাস ক'রে হৃদয়ের নরম কাতর ২৬
অনেক নিভৃত কথা জানিয়াছি ; পৃথিবীতে আমি বহুদিন ২২
কাটায়েছি ; বনে বনে ডালপালা উড়িতেছে—যেন পরী জিন্ ২২
কথা কয় ; ধূসর সন্ধ্যায় আমি ইহাদের শরীরের 'পর ২২
খইয়ের ধানের মতো দেখিয়াছি ঝরে ঝর্‌ঝর্ ১৮
দু'-ফোঁটা মাঘের বৃষ্টি,—শাদা ধুলো জলে ভিজে হয়েছে মলিন ২২
ম্লান গন্ধ মাঠে ক্ষেতে...গুবরে পোকার তুচ্ছ বুক থেকে ক্ষীণ ২২
অস্পষ্ট করুণ শব্দ ডুবিতেছে অন্ধকারে নদীর ভিতর : ২২
এইসব দেখিয়াছি ; দেখিয়াছি নদীটিরে—মজিতেছে ঢালু অন্ধকারে ; ২৬
সাপমাসী উড়ে যায় ; দাঁড়কাক অশ্বত্থের নীড়ের ভিতর ২২
পাখনার শব্দ করে অবিরাম ; কুয়াশায় একাকী মাঠের ঐ ধারে ২৬
কে যেন দাঁড়ায়ে আছে ; আরো দূরে দু'একটা স্তব্ধ খোড়ো ঘর ২২
প'ড়ে আছে ; খাগড়ার বনে ব্যাং ডাকে কেন—থামিতে কি পারে ; ২২
(কাকের তরুণ ডিম পিছলায়ে প'ড়ে যায় শ্যাওড়ার ঝাড়ে।) ২২
[রূপসী বাংলা]

কবি তাঁর বহু চতুর্দশপদী কবিতায় প্রবহমানতা সৃষ্টি করেছেন পঙক্তি-শেষে বাক্য শেষ না-ক'রে, পরবর্তী পঙক্তির ভিতর কথা চারিয়ে দিয়ে, এবং

এর ফলে অক্ষরবৃত্তের প্রচলিত পর্ববিভাগ থেকে প্রমুক্ত হ'য়েও। শেষোদ্ধৃত সনেট থেকে এরকম কএকটি নজির অনায়াসে বের ক'রে আনা যায় : ১. পৃথিবীতে আমি বহুদিন/কাটায়েছি ; ২. বনে বনে ডালপালা উঁড়িতেছে—যেন পরী জিন্/কথা কয় ; ৩. দাঁড়কাক অশ্বত্থের নীড়ের ভিতর/পাখনার শব্দ করে অবিরাম ; ৪. কুয়াশায় একাকী মাঠের ঐ ধারে/কে যেন দাঁড়ায়ে আছে ; ৫. আরো দূরে দু'একটা স্তব্ধ খোড়ো ঘর/প'ড়ে আছে। পর্ব-নির্মাণের স্বাধীনতা, পঙ্‌ক্তিনির্মাণের স্বাধীনতা, প্রবহমানতার স্বাধীনতা, অষ্টক-ষট্‌কের দেয়াল ডিঙিয়ে যাবার স্বাধীনতা নিয়ে জীবনানন্দ তাঁর সনেটগুচ্ছকে দান করেছেন আলাদা এক চারিত্র্য ॥

[১৯৭৫]

জীবনানন্দ ও ইংরেজি কবিতা

তিরিশেরই অপর এক বাংলা কবি, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, উত্তর-রাবীন্দ্রিক কাব্যের মুক্তির যে-প্রতিবেদন রচনা করেছিলেন তাতে 'পরিগ্রহণ' একালের কবিতার অন্যতম শর্তস্বরূপ তাঁর সম্মুখে প্রতিভাত হয়েছিলো; এবং এই পরিগ্রহণ বিশ্বের যে-কোনো বীজবন্ত ক্ষেত্র থেকে সাধ্য ও চয়নীয়। এই সত্য অপিচ অপ্রিয় ভাষণ বস্তুত উত্তরবর্তীদেরও ললাটলিপি,—এবং তাঁর সহকালীনদের তো বটেই। শিল্প থেকে শিল্পের উত্থান. গ্রন্থ থেকে গ্রন্থের জন্ম, কবিতা থেকে কবিতার সৃজন—একালের শিল্পসাহিত্যের কএকটি বহির্লক্ষণাবলির অন্তর্ভুক্ত। এবং তাই, অনিবার্যভাবেই, তুলনামূলকতার প্রশ্ন উঠে আসে।

অমন-যে কোমল-বলীয়ান জীবনানন্দ দাশ, যিনি অবিসংবাদিতপ্রায়ভাবে উঠে এসেছেন তিরিশের সিংহ-চিহ্নিত আসনে. তাঁকেও রবীন্দ্রচাপমুক্তির জন্য যেতে হয়েছিলো ভিনদেশে। এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেও তাঁর কাব্যে ও নাট্যে যাঁদের প্রভাবধারা স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন, সেই কীটস ও ইএটস-কে তাঁর প্রাতিস্বিক ঢঙে সুপ্রচুরভাবে উচ্ছিষ্ট ক'রে গেছেন জীবনানন্দ দাশ। আর দুজন গৌণ কবি, এডগার এ্যালান পো ও ডিলান টমাস, তাঁর উপর ছায়া ফেলে চ'লে গেছেন। বিচ্ছিন্নভাবে বর্তমান আরো অনেক প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ আলোসম্পাত : শেলী-র "Hellas" কাব্যনাট্যের 'innocent sleep' অংশবাক্যটি জীবনানন্দ দাশে 'নিরপরাধ ঘুমে' (শিকার, মহাপৃথিবী) পর্যবসিত হ'য়ে যায়; হুইটম্যান-এর যে-সংরক্ত জীবনচৈতন্য-দ্বারা মোহিতলাল-নজরুল-প্রেমেন্দ্র মিত্র উত্তেজিত হয়েছিলেন, প্রাথমিকভাবে জীবনানন্দও তার দ্বারা ঈষদ্‌স্পৃষ্ট। কখনো অপর দুএকটি বৈদেশিক আলো এসে পড়েনি তা নয়। জর্মান কবিতার সঙ্গে একটি তুলনা নির্মাণ করা চলে।

পান করে আরক্ত শরাব মুক্তনেত্র হন্তারক।
মুমূর্ষু বৃদ্ধেরা যতো কাঁপে মরণের ভয়ে দুখে।

প্রার্থনায় নতহাঁটু ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টের সম্মুখে
প্রলুব্ধ নিশ্বাসে জ্বলা নগ্ননী ধর্মযাজিকা এক।

শিশুকে শোনায় গান, দোলা দ্যায় ঘুমন্তা জননী।
চাঁদের নরম আলো—তার দিকে তাকিয়ে শিশুটি,
চোখে তার অনুপম বিশ্বাসের লাবণ্যের দ্যুতি।
নষ্টবাড়ি থেকে বেজে ওঠে বিলোল হাস্যের ধ্বনি।

[নৈশচিত্র, গেঅর্গ ট্রাকল। অনু. বর্তমান লেখক-কৃত]

নিতান্ত নিজের সুরে তবুও তো উপরের জানালার থেকে
গান গায় আধো জেগে ইহুদী রমণী ;
পিতৃলোক হেসে ভাবে, কাকে বলে গান—
আর কাকে সোনা, তেল, কাগজের খনি।

ফিরিঙ্গি যুবক ক'টি চ'লে যায় ছিমছাম।
থামে ঠেস দিয়ে এক লোল নিগ্রো হাসে ;
হাতের ব্রায়ার পাইপ পরিষ্কার করে
বুড়ো এক গরিলার মতন বিশ্বাসে।

[রাত্রি, সাতটি তারার তিমির, জীবনানন্দ]

তত্রাচ জীবনানন্দের মুখ্য ঋণ ইংরেজি কবিতার কাছেই।।

এডগার এ্যালান পো-র সঙ্গে জীবনানন্দের সারূপ্য প্রথমোক্তের 'To Helen' কবিতার সঙ্গে শেষোক্তের "বনলতা সেন" গ্রন্থভুক্ত 'বনলতা সেন' কবিতাটিতে প্রধানত। 'To Helen' কবিতাটির 'Helen, They beaut'y -র অনুসারী সম্বোধনাত্মক কবিতারম্ভ জীবনানন্দে বারংবার ধ্বনিত : ১. 'শ্যামলী, তোমার মুখ সেকালের শক্তির মতন।' ২. 'সবিতা, মানুষজন্ম আমরা পেয়েছি।' ৩. 'সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ বিকেলের নক্ষত্রের কাছে।' ৪. 'সুরঞ্জনা, আজো তুমি আমাদের পৃথিবীতে আছো।' জীবনানন্দের কোনো-কোনো কবিতা এ্যালান পো-র 'স্থানকালাতীত' সুন্দরচর্যার মতোই অতিক্রম ক'রে যায় পৃথিবীদৃঢ় স্থানকালসীমা : ধূসর, বিজন, রহস্যময়, অদ্ভুত, অতিপ্রাকৃত জগৎ নির্মাণে উভয়ে পরস্পরের উপবর্তী। এ্যালান পো-র 'দাঁড়কাক' যে-অপ্রাকৃত রহস্যের বাহক জীবনানন্দের কুয়াশাময়

কাকেরা অবশ্য তেমন নয়। কিন্তু এ্যালান পো-র মতোই এক সর্বনাশা সৌন্দর্যের সাক্ষাৎ পাই যখন জেগে ওঠে এই ক'টি ছত্রের ভিতর থেকে 'কড়ির মতন শাদা মুখ তার/দুইখানা হাত তার হিম ;/চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম/চিতা জ্বলে ; দখিন শিয়রে মাথা শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায়/সে-আগুনে হায়।' (শঙ্খমালা, মহাপৃথিবী)। পুনরপি : 'আমার নিজের মুদ্রাদোষে আমি একা হতেছি আলাদা' কিংবা 'কেউ যাহা জানে নাই কোনো-এক বাণী/আমি বহে আনি' (জীবনানন্দ) এবং 'শৈশবসময় থেকে আমি আর কারো মতো নই' (এ্যালান পো)-এর সাযুজ্য স্বয়ম্প্রকাশিত।

'বনলতা সেন' কবিতাটির সঙ্গে আর-একটি কবিতার সান্নিহিতি সন্ধান করা চলে : কীটস-এর 'On first looking into Chapman's Homer'. 'Much have I travell'd' হয়েছে 'অনেক ঘুরেছি আমি', এবং 'Then felt I like some watcher of the skies/When a new planet swims into his ken ; / Or like stout Cortez when with eagle eyes/He star'd at the Pacific'— পঙ্ক্তিনিচয় আন্তর-রসায়িত হ'য়ে ধারণ করেছে 'অতিদূর সমুদ্রের 'পর/হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা/সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর,/তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে।' এ্যালান পো- ও কীটস-দ্বারা অধিগত হ'য়েও 'বনলতা সেন', শেষপর্যন্ত দূরগামী, ঋণাতিক্রমী ও জীবনানন্দীয়।[১]

"ধূসর পাণ্ডুলিপি" গ্রন্থভুক্ত 'জীবন' কবিতাটির স্পেনসরীয় স্তবক-গঠনের সঙ্গে কীটস-এর 'The Eve of St. Agnes' কবিতার সাদৃশ্য লক্ষণীয়।[২] কীটস-এর অপর-একটি কবিতা 'ইমিটেশন অফ স্পেনসর'

[১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "কল্পনা" গ্রন্থান্তর্গত 'স্বপ্ন' কবিতাটির সঙ্গেও এই কবিতা-টির সম্বন্ধ খুব ব্যবহিত নয়।

[২] প্রকরণপ্রযত্নবান মোহিতলাল মজুমদার ইতিপূর্বেই বাংলা ভাষায় এনেছেন এই স্পেনসরীয় স্তবকানুসরণ :

ভূগর্ভের অগ্নি তুমি, ধরা-দেহে নিগূঢ় সঞ্চার—
তোমারি অলক্ষ্যতাপে ঋতুলক্ষ্মী পুষ্পফলবতী ;
তুমি উৎস জ্বালামুখী, অকস্মাৎ অনল-উদ্‌গার—
ভূমিকম্প জলোচ্ছ্বাস তোমারি সে বিকট মুরতি !
গৃহকোণে দীপ তুমি—আঁধারের মধুর আরতি,
বনে তুমি দাবানল—দিগন্তের দাহন-উৎসব !

স্পেনসরীয় স্তবকানুসারে রচিত। [৩] স্পেনসরীয় স্তবকে নয়টি পঙক্তি থাকে, নবম পঙক্তিটি দীর্ঘ, অন্ত্যমিল-পদ্ধতি ক খ ক খ খ গ খ গ গ। 'জীবন' ও 'The Eve of St. Agnes' দু'টি কবিতাই দীর্ঘ : কীটস-এর কবিতাটি বিয়াল্লিশ স্তবকে ও জীবনানন্দের কবিতাটি চৌত্রিশ স্তবকে সমাপ্ত। একটি দৃষ্টান্তধার :

St. Agnes' Eve—Ah, bitter chill it was !
The owl, for all his feathers, was a-cold :
The hare limp'd trembling through the frozen grass,
And silent was the flock in wolly fold :
Numb were the the Beadsman's fingers, while he told
His rosary, and while his frosted breath,
Like pious incense from a censer old,
Seem'd taking flight for heaven, without a death,
Past The sweet Virgin's picture, while his prayer he saith.

[The Eve of St. Agnes]

শীত—রাত ঢের দূরে,—অস্থি তবু কেঁপে ওঠে শীতে।
শাদা হাত দুটো শাদা হাড় হ'য়ে মৃত্যুর খবর
একবার মনে আনে,—চোখ বুজে তবু কি ভুলিতে
পারি এই দিনগুলো!—আমাদের রক্তের ভিতর
বরফের মতো শীত,—আগুনের মতো তবু জ্বর!
যেই গতি,—যেই শক্তি পৃথিবীর অন্তরে পঞ্জরে ;
সবুজ ফলায়ে যায় পৃথিবীর বুকের উপর,—
তেমনি স্ফুলিঙ্গ এক আমাদের বুকে কাজ করে!
শস্যের কীটের আগে আমাদের হৃদয়ের শস্য তবু মরে।

[জীবন]

হোম-ধূমারুণ-আঁখি বধূ তুমি, ব্রীড়া মূর্তিমতী।
তুমি বন্ধ্যা বারাঙ্গনা, নগ্ন অঙ্গ অনঙ্গ-গৌরব—
অধর পিপাসা-পাণ্ডু, নয়নে আরক্ত রাগ আসব-সম্ভব।

[নারীস্তোত্র, স্মরগরল : মোহিতলাল]

[৩] বাইশ স্তবকে সম্পূর্ণ "ধূসর পাণ্ডুলিপি" গ্রন্থভুক্ত 'অনেক আকাশ' কবিতাটিতেও স্পেনসরীয় স্তবক অনুসৃত।

একাশি

এই কবিতায় 'মৃত্যুরে বন্ধুর মতো ডেকেছি তো,—প্রিয়ার মতন!—/চকিত শিশুর মতো তার কোলে লুকায়েছি মুখ' বস্তুত আপূর্ণ কীটসীয় প্রতিধ্বনিতে : কীটস-এর 'হেমন্তের প্রতি' কবিতার সঙ্গে জীবনানন্দের 'অবসরের গান' কবিতার সম্বন্ধ সুব্যবহিত নয়।

এই শতাব্দীর মহত্তম কবিদের অন্যতম ডব্লু. বি. ইএটস জীবনানন্দ দাশে সর্বাধিক প্রভাবসম্পাতী। বস্তুত তাঁর কবিতার যে-সুর যে-ছন্দস্পন্দন তা ইএটস থেকে প্রাপ্ত। তিনটি কবিতা তো স্পষ্টত ইএটস-এর কবিতার অনুলিখন :

১. Bald heads forgetful of their sins,
Old, learned, respectable bald heads
Edit and annotate the lines
That young men, tossing on their beds,
Rhymed out in love's despair
To flatter beauty's ignorant ear.

All shuffle there; all cough in ink;
All wear the carpet with their shoes;
All think what other people think;
All know the man their neighbour knows.
Lord, what would they say
Did their Catullus walk that way?

[The Scholars, The wild Swans at Coole]

'বরং নিজেই তুমি লেখোনাকো একটি কবিতা—'
বলিলাম ম্লান হেসে ; ছায়াপিণ্ড দিল না উত্তর ;
বুঝিলাম সে তো কবি নয়—সে যে আরূঢ় ভনিতা ;
পাণ্ডুলিপি, ভাষ্য, টীকা, কালি আর কলমের 'পর
ব'সে আছে সিংহাসনে—কবি নয়—অজর অক্ষর
অধ্যাপক ; দাঁত নেই—চোখে তার অক্ষম পিঁচুটি ;
বেতন হাজার টাকা মাসে—আর হাজার দেড়েক
পাওয়া যায় মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি খুঁটি ;
যদিও সে-সব কবি ক্ষুধা প্রেম আগুনের সেঁক
চেয়েছিলো—হাঙরের ঢেউয়ে খেয়েছিলো লুটোপুটি।

[সমারূঢ়, সাতটি তারার তিমির]

২. O curlew, cry no more in the air,
Or only to the water in the West ;
Because your crying brings to my mind
Passion-dimmed eyes and long heavy hair
That was shaken out over my breast :
There is enough evil in the crying of wind.

[He reproves the curlew, The wind among the reeds]

হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদোনাকো উড়ে-উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে
তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে ;
পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চ'লে গেছে রূপ নিয়ে দূরে ;
আবার তাহারে কেন ডেকে আনো ? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে
বেদনা জাগাতে ভালোবাসে !
হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর উড়ে-উড়ে কেঁদোনাকো ধানসিড়ি নদীটির পাশে ।

[হায় চিল, মহাপৃথিবী]

৩. One to another sighed and cried :
The exorbitant dreams of beggary,
That idleness had born to pride.
Sang through their teeth from noon to noon ;
And when the second twilight brought
The frenzy of the beggars' moon
None closed his blood-shot eyes but sought
To keep his fellows from their sleep ;
All shouted till their anger grew
And they were whirling in a heap.

[The three beggars, Responsibilities]

নদীর জলের পারে ব'সে যেন, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটে
তাহারা গণনা ক'রে গেল পৃথিবীর ন্যায় অন্যায় ;

চন্দের এঁটিলি মেরে গন্নে গেল অন্যায় ন্যায় ;
কোথায় ব্যয়িত হয়—কারা করে ব্যয় ;
কী-কী দেয়া-থোয়া হয়— কারা কাকে দ্যায় ;
কী ক'রে ধর্মের কল ন'ড়ে যায় মিহিন বাতাসে ;
মানুষটা ম'রে গেলে যদি তাকে ওষুধের শিশি
কেউ দেয়—বিনি দামে—তবে কার লাভ—
এই নিয়ে চারজনে ক'রে গেল ভীষণ সালিশী।

[লঘু মুহূর্ত, সাতটি তারার তিমির]

এতদ্ব্যতিরেকে বিচ্ছিন্নভাবে ইএটস-এর কণ্ঠ বারংবার প্রতিধ্বনিত :

১. Autumn is over the long leaves that love us,
And over the mice in the barley sheavs ;
Yellow the leaves of the rowan above us,
And yellow the wet wild-strawberry leaves.

[The falling of the leaves ,Crossways]

দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ

[মৃত্যুর আগে, ধূসর পাণ্ডুলিপি]

২. In a field by the river my love and I did stand,
And on my leaning shoulder she laid her snow-white hand.
She did me take life easy, as the grass grows on the weirs
But I was young and foolish, and now am full of tears.

[Down by the Salley Gardens, Crossways]

সহজ লোকের মতো কে চলিতে পারে।
কে থামিতে পারে এই আলোয় আঁধারে
সহজ লোকের মতো ; তাদের মতন ভাষা কথা
কে বলিতে পারে আর ; কোনো নিশ্চয়তা
কে জানিতে পারে আর ?

[বোধ, ধূসর পাণ্ডুলিপি]

৩. All is changed since I, hearing at twilight,
The first time on this shore,
The bell-beat of their wings above my head,
Trod with a lighter tread.

[The wild swans at Coole, The wild swans at Coole]

রাত্রির কিনার দিয়ে তাহাদের ক্ষিপ্র ডানা ঝাড়া
এঞ্জিনের মতো শব্দে—ছুটিতেছে ছুটিতেছে তারা।

[বুনো হাঁস, মহাপৃথিবী]

৪. I am haunted by numberless islands, and many a
Dannan Shore,
Where Time would surely forget us, and Sorrow
come near us no more ;
Soon far from the rose and the lily and fret of the
flames would we be,
Were we only white birds, my beloved, buyoed out
on the foam of the sea.

[The White birds, The Rose]

আজকের জীবনের এই টুকরো টুকরো মৃত্যু আর থাকতো না,
থাকতো না আজকের জীবনের টুকরো টুকরো সাধের ব্যর্থতা ও
অন্ধকার ;
আমি যদি বনহংস হতাম,
বনহংসী হতে যদি তুমি ;
কোনো এক দিগন্তের জলসিড়ি নদীর ধারে
ধানখেতের কাছে।

[আমি যদি হতাম]

জানি পাখি, শাদা পাখি, মালাবার ফেনার সন্তান,
তুমি পিছে চাহোনাকো, তোমার অতীত নেই, স্মৃতি নেই, বুকে
নেই আকীর্ণ ধূসর
পাণ্ডুলিপি ; পৃথিবীর পাখিদের মতো নেই শীতরাতে ব্যথা
আর কুয়াশার ঘর।

যে-রক্ত ঝরেছে তারে স্বপ্নে বেঁধে কল্পনার নিঃসঙ্গ প্রভাত
নেই তব ; নেই নিম্নভূমি—নেই আনন্দের অন্তরালে প্রশ্ন
আর চিন্তার আঘাত।

[সিন্ধুসারস, মহাপৃথিবী]

কোনো-কোনো কবিতায় চলেছে ইএটসীয় রীতির অনুগমন ; যেমন ইএটস-এর :

They mauled and bit the whole night through ;
They mauled and bit till the day shone ;
They mauled and bit through all that day
And till another night had gone.

[The three beggars, Responsibilities]

অভিষপ্রায় বিষয়ে প্রথমে চললো এই রীতির অনুসরণ :

একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি আহিরীটোলায়,
একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি বাদুড়বাগানে,
একটি পয়সা যদি পাওয়া যায় আরো—
তবে আমি হেঁটে চ'লে যাবো মানে-মানে।

[ভিখিরী, শ্রেষ্ঠ কবিতা]

পরবর্তীকালে বারংবার ব্যবহৃত হ'লো অনুরূপ ত্রিস্থ প্রযুক্তি :

তোমার বুকের 'পরে আমাদের পৃথিবীর অমোঘ সকাল ;
তোমার বুকের 'পরে আমাদের বিকেলের রক্তিম বিন্যাস ;
তোমার বুকের 'পরে আমাদের পৃথিবীর রাত :
নদীর সাপিনী, লতা, বিলীন বিশ্বাস।

[তোমাকে, শ্রেষ্ঠ কবিতা]

ইএটস-এর "In the Seven Woods" কাব্যগ্রন্থ থেকেই কি জীবনানন্দ প্রেরণা পেয়েছিলেন "সাতটি তারার তিমির" গ্রন্থনাম রাখবার ? বিচ্ছিন্নভাবে কতো অংশবাক্য চ'লে এসেছে : ইএটস-এর 'mouse grew waters'

জীবনানন্দে হয়েছে 'নেউল-ধূসর নদী', 'Ignorant as the dawn' হয়েছে 'ভোরের আলোর মূর্খ উচ্ছ্বাস', 'The silver apples of the moon,/The golden apples of the sun' হয়েছে 'সোনার বলের মতো সূর্য আর/রূপোর ডিবের মতো চাঁদের বিখ্যাত মুখ', 'Upon the brimming water among the stones / Are nine-and fifty swans' হয়েছে 'নয়টি অমল হাঁস নদীতে রয়েছে মনে পড়ে', 'Beauty and fool together laid' হয়েছে 'মূর্খ আর রূপসীর ভয়াবহ সঙ্গম', 'ইনিসফ্রী দ্বীপ' হয়েছে বিকেলের নক্ষত্রের উপবর্তী দূরতর দ্বীপ।

সুররিয়ালিস্ত ইংরেজিভাষী কবি ডিলান টমাস-এর সঙ্গে কখনো জীবনানন্দের আত্মীয়তা দৃশ্যমান। দৃষ্টান্তত :

Under the sky-signs they who have no arms
Have cleanest hands, and as the heartless ghost
Alone unhurt, so the blind man sees best.

[Dylan Thomas]

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা ;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।

[জীবনানন্দ দাশ]

বিস্তীর্ণ এই প্রভাবপ্রচয় তাঁর নিজের ভিতরে পরিপাক ক'রে নিয়েছিলেন জীবনানন্দ দাশ ; তাই—যতো দিক থেকেই আলো এসে পড়ুক—তাঁকে প্রকৃতিস্থ, স্বরচিত ও আত্মনিবাসী মনে হয় ॥

[১৯৭১]

জীবনানন্দ ও বাংলা কবিতা

জীবনানন্দ দাশের কবিতা আপাতভাবে যতো অভিনবই লাগুক না কেন, তিনি বাংলা কবিতার প্রবাহবিচ্যুত নন্ কিছুতেই। তাঁর পূর্বজ কবিদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধের তুলনাতেই এ কথা স্পষ্ট হবে। বিশেষভাবে তাঁর প্রাথমিক কবিতাই এ উক্তির অবলম্বন ;—কিন্তু সেই প্রাথম কবিতা পেরিয়েই তো জীবনানন্দ নূতন হ'য়ে উঠেছিলেন। জীবনানন্দের সঙ্গে তিনজন পূর্ব-সূরীর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মোহিতলাল মজুমদার ও নজরুল ইসলামের—তুলনাই আমরা বিশদভাবে করেছি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও যতীন্দ্রনাথ সেন-গুপ্তেরও কিছু প্রভাব তাঁর উপর অর্শেছিলো ; তার কথাও প্রসঙ্গত এসেছে ; কিন্তু প্রধান প্রভাব ও সাযুজ্য প্রথমোক্ত তিনজনের সঙ্গেই। এই প্রভাবসূত্রেই আর-একবার প্রমাণিত হয় যে, সাহিত্য কোনোদিন উদ্ভিদের মতো মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে না, সাহিত্যে রাতারাতি কোনো কিছু সাধিত হয় না—তাকে আসতে হয় ধারাবাহিকতার পথ ধ'রে, উত্তরাধিকারের চেনা রাস্তায়।

জীবনানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ

অগ্রজ মহান কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পড়েছিলেন অনুজ মহান কবি জীবনানন্দ দাশের একটি প্রতিভূ-কবিতা : 'মৃত্যুর আগে' (ধূ. পা.) ; প'ড়ে মন্তব্য করেছিলেন 'চিত্ররূপময়'। অনুজ অনেক লেখক সম্পর্কেই রবীন্দ্রনাথ যেমন সূক্ষ্ম ও সংহত মন্তব্য করেছিলেন—এমন-সব মন্তব্য যা ঐ লেখকদের চারিত্র্য-সম্পর্কে আশ্চর্যভাবে লক্ষ্যভেদী, তেমনি জীবনানন্দ সম্পর্কেও উক্ত ঐ একটি মাত্র শব্দ নিপুণরকমে অর্থময়। বস্তুত জীবনানন্দ জীবনভোর ক্রমাগত ছবি এঁকে গেছেন শব্দে-শব্দে—এরকম সুপ্রচুর ও অবিরলধারে আর-কোনো বাংলা কবির হাত থেকে শব্দচিত্র নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে আসেনি। "ঝরা পালক" থেকে "বেলা অবেলা কালবেলা" পর্যন্ত উপর্যুপরি ফলেছে ছবির পরম্পরা। বস্তুত চিত্র (এবং চিত্রকল্প) অনেক সময় বক্তব্য হ'য়ে উঠেছে কবির। "সাতটি

তারার তিমির" থেকে অবশ্য তাঁর চিত্রলতা ক'মে এসেছে, তাঁর চিত্ত যেন স্থূল বাস্তবের হাতে অনেকগুলি রঙ ঝরিয়ে ফেলেছে, শেষ পর্যায়ে ধূসর-ধূসরতর হ'য়ে উঠেছেন তিনি, কিন্তু রঙ-তুলি তাঁকে একেবারে ছেড়ে যায়নি : তখনো মননের মধ্য আহরণের ফাঁকে-ফাঁকে হঠাৎ এক-একটি খণ্ড ছবি অঙ্কিত হ'য়ে গেছে।

জীবনানন্দ তিনটি শ্রদ্ধার্ঘ্য কবিতা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পরে : তিনটি কবিতারই শীর্ষনাম 'রবীন্দ্রনাথ'। [১]

এর মধ্যেকার ছোটো কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্র-চারিত্র্য উদ্ঘাটন করেছেন কবি : ছোটো, মধুর, রবীন্দ্র-চারিত্র্যজ্ঞাপক এই কবিতাটি বারো পঙক্তির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অস্তিসূচকতা চমৎকার ব্যক্ত করেছে। এখানকার রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে 'সার্বভৌম' শব্দটির ব্যবহার দেখে মনে প'ড়ে যায় : রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্ম-জয়ন্তীতে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও এই শব্দটি প্রয়োগ করেছিলেন। [২] দু'টি কবিতাতেই সময়-পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথকে দেখবার চেষ্টা করা হয়েছে। ক্ষুদ্র কবিতাটিতে যেমন হিমনিমজ্জিত আজকের ইতিহাস ভেদ ক'রে 'মূল্য ফিরে আসে/নতুন সময়-তীরে সার্বভৌম সত্যের মতন', তেমনি দীর্ঘকবিতাটিতেও এই সত্যোচ্চারণ সম্ভব হয়েছে : 'অনন্ত আকাশ-বোধে ভ'রে গেলে কালের দু'ফুট মরুভূমি।' দ্বিতীয়োক্ত দীর্ঘ কবিতাটিতে 'নিরাময়' শব্দটির একাধিক ব্যবহার লক্ষণীয়। অন্যান্য কএকটি কবিতায় আছে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ।

তাঁর গদ্য-রচনায় রবীন্দ্রনাথকে নিবিড়তর সাহচর্যে উদ্ঘাটন করেছেন কবি। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে যে-প্রবন্ধটি তিনি লিখেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা' (১৩৪৮), উপরের কবিতাদ্বয়ের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে পাঠ করা যেতে পারে। এখানে বলছেন তিনি, '··রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভাষা, সাহিত্য, জীবন-দর্শন ও সময়ের ভিতর দিয়ে সময়ান্তরের গরিমার দিকে অগ্রসর হবার পথ যে-রকম নিরঙ্কুশভাবে গঠন ক'রে গেছেন পৃথিবীর আদিম কালের মহাকবি ও মহাসুধীরাই তা পারতেন ; ইদানীং বহু যুগ ধরে পৃথিবীর কোনো দেশই এরকম লোকোত্তর পুরুষকে ধারণ করেনি।' তৎসত্ত্বেও এ সিদ্ধান্ত করতে হ'লো তাঁকে, 'তাঁর [রবীন্দ্রনাথের] প্রকৃত কাব্যলোকে সমাজ-ও-ইতিহাস চেতনা একটি নির্ধারিত সীমায় এসে তারপর মন্থর

১. এর মধ্যে যেটি দীর্ঘ সেটি বেরিয়েছিলো 'পূর্বাশা' রবীন্দ্র-স্মৃতি সংখ্যায়।
২. জীবনানন্দ তাঁর একটি প্রবন্ধেও 'কবি সার্বভৌম' কথাটি ব্যবহার করেছেন।
[উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য, ব. ক.]

হয়ে গেছে। আধুনিকের কবিতা সেই কিনারার থেকে সূত্র তুলে নিয়ে' অগ্রসর হ'য়ে গেছে। আধুনিক প্রচারধর্মী ক্ষণভঙ্গুর কবিতার বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ ক'রে তিনি শেষ-পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে আসছেন, 'ইংরেজ কবিরা যেমন যুগে-যুগে ঘুরে-ফিরে শেক্সপীয়র-এর কেন্দ্রিকতার থেকে সঞ্চারিত হয়ে বৃত্ত রচনা করে ব্যাপ্ত হয়ে চলেছে, আমাদের কবিরাও রবীন্দ্রনাথকে পরিক্রমা করে তাই করবে'। 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা' প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন, 'প্রত্যেক বিশিষ্ট কবিই তাঁর যুগ ও সমাজ সম্বন্ধে সচেতন থেকে ভাবনাপ্রতিভার আশ্রয়ে যখন কবিতা লিখতে যান, তখন তাঁর কবিতার আঙ্গিক ও ভাষা বিচিত্রভাবে সৃষ্ট হয়—এমন একটি অপরূপ সঙ্গতি পায় যা তাঁর কবিতায়ই সম্ভব—অন্য কারু কবিতা নয়।' 'উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য' প্রবন্ধে তিনি একই কথা বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের কাব্যের থেকে সচেতনভাবে মুক্তির জন্যে যে বিপ্লব চলেছিল কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে বাংলা কবিতায়—তা এখন একদল জ্যেষ্ঠ কবিদের ভিতরে অবচেতনলোকে বিদ্রোহের মূর্তি ধরেছে, রবি-কাব্যলোকের বিরুদ্ধে ঠিক নয়, কিন্তু রবীন্দ্রসৃষ্ট সাহিত্যস্বভাব ও সময়স্বভাবের বিরুদ্ধে।' সুতরাং জীবনানন্দ রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধাচরণ করেননি, যেমন করেছিলেন চিত্তরঞ্জন-দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ, বরং তিনি আশ্চর্যভাবে ধরেছিলেন নূতন সময়-স্বভাবের জন্যেই কবিতার শরীর-মন স্বতন্ত্র হ'য়ে যায়—জীবনানন্দ, কবি, নিজেই সেই নূতন কবিতার জনক। কাব্যবিচ্যুত হ'য়ে রবি-কাব্যলোক থেকে স'রে যেতে চাননি তিনি, গিয়েছেন কবিতার অন্তঃসারের ভিতর দিয়েই।

রবীন্দ্রনাথের উপর আলাদা একটি সন্দর্ভ রচনা করেছিলেন তিনি ; তাহ'লেও রবীন্দ্রনাথকে অধিকাংশ সময়ে বিচার করেছেন উত্তরকালিক কবিতার সঙ্গে সংলগ্ন ক'রে, বিচ্ছিন্ন মন্তব্য অথবা।

'আধুনিক কবিতা' প্রবন্ধে বলছেন, '...কৃতী আধুনিক কবিদের সামনে তেমন কোনো পরিচ্ছন্ন বিশ্বাসভূমি নেই—উপনিষদের ধর্মে ও বিজ্ঞানের ফলাফলকে অধিগত করেও স্বাভাবিক আস্তিকতার (আধ্যাত্মিকতার) ক্রমপরিণতির ভূমিতে রবীন্দ্রনাথের নিকট যা প্রায় কোনো সময়ই (রবীন্দ্রনাথও মাঝে-মাঝে দ্বিধার পরিচয় দিয়েছেন যদিও) খুব দুরধিগম্য ছিল না।' তারপর : 'আধুনিক কবিতা আজ পর্যন্ত ওরকম কোনো বিশ্বাসের প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারেনি—কোন ধর্ম বা দর্শনের চলিত মীমাংসাকে একান্তভাবে স্বীকার করে।' রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দের কবিতা এই আলোয় বিচার্য : রবীন্দ্রনাথ যেখানে বিশ্বাসভূমিতে স্থিত থাকতে পেরেছেন,

জীবনানন্দে সেখানে রূপান্বিত দোলাচল-বৃত্তি।

জীবনানন্দ রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বেশি প্রাথম রবীন্দ্রাবিধর্মী কবিদের দ্বারা স্পৃষ্ট হয়েছিলেন। এই দিক থেকে তাঁর কবিতা বাংলা কবিতার ধারা-স্রোতেরই ফসল—খুব স্বাভাবিক পথে স্রোতে বেড়ে উঠেছে। তাঁর কবিতা উত্তরকালে মোড় ঘুরে গেছে—কিন্তু অলংকাররণনের পথ ধ'রেই অগ্রসর হয়েছে।

"ঝরা পালক"-এ জীবনানন্দ প্রধানত প্রাথম রবীন্দ্রাবিধর্মী কবি নজরুল-মোহিতলাল-সত্যেন্দ্রনাথ-যতীন্দ্রনাথের দ্বারা উচ্ছিষ্ট হয়েছিলেন, এই সব রবীন্দ্রাবিধর্মীদেরই সহবাসে তিনি রবীন্দ্রবিপ্রতীপী এক ভূমিকা দাঁড় করিয়ে-ছিলেন। তাঁর 'সাহিত্য-স্বভাব' ও 'সময়-স্বভাব' তখনই আলাদা আলোয় চ'লে গিয়েছিলো। রবীন্দ্রনাথের ('সিন্ধু-পারে', "চিত্র") ও জীবনানন্দের 'ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল' ("ঝরা পালক") তুলনীয়। দু'টি কবিতাতেই আছে পরিবেশগত সাযুজ্য :

১. পউষ প্রখর শীত জর্জর, ঝিল্লিমুখর রাতি :
নিদ্রিত পুরী, নির্জন ঘর, নির্বাণদীপ বাতি।...
পান্ডু আকাশে খন্ড চন্দ্র হিমানীর গ্লানি মাখা,
পল্লবহীন বৃদ্ধ অশথ শিহরে নগ্ন শাখা

[সিন্ধু-পারে]

তখন নিভিয়া গেছে মনিদীপ—চাঁদ শুধু খেলে লুকোচুরি—
ঘুমের শিয়রে শুধু ফুটিতেছে—ঝরিতেছে ফুলঝুরি,
স্বপনের কুঁড়ি।
অলস আঢুল হাওয়া জানলায় থেকে থেকে ফুঁপায় উদাসী
কাতর নয়ন কার হাহাকারে চাঁদিনীতে জাগে গো উপাসী।

[ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল][৩]

.২ দূর নদী-পারে শূন্য শ্মশানে শৃগাল উঠিল ডাকি,
মাথার উপরে কেঁদে উড়ে গেল কোন নিশাচর পাখী।
দেখিনু দুয়ারে রমণীমূরতি অবগুন্ঠনে ঢাকা—
কৃষ্ণ অশ্বে বসিয়া রয়েছে, চিত্রে যেন সে আঁকা।

[সিন্ধু-পারে]

৩. এই পঙক্তিটিও রবীন্দ্ররচনা থেকে আহৃত।

মোর জানালার পাশে তারে দেখিয়াছি রাতের দুপুরে—
তখন শকুনবধূ যেতেছিল শ্মশানের পারে উড়ে উড়ে।
মেঘের বুরুজ ভেঙে চাঁদ দিয়েছিলো উঁকি
সে কোন্ বালিকা একা অন্তঃপুরে এল অধোমুখী।

[ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল]

জীবনানন্দের কবিতার নায়িকা 'বাসর-রাত্রির বধূ,' রবীন্দ্রনাথের কবিতায়ও সেই বাসর-রাত্রির বিস্তারিত বিবরণ 'অজানিত বধূ'র রূপে বর্ণিত। দু'টি কবিতারই নিশীথ-বর্ণনায় আছে ভয়ংকরের আভাস। [৪] কিন্তু শেষ পর্যন্ত পৃথক হ'য়ে গেছে ওরা : রবীন্দ্রনাথের 'অজানিত বধূ'-র মুখে আভাসিত এক চিরপরিচিতার মুখ [৫]—'সেই মধুমুখ, সেই মৃদুহাসি, সেই সুধাভরা আঁখি,' আর জীবনানন্দের বাসর-রাত্রির বধূর রূপ :

অশ্রুর অঙ্গারে তার নিটোল ননীর গাল,—নরম লালিমা
জ্বলে গেছে,—নগ্ন হাত,—নাই শাঁখা,—হারায়েছে রুলি,
এলোমেলো কালো চুল খ'সে গেছে খোঁপা তার,—বেণী গেছে খুলি।
সাপিনীর মতো বাঁকা আঙুলে ফুটেছে তার কংকালের রূপ,
ভেঙেছে নাকের ডাঁশা,—হিম স্তন,—হিম রোমকূপ।

রবীন্দ্রনাথের বাসর-রাত্রির বধূর মুখে অংকিত হ'য়ে গেছে তাঁর জীবন-দেবতার আনন ; আর জীবনানন্দের জীবনদেবী এই ভয়ংকরীকেই শনাক্ত করা যায়। এই দু'টি কবিতায় দু'জন আলাদা কবির 'সময়-স্বভাব' ও কবি-স্বভাবের পার্থক্যও ধরা পড়েছে।

শুধু তাই নয়, "ঝরা পালক"-এই জীবনানন্দের কবিতার ঋতু স্থির হ'য়ে গেছে—সেই ঋতু হেমন্তের। তারপর প্রথম থেকে শেষাবধি জীবনানন্দের কবিতার মূল ঋতু হেমন্ত—যা রিক্ততা ও বিনষ্টির প্রতীক ; কবি দু-একবার হেমন্তকে পূর্ণতার রূপেও অংকন করেছেন অবশ্য। তাঁর সব কাব্যগ্রন্থ

৪. উভয় কবিতাই এডগার এ্যালান পো-র কবিতার স্মারক।

৫. রবীন্দ্রনাথের 'অজানিত বধূ'-র রহস্যোম্মোচনে ধরে পড়ে 'পরিচিত মুখ', আর সুধীন্দ্রনাথের 'সিনেমায়' ("ক্রন্দসী") কবিতার সিনেমাশেষের ভিড়ের ভিতরে হঠাৎ দেখা দিয়ে চিরতরে মিলায় জন্ম-জন্মান্তরের প্রেয়সী। প্রাপ্তি ও ব্যর্থতার এই দুই বিপরীত চিত্র আসলে দুই কালের দৃষ্টির পৃথকতা।

থেকেই এর সাক্ষ্য সংগ্রহ করা যাক :

১. হেমন্তের হিম মাঠে, আকাশের আবছায়া ফুঁড়ে
বকবধূটির মত কুয়াশায় শাদা ডানা যায় তার উড়ে।
হয়তো শুনেছ তারে, তার সুর—দুপুর আকাশে
ঝরা পাতা-ভরা মরা দরিয়ার পাশে
বেজেছে ঘুঘুর মুখে—জলডাহুকীর বুকে পউষ নিশায়
হলুদ পাতার ভিড়ে শিরশিরে পুবালি হাওয়ায়।

[কবি, ঝ. পা.]

২. হেমন্তের ঝড়ে আমি ঝরিব যখন—
পথের পাতার মত তুমিও তখন
আমার বুকের' পরে শুয়ে রবে ?—অনেক ঘুমের ঘোরে ভরিবে কি মন
সেদিন তোমার !

[নির্জন স্বাক্ষর, ধূ. পা.]

৩. চারিদিকে ঝাউ আম নিম নাগেশ্বরে
হেমন্ত আসিয়া গেছে ;—চিলের সোনালী ডানা হয়েছে খয়েরি :
ঘুঘুর পালক যেন ঝরে গেছে—শালিকের নাই আর দেরী,
হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু ক'রে ঘুমোবে সে শিশিরের জলে ;
ঝরিছে মরিছে সব এইখানে—বিদায় নিতেছে ব্যাপ্ত নিয়মের ফলে।

[দুজন, ব. সে.]

৪. তোমার সংকল্প থেকে খ'শে গিয়ে ঢের দূরে চ'লে গেছো তুমি ;
হ'লেও-বা হয়ে যেতো এ জীবন : দিনরাত্রির মতো মরুভূমি ;—
তবুও হেমন্তকাল এসে পড়ে পৃথিবীতে এমন স্তব্ধতা
জীবনের নেইকো অন্যথা,
হেমন্তের সহোদর র'য়ে গেছে, সব উত্তেজের প্রতি উদাসীন ;

[প্রেম-অপ্রেমের কবিতা, মহা.]

৫. হেমন্ত ফুরায়ে গেছে পৃথিবীর ভাঁড়ারের থেকে ;
এ রকম অনেক হেমন্ত ফুরায়েছে
সময়ের কুয়াশায় ;

মাঠের ফসলগুলো বার-বার ঘরে
তোলা হতে গিয়ে তবু সমুদ্রের পারের বন্দরে
পরিচ্ছন্নভাবে চলে গেছে।

[ন্যাবিকী, সা. ভা. তি.]

৬. হেমন্ত খুব স্থির
সপ্রতিভ ব্যাপ্ত হিরণ-গভীর সময় বলে
ইতিহাসের করুণ কঠিন ছায়াপাতের দিনে
উন্নতি প্রেম কাম্য মনে হলে
হৃদয়কে ঠিক শীত সাহসিক হেমন্তলোক ভাবি ;

[শতাব্দী, বে. অ. কা.]

জীবনানন্দের মৌল ঋতু হেমন্ত ; রবীন্দ্রনাথের বর্ষা ও বসন্ত। লক্ষণীয় : জীবনানন্দের কবিতায় কবিপ্রসিদ্ধ ও রবীন্দ্র-আচরিত এই দুই ঋতুর সাক্ষাৎ কদাচিৎ পাওয়া যায়।[৬]

"ঝরা পালক"-এ রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে গেলেও কবির "ধূসর পাণ্ডুলিপি"-র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের "সন্ধ্যাসঙ্গীত"-এর তুলনা অপ্রতিরোধ্য। উভয় কবিতার নামের মধ্যে যেমন, তেমনি তার বিষয়ের মধ্যেও আছে গোধূলির ছায়ার সঞ্চার। কবিহৃদয়ের অস্ফুট ভাব যেমন "সন্ধ্যাসঙ্গীত"-এ রূপায়িত, তেমনি হৃদয়ের গোধূলিলোক "ধূসর পাণ্ডুলিপি"-র জগৎ নির্মাণ করেছে। বিষাদ উভয় কাব্যেরই মৌল সুর। উভয় কাব্যেই আছে পার্থিবতার ঊর্ধ্বে উড্ডয়ন :

---

৬. দু-ঋতুর দুটি আকস্মিক উদাহরণ :

ক. শরীরে এসেছে স্বাদ বসন্তের রাতে
চোখ আর চায় না ঘুমাতে ;
জানালার থেকে অই নক্ষত্রের আলো নেমে আসে,
সাগরের জলের বাতাসে
আমার হৃদয় সুস্থ হয় ;

[পাখিরা, ধূ. পা.]

খ. এই জল ভালো লাগে ;—বৃষ্টির রূপালী জল কতদিন এসে
ধুয়েছে আমার দেহ—বুলায়ে নিয়েছে চুল—চোখের উপরে
শান্ত স্নিগ্ধ হাত রেখে কত খেলিয়াছে, আবেগের ভরে
ঠোঁটে এসে চুমো দিয়ে চলে গেছে কুমারীর মতো ভালোবেসে,

[এই জল ভালো লাগে, রূ. বা.]

অনন্ত এ আকাশের কোলে
টলমল মেঘের মাঝার
এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
তোর তরে কবিতা আমার।

[গান আরম্ভ, সন্ধ্যাসঙ্গীত]

পৃথিবীর বাধা—এই দেহের ব্যাঘাতে
হৃদয় বেদনা জমে,—স্বপনের হাতে
আমি তাই
আমারে তুলিয়া দিতে চাই।

[স্বপ্নের হাতে, ধূ. পা.]

"সন্ধ্যাসঙ্গীত"-এর 'হৃদয়ের গীতিধ্বনি' কবিতাটির সঙ্গে "ধূসর পাণ্ডুলিপি"-র 'বোধ' কবিতার তুলনা অনিবার্য। দু'একটি অংশ উদ্ধার করা যাক :

১. আলো-অন্ধকারে যাই—মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়, কোনো এক বোধ কাজ করে।
স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয় ;
আমি তারে পারি না এড়াতে,
সে আমার হাত রাখে হাতে ;

[বোধ, ধূ. পা.]

ও কী সুরে গান গাস, হৃদয় আমার ?
শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, বসন্ত শরৎ নাই,
দিন নাই, রাত্রি নাই—অবিরাম অনিবার
ও কী সুরে গান গাস, হৃদয় আমার ?

[হৃদয়ের গীতিধ্বনি, সন্ধ্যা.]

২. আমি সব দেবতারে ছেড়ে
আমার প্রাণের কাছে চলে আসি,
বলি আমি এই হৃদয়েরে :
সে কেন জলের মতো ঘুরে-ঘুরে একা কথা কয় !

[বোধ, ধূ. পা.]

তবে থাম থাম ওরে প্রাণ,
পারিনে শুনিতে আর একই গান একই গান।

[হৃদয়ের গীতিধ্বনি, সন্ধ্যা.]

"সন্ধ্যাসঙ্গীত"-এর শিল্পকুশলতারও কিছু-কিছু স্বাক্ষর পড়েছে "ধূসর পাণ্ডুলিপি"তে। যেমন শব্দ বা শব্দগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি—"সন্ধ্যাসঙ্গীত" থেকে :

১. তেমনি, তেমনি তারে হাসির অনল
দারুণ উজ্জ্বল—
দহিত দহিত তারে, দহিত কেবল।

[তারকার আত্মহত্যা]

২. তবে কেন হেন ম্লান মুখ
তবে কেন হেন দীন বেশ ?
তবে কেন এত ভয়ে ভয়ে
এ হৃদয়ে করিস প্রবেশ ?

[আঁধারে নৈরাশ্য]

৩. একবার ফিরে তারা চেয়েছিল কি ?
বুঝি চেয়েছিল।
একবার ভুলে তারা কেঁদেছিল কি ?
বুঝি কেঁদেছিল।
বুঝি ভেবেছিল—

লয়ে যাই—নিতান্ত কি একেলা কাঁদিবে ?
তাই বুঝি ভেবেছিল।
তাই চেয়েছিল।

[পরিত্যক্ত]

৪. গাহিতেছে একই গান একই গান একই গান
পারিনে শুনিতে আর একই গান একই গান।

[হৃদয়ের গীতিধ্বনি]

৫.   এই বেলা প্রাণপণ কর।
এই বেলা ফিরে দাঁড়া তুই,
স্রোতোমুখে ভাসিস নে আর।
যাহা পাস আঁকড়িয়া ধর—
সম্মুখে অসীম পারাবার,
সম্মুখেতে চির অমানিশি,
সম্মুখেতে মরণ বিনাশ।

[পরাজয়-সঙ্গীত]

"ধূসর পাণ্ডুলিপি" থেকে :

১.   আমি সেই পুরোহিত—সেই পুরোহিত
যে নক্ষত্র ম'রে যায়, তাহার বুকের শীত
লাগিতেছে আমার শরীরে—[৭]

[নির্জন স্বাক্ষর]

২.   আমার চোখেই শুধু ধাঁধা ?
আমার পথেই শুধু বাধা ?
জন্মিয়াছে যারা এই পৃথিবীতে
সন্তানের মত হয়ে,—
সন্তানের জন্ম দিতে দিতে
যাহাদের কেটে গেছে অনেক সময়,
কিম্বা আজ সন্তানের জন্ম দিতে হয়
যাহাদের ; কিম্বা যারা পৃথিবীর বীজক্ষেতে আসিতেছে চ'লে
জন্ম দেবে—জন্ম দেবে ব'লে ;
তাদের হৃদয় আর মাথার মতন
আমার হৃদয় না কি ?—তাহাদের মন
আমার মনের মত না কি ?—
তবু কেন এমন একাকী ?
তবু আমি এমন একাকী !

[বোধ]

৭.   "সন্ধ্যাসঙ্গীত"-এর 'তারকার আত্মহত্যা' কবিতায় একটি নক্ষত্রের মৃত্যুর বর্ণনা প্রসঙ্গত স্মরণীয়।

৩. পথে পথে—থেমে—থেমে—থেমে
খুঁজিব কি তারে

[পিপাসার গান]

৪. একদিন—একরাত করেছি প্রেমের সাথে খেলা !
এক রাত—একদিন করেছি মৃত্যুরে অবহেলা !
একদিন—এক রাত ; তারপর প্রেম গেছে চ'লে—

[প্রেম]

উভয় কবিতাগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতায় লক্ষণীয় যুক্তবর্ণের বিরল ব্যবহার ; এর ফলে হৃদয়স্থ বিষাদলোকের আবহ ফোটানো সহজসাধ্য হয়েছে। তেমনি লক্ষণীয় উভয় কাব্যের অধিকাংশ কবিতায় অসমান অক্ষরবৃত্তের ব্যবহার—যা ঐ অব্যক্ত হৃদয়ী আবেগের প্রস্ফুটনে সহায়ক ॥

জীবনানন্দ ও মোহিতলাল

তাঁর প্রথম পর্যায়ে, জীবনানন্দ দাশের উপর সর্বাধিক প্রভাব ফেলেছিলেন, নজরুল ইসলাম বাদে, মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২)। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের (১৮৮৭-১৯৫৪) প্রভাব-চ্ছায়া অংশত অনুভূত হয়। লক্ষণীয় যে এঁরা সবাই—নজরুল, মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ ও এঁদের চেয়ে ন্যূন আকারে সত্যেন্দ্রনাথ—ছিলেন প্রথম রবীন্দ্র-বিধর্মী কবি, রবিমণ্ডলের বাইরে যাবার চেষ্টা প্রথম এঁদের মধ্যেই রূপ পেয়েছিলো। তিরিশের যে-কবি রবীন্দ্রলোক ভেঙে বেরিয়ে এসে, কিংবা সেই লোক-কে একেবারে অস্বীকার ক'রে, নূতন কবিতা সৃজন করলেন, তাঁর কবিতায় উপর্যুক্তদের ছায়াপাত—সুতরাং—অত্যন্ত তাৎপর্যময়। সত্য, জীবনানন্দের 'পতিতা'-র (ঝ. পা.) উপর নজরুলের 'বারাঙ্গনা'রই ("সাম্য-বাদী") মুখ্য আলো এসে পড়েছে, তত্রাচ সত্যেন্দ্রনাথের 'কুস্থানাদপি' ("বেণু ও বীণা") ও যতীন্দ্রনাথের 'বারনারী'-র ("মরীচিকা") সঙ্গে তুলনা একেবারে নিরর্থক নয় ;—অন্তত বিষয়-সাযুজ্যের মানবমুক্তির সেই কাল-টিকে চিহ্নিত ক'রে নেওয়া যায়। আর জীবনানন্দের 'দেশবন্ধু' (ঝ. পা.) কবিতার ছন্দোপ্রকরণের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের 'গান্ধিজী' ও মোহিতলালের 'প্রশ্ন' ("হেমন্ত-গোধূলি") ইত্যাদি কবিতার সাযুজ্য আত্মপ্রকাশিত। সত্যেন্দ্র-নাথের প্রভাবচ্ছায়া দ্রষ্টব্য জীবনানন্দের 'সাগর-বলাকা,' 'বনের চাতক—

মনের চাতক', 'ছায়াপ্রিয়া', 'মিশর', 'মরুবালু' প্রভৃতি কবিতায়। সত্যেন্দ্র-প্রভাবী কবিতা থেকে কএকটি অংশ উদ্ধার ক'রে দিই :

১. বাসা তোমার সাত সাগরের ঘূর্ণি হাওয়ার বুকে !
ফুটছে ভাষা কেউটে-ঢেউয়ের ফেনার ফণা ঠুকে' !
প্রয়াণ তোমার প্রবালদ্বীপে, পলার মালা গলে
বরুণ-রাণী ফিরেছে যেথা,—মুক্তা-প্রদীপ জ্বলে !
যেথায় মৌন মীন-কুমারীর শঙ্খ ওঠে ফুঁকে' !

[সাগর-বলাকা, ঝ. পা.]

২. সার্সি ঘরের উঠছে বেজে
উঠছে কেঁপে পর্দা !
বাতাস আজি ঘুমিয়ে আছে
জলডাহুকের বুকের কাছে
এ কোন বাঁশী সার্সি বাজায়
এ কোন হাওয়া ফর্দা !
দেয় কাঁপিয়ে পর্দা !

[ছায়াপ্রিয়া, ঝ. পা.]

৩. নীলার ঘোলা জলের দোলায় লাফায় কালো সাপ !
কুমীরগুলোর খুলির খিলান,—করাত-দাঁতের খাপ
উর্ধ্বমুখে রৌদ্র পোহায় ; ঘুম পাড়ানির ঘুম
হানছে আঘাত,—আকাশ বাতাস হচ্ছে যেন গুম !
ঘুমের থেকে উপচে পড়ে মৃতের মনস্তাপ !

[মিশর, ঝ. পা.]

জীবনানন্দের 'বনের চাতক—মনের চাতক' কবিতাটি সত্যেন্দ্রনাথের 'কুহু ও কেকা' কবিতার স্মারক। সত্যেন্দ্রপ্রভাবী জীবনানন্দের উপর্যুক্ত কবিতাগুলি সবই স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত। আত্মকণ্ঠ আবিষ্কারের সঙ্গে-সঙ্গে জীবনানন্দ অবলম্বন করেছিলেন অক্ষরবৃত্ত ছন্দ। উপান্ত্যজীবনে স্বরবৃত্ত ছন্দ যখন ফিরে এসেছিলো, তখন তার সঙ্গে প্রাথমিক স্বরবৃত্ত ছন্দের বিরাট ব্যবধি দেখা দিয়েছিলো ;—এ এই প্রমাণ করে যে বক্তব্যই ছন্দকে রূপান্তরিত ক'রে দ্যায় খুব ভিতর থেকে। উত্তরকালে সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব শূন্যে এসে

পেঁৗছেছে—কেবল প্রাকৃত শব্দব্যবহারে বাকব্যবহারে জীবনানন্দ পূর্বজ কবির ঋণ ব'য়ে গেছেন, ঋদ্ধ করেছেন আরো। আর যতীন্দ্রনাথের প্রভাব হয়তো র'য়ে গেছে প্রাথমিক জীবনানন্দের অত্যধিক মরুচারিতায়।

প্রাথমিক জীবনানন্দে ঝংকৃত হ'য়ে উঠেছে মোহিতলালের শারীররতি, এই একবারই, আর-কোনো সময় জীবনানন্দ অমনভাবে আত্মসমর্পণ করেননি তার কাছে (হয়তো তার কারণ : তাঁর দৃষ্টি ও ভাষার পরবর্তী বিমূর্ততা)। দুটি উদ্ধৃতাংশ :

১. হয়তো তাহারা মদঘূর্ণনে নাচিত কাঞ্চীবাঁধন খুলে'
এম্নি কোন-এক চাঁদের আলোয়—মরু-'ওয়েসিসে' তরুর মূলে।
বীর যুবাদল শত্রুর সনে বহুদিন ব্যাপী রণের শেষে
এম্নি কোন-এক চাঁদনি বেলায় দাঁড়াত নগরী-তোরণে এসে।
কুমারীর ভিড় আসিত ছুটিয়া, প্রণয়ীর গ্রীবা জড়ায়ে নিয়া
হেঁটে যেত তারা জোড়ায় জোড়ায় ছায়াবীথিকার পথটি দিয়া।
[চাঁদিনীতে, ঝ. পা.]

২. এসেছে নাগর,—যামিনীর আজ জাগর রঙীন আঁখি—
কুয়াশার দিনে কাঁচুলি বাঁধিয়া কুচ রেখেছিল ঢাকি,
আজিকে কাঞ্চী যেতেছে খুলিয়া,—মদঘূর্ণনে হায়।
নিশীথের স্বেদ সীধুধারা আজ ক্ষরিছে দক্ষিণায়।
[দক্ষিণা, ঝ. পা.]

এ-সব উচ্চারণ মোহিতলাল-নজরুলের ইন্দ্রিয়বেদী কবিতার সান্দ্র ছায়ায় আচ্ছন্ন। অল্পকাল পরেই এই পূর্বজ ছায়া সর্বাংশে সরিয়ে-হটিয়ে দিয়েছিলেন জীবনানন্দ। উদ্ধের্বাদ্ধৃত কবিতার অভিন্ন বিষয় নিয়ে রচিত দুটি পরবর্তী কবিতার অংশ পাশাপাশি মিলিয়ে দেখা যেতে পারে :

১. চারিপাশে বনের বিস্ময়
চৈত্রের বাতাস,
জ্যোৎস্নার শরীরের স্বাদ যেন,
ঘাইমৃগী সারারাত ডাকে ;
কোথাও অনেক বনে—যেইখানে জ্যোৎস্না আর নাই
পুরুষ-হরিণ সব শুনিতেছে শব্দ তার ;

তাহারা পেতেছে টের,
আসিতেছে তার দিকে।

[ক্যাম্পে, ধূ. পা.]

২. আজ এই বসন্তের রাতে
ঘুমে চোখ চায় না জড়াতে ;
ওই দিকে শোনা যায় সমুদ্রের স্বর,
স্কাইলাইট মাথার উপর,
আকাশে পাখিরা কথা কয় পরস্পর।

[পাখিরা, ধূ. পা.]

জীবনানন্দের আত্মোচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে প্রাকব্যবহৃত মাত্রাবৃত্ত অক্ষরবৃত্তে পরিবর্তিত হ'য়ে যায়।

প্রাথম জীবনানন্দে আরো প্রভাব ফেলেছে মোহিতলালের দুরাপিপাসা ও জীবনোল্লাস। কএকটি উদাহরণ :

১. স্বপন সুরার ঘোরে
আখের ভুলিয়া আপনারে আমি রেখেছি দিওয়ানা করে'।
জনম ভরিয়া সে কোন্ হেঁয়ালি হ'লো না আমার সাধা,—
পায় পায় নাচে জিঞ্জির হায়,—পথে পথে ধায় ধাঁধা।
নিমিষে পাসরি' এই বসুধার নিয়তি মানার বাধা
সারাটি জীবন খেয়ালের খোশে পেয়ালা রেখেছি ভরে।

[আমি কবি—সেই কবি, ঝ. পা.]

২. জীবন-পথের তাতার দস্যুগুলি
হুল্লোড় তুলি' উড়ায়ে গিয়েছে ধূলি
মোর গবাক্ষে কবে !
কণ্ঠ-বাজের আওয়াজ তাদের বেজেছে স্তব্ধ নভে !
আতুর নিদ্রা চকিতে গিয়েছে ভেঙে
সারাটি নিশীথ খুন-রোশনাই প্রদীপে মনটি রেঙে।
একাকী রয়েছি বসি'
নিরালা গগনে কখন নিভেছে শশী
পাইনি যে তাহা টের।

—দূর দিগন্তে চ'লে গেছে কোথা খুশরোজী মুসাফের।
কোন সুদূরের তুরাণী প্রিয়ার তরে
বুকের ডাকাত আজিও আমার জিঞ্জিরে কেঁদে মরে।[১]

[জীবন-মরণ দুয়ারে আমার, ঝ. পা.]

৩. মসজেদ-সরাই-শরাব
ফুরায় না তৃষা মোর,—জুড়ায় না কলেজার তাপ।

[একদিন খুঁজেছিনু যারে, ঝ. পা.]

৪. আমি গো লালিমা,—গোধূলির সীমা,—বাতাসের 'লালা' ফুল।
দুই নিমেষের তরে আমি জুলি
নীল আকাশের গোলাপী দেয়ালি !
আমি খুশরোজী,—আমি গো খেয়ালী
চঞ্চল,—চুলবুল।

[যে-কামনা নিয়ে, ঝ. পা.]

তাঁর প্রথম পর্বে মোহিতলালের প্রতিধ্বনি ও অনুরণন ধ্বনিত রণিত হয়েছে বারংবার। কএকটি দিব-গুচ্ছ :

১. তাতার-দস্যু ভেঙে ফেলে যেন ঘর-দুয়ার।

[হাফিজের অনুসরণে, স্বপনপসারী : মোহিতলাল]

জীবন-পথের তাতার-দস্যুগুলি
হুল্লোড় তুলি উড়ায়ে গিয়েছে ধূলি।

[জীবন-মরণ দুয়ারে আমার, ঝ. পা.]

[১] জীবনানন্দের তৎকালীন চিঠিতেও আছে ঝ. পা.-এর এইসব কবিতার ভাষা ও আবহ :
চারদিকে সবুজ বনশ্রী, মাথার উপর সফেদা মেঘের সারি, বাজপাখির চক্কর আর কান্না। মনে হচ্ছে যেন মরুভূমির সর্বাজ বাগের ভেতর বসে আছি, দূরে-দূরে তাতার-দস্যুর হুল্লোড়। আমার তুরাণী প্রিয়াকে কখন যে কোথায় হারিয়ে ফেলেছি।...হঠাৎ কোত্থেকে কত কি তাগিদ এসে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় একেবারে বেসামাল বিশ-মাল্লার ভিড়ে। সারাটা দিন—অনেকখানি রাত—জোয়ার ভাটায় হাবু ডুবু।
[অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে লেখা পত্র, "কল্লোল যুগ" : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পৃ ১০৬]

২.   কালো পশমের বোরকা ছিঁড়িয়া দেখা দিল মোর সবজা হুরী–
নাকে মুখে মোর পিয়ালা পিয়ায়, পুরানো সে গান হাওয়ায় পুরি'।

[বেদুঈন, [২] স্বপনপসারী]

পিয়ালা চুমিয়া পিয়াই গো রাঙা
পিয়ালার মধু,—তুলি রাত জাগা
হোরীর হা রা রা সাড়া।

[যে কামনা নিয়ে, ঝ. পা.]

৩.   জ্যোৎস্না-জরীন ঘাসের ফরাস—ছায়ারা সব কোণ খুঁজে'
'সরো'র সারির তলায় জোটে, নিঝুম রাতির মন বুঝে'।

[ইরানী, স্বপনপসারী]

হয়তো সেদিনও ডেকেছে পাপিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া সরোর শাখে
হয়তো সেদিনও পাড়ার নাগরী ফিরেছি এমনি গাগরী কাঁখে।

[চাঁদনীতে, ঝ. পা.]

জীবনানন্দ আরবি ফারসি শব্দব্যবহারে নজরুলের চেয়ে মোহিতলালের কাছেই বেশি ঋণী। জীবনানন্দের ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দের একটি বর্ণানুক্রমিক সঙ্কলন :

আখের* ; আশেক* ; ইয়োসোফ* ; ইবলিশ* ; ঈদ* ; কলেজা* ; কাফন* ; কাফের* ; কারবালা* ; খেয়াল* ; খারাবী* ; খুন* ; খুনসুড়ি* ; খুন-রোশনাই* ; খুশরোজী* ; খোশ* ; গজল-এলাহি* ; গুলজারিয়া[৩] ; জমিন[৪] ; জর্দা ; জিঞ্জির* ; জিন-সর্দার* ; জোলুস* ; তখত* ; তালাস* ; তাবিজ ; দরিয়া ; দরাজ* ; দস্তুর ; দাস্তানা ; দরদ* ; দিওয়ানা ; দিল* ; দিলদার*[৫] ; দিলওয়ার* ; নার্গিস* ; পশমিনা* ;

[২] 'বেদুঈন' শীর্ষে জীবনানন্দও একটি কবিতা লিখেছিলেন ('কল্লোল,' বৈশাখ ১৩৩৩)।

[৩] মোহিতলাল (ও সত্যেন্দ্রনাথ) ব্যবহার করেছেন 'গুলজার' ; জীবনানন্দ বাংলা প্রত্যয় ব্যবহার ক'রে এর নবীভূত রূপ দিয়েছেন।

[৪] শব্দটি কবির উত্তরকালীন একটি কবিতায় প্রাপ্তব্য : 'অবশেষে একদিন থেমে/মনে হয় ক্লান্তির সাগর/মাঝে মাঝে চেনাতে চেয়েছে তার/দুই ফুট জমিনের ঘর।' ('ডালপালা নড়ে বারবার', জীবনানন্দ দাশ)।

[৫] 'দিলদার' শীর্ষে মোহিতলালের একটি কবিতাই বর্তমান ("স্বপনপসারী")।

পানসী ; পায়েল* ; পাঁয়জোর ; পিয়ালা* ; পুছে ; বহিন ; বুরুজ* ; বেহেশ্‌ত* ; বান্দা* ; বাঁদী* ; মসজেদ* ; ময়দান* ; মস্তান* ; মশগুল* ; মশলাদার ; মেজাজ ; মেহেরাব* ;মোতিয়া ; মুসল্লা* ; মুসাফের* ; রবাব* ; রেওয়াজ ; রোজ* ; রোশনাই* ; শফর ; শরাব ; শরাবখানা*[৬] ; শুঁড়িখানা ; শাহাদারা* ; শের* ; শাহানশাহা* ; শামিয়ানা* ; সরাই* ; সরাইখানা* ; সাকী* ; সারেঙ*[৭] ; সোনেলা*[৮] ; সোয়ার* ; হাওয়া*।

উপরের তারকা-চিহ্নিত শব্দগুলি মোহিতলাল মজুমদার-ব্যবহৃত। সত্যেন্দ্রনাথ এর মাত্র কএকটি শব্দ ব্যবহার করেছেন ('ঈদ', 'খুশরোজী', 'দরিয়া', 'মশগুল', 'মোতিয়া', 'শের', প্রভৃতি)। নজরুল-প্রযুক্ত শব্দ (এই তালিকা থেকে) হয়তো আর-একটু বেশি। কিন্তু এ প্রমাণ করছে জীবনানন্দ আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারে মোহিলালের দ্বারাই প্রধানত উদ্বোধিত হয়েছিলেন। জীবনানন্দের আরবি-ফারসি শব্দগুচ্ছের এই তালিকা "ঝরা পালক" থেকে আহৃত ; 'ময়দান', 'হাওয়া', 'সোনেলা', 'জমিন' প্রভৃতি মাত্র কিছু শব্দ তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। "ধূসর পাণ্ডুলিপি" থেকেই আরবি-ফারসি শব্দব্যবহার লক্ষণীয়ভাবে ক'মে যায়, কেননা ততোদিনে তিনি স্বকীয়তা অর্জন করেছেন। আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারের যে-রেওয়াজ প্রচলিত হয়েছিলো সত্যেন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-নজরুলের হাতে, তা কিছুকাল বাহিত হ'য়ে চলে জীবনানন্দ-প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখের লেখনীতে। ভিন্ন অনুষঙ্গ ও আবহ রচনার তাগিদে এইসব আরব্য-পারশ্য সন্দীপন যেমন দরকার হয়েছিলো এক-সময়, তেমনি দেশজ চিত্রাঙ্কনেও এ প্রয়োজনীয় হ'য়ে দেখা দিয়েছিলো। অজস্র আরবি-ফারসি শব্দ আমাদের দৈশিক বাক-ব্যবহারে মিশেছে। বাংলা গল্প-উপন্যাসের মতো বাংলা কবিতা যখন সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের ছন্দ আয়ত্ত করতে শিখলো, তখন সে দেশজ শব্দাবলিও প্রয়োগ করতে থাকে ব্যাপকভাবে : কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ-নজরুল-জীবনানন্দ-প্রেমেন্দ্র মিত্র-বুদ্ধদেব বসু, গদ্যে অচিন্ত্যকুমার-নজরুল-মনীশ

[৬] 'শরাবখানা' মোহিতলালের একটি অনুবাদ-কবিতার নাম ("হেমন্ত-গোধূলি")।

[৭] মোহিতলালে 'সারং'—সারেঙ্গী ('শরাবখানা', "হেমন্ত গোধূলি")। প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন ('সারেং', 'মেঘলা মোহ', "প্রথমা")।

[৮] শব্দটি কবির উত্তরকালীন কবিতায় প্রাপ্তব্য : 'পশ্চিমের মেঘে আলো একদিন হয়েছে সোনেলা।' ('প্রেম', ধূ. পা.)।

ঘটক প্রবন্ধ। অতঃপর মোহিতলালের আরবি-ফারসি শব্দব্যবহারের একটি চয়নিকা নির্মাণ করা যাক :

আওরাত, আওয়াজ, আকবর, আখের, আখেরি-জমানা, আফসোস, আবরু, আরজ, আরজমন্দ, আল্লা, আশেক, আবরু, আবেহায়াত, ইজ্জত, ইবলিশ, ইল্লত, ইয়োসোফ, ইশারা, এনসান, ওক্ত, কওসর, কমবক্ত, কমজাত, কলিজা, কাফন, কাফের, কেয়ামত, কিনারা, কুদরত, খুন, খুন-খোশরোজ, খোদা, খোশহাল, খোশনাম, গজব, গজল-ইলাহী, গর্দান, গুণা, গুল, গুলশান, গুলজার, গুলবাগ, গুলে-স্তান, গাফুর, গোলামখানা, চেরাগ, জান্নাত, জমিন, জবান, জবাব, জলুস, জাহান্নাম, জিন, জিন-সর্দার, জিঞ্জির, জোয়ান, জরীন, জাম, তখত, তখত-তাউস, তহুরা, তাজ, তাজ্জব, তাঞ্জাম, তামিল, তামাশা, দরদ, দরিয়া, দরবার, দুনিয়া, দুষমন, দুষমনি, দিলদার, দিল্লগী, দিলাওয়ার, দোজোখ, দোস্তি, নজর, নওরোজ, নওবৎ (ও নহবত), নওশা, নসীব, নার, নার্গিস, নিশানা, নুর, পর্দা, পয়মাল, পসরা, পশমিনা, পায়েলা, পিরাহান, পিয়ারী, ফেরেস্তা, বখরা, বাঁদী, বান্দা, বাগিচা, বাদশাহী, বেদরদী, বেল্লিক. বেঈমান, বেতমিজ, বেহোঁস, বিলকুল, বুরুজ, বুজদেল, বাহার, বোখার, বোস্তান, মসনদ, মঞ্জিল, মশগুল, মজলিশ, মসজেদ, ময়দান, মস্তানা, মগরেব, মাতো-য়ারা, মাফ, মুর্দা, মুসল্লা, মুসাফের, মুল্লুক. মেহেরবান, মেহেরাব, মিনার, রবাব, রহিমর-রহমান, রোজা, রোজ-কেয়ামত, রোশনাই, রুহ, লড়াই, লহমা, লালা, লোহু, লোকশান, শরবত, শরাব, শমশের, শয়তান, শামাদান, শাহানশাহা, শাব্বাস, শামিয়ানা, শাহদারা, শিরিন, সওদা, সওয়াব, সহেলি, সমঝদার, সিরাজী, সোনেলা, হরদম, হয়রান, হাওদা, হাওয়া, হাল, হামাম, হায়াত, হুকুম, হুঁশ।

শব্দগুচ্ছ সমাহৃত হ'লো মোহিতলাল মজুমদারের সমগ্র কাব্যসংগ্রহ থেকে। এইসব কাব্যের কএকটি বিশেষ কবিতাই আরবি-ফারসি শব্দঋদ্ধ : 'দিলদার', 'নাদির শাহের জাগরণ', 'নাদির শাহের শেষ', 'ইরানী', 'শেষ-শয্যায় নুরজাহান', 'বেদুঈন', 'গান', ("স্বপনপসারী"), 'নুরজাহান ও জাহাঙ্গীর' ("বিস্মরণী"), 'শরাবখানা/সুফী কবিতা', 'গজল'/জালালউদ্দিন রুমি, 'ফার্সি-ফরাস'/ফার্সির ইংরেজী থেকে, 'রুবাইগুচ্ছ' ("হেমন্ত-গোধূলি") ও 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরঙ্গজীব'। লক্ষণীয় যে মোহিতলাল

আরবি-ফারসি শব্দ প্রয়োগ করেছেন ইতিহাসের পটভূমি রচনায় কিংবা অনুবাদ-কাব্যে ; আর জীবনানন্দ কাল্পনিক দূর-পিপাসায়, ইতিহাস-ভূগোলের দূরবিহার নির্মাণে।

যে-যৌগিক শব্দব্যবহারে নজরুল ইসলাম অসাধারণ বিশিষ্ট, মোহিতলালে জীবনানন্দে আছে তারও প্রয়োগ। জীবনানন্দ-ব্যবহৃত যৌগিক শব্দাবলি :

> দাদুরী-কাঁদানো, শাঙন-দরিয়া, স্বপ্ন-ময়ূর, মানব-দেব, দাব-মরুভূমি, জোলুশ-রাঙা, ছলা-মরীচিকা, মরণ-সাহারা, কেউটে-ঢেউ, অতীত-আখের, ফেনা-সই, জলধি-পাখী, জল-বেদিয়া, ঊর্মি-নাগবালা, ছায়া-বৌ, হৃদয়-মাস্তুল, আকাশ-মরু, সাগর-মরু,জীবন-বীণা, আকাশ-শুঁড়িখানা, আগুন-ছুঁড়ি, নাশপাতি-গাল, কপোত-ব্যথা, মেঘ-বৌ, পৌষ-নীরবতা, শকুন-বধূ, ঘুম-কুমারী, ময়ূর-নীলিমা, কামনা-সাহারা, করাত-দাঁত, হিমানী পাথার, নীহার-নীল, প্রেত-প্রাণ, চাঁদিনী-শরাব, শিশির-শীর্ণ, আকাশ-শিথান, সৃষ্টি-বধূ, প্রেত-চোখ, প্রেত-জ্যোৎস্না, ভ্রূণ-ভ্রষ্ট, গরল-মদির, মায়া-ভুজঙ্গিনী, নভো-নীল, বীর-শের, স্পন্দন-পাগল, সাগর-শকুন্ত, সিন্ধু-বেদুঈন, দিল-পিয়ালা, স্বপন-ফানুষ, রাত্রি-কুমারিকা, আঁধার-সাগর, আঁধার-সাহারা, নিশি-মরু, প্রেম-খঞ্জর, করুণা-প্রদীপ, চিতা-ফণা, বিধবা-নয়ন, অশ্রু-অমামিশা, মশাল-দরাজ, নাটকান-রাঙা, খুনে-রোশনাই, সাগর-বলাকা, প্রেত-চাঁদ, কপাল-কবর, মুসাফের-হিয়া, জীবন-রবাব, দূর-সোহাগী, ঘর-বিবাগী।

মোহিতলাল ব্যবহৃত যৌগিক শব্দপুঞ্জ :

> মর্ত-মরু, কেশ-তপোবন, অধর-গোলাপ-কানন, জ্যোৎস্না-চিকন (২), বাসনা-ব্যথা, কুহেলি-নিচোল, মানস-মরাল (২), রেশমী-রঙীন, আলোক-তুফান, পরাগ-উত্তরীয়, চাঁদিনী-চাঁদোয়া, জ্যোৎস্না-রূপসী, মেঘ-গুণ্ঠন, পীরিতি-মধু, দিল-পিয়ারা, আগুন-ফুল, মানুষ-মেষ, প্রাণ-বাজপাখী, খুন-খোশরোজ[৯], নরশির-পর্বত, কস্তুরী-কালো, মরু-সন্তান, কুমারী-ঊষা, আঁধার-বিলাসী[১০], রূপ-বৃন্দাবন, অলখ্-

[৯] জীবনানন্দে : 'খুন-রোশনাই'।

[১০] জীবনানন্দ বহুকাল পরে ব্যবহার করেছেন 'তিমির-বিলাসী' ('তিমিরহননের গান', "সাতটি তারার তিমির") ; স্পষ্টত মোহিতলাল থেকে আহৃত।

চন্দ্রালোক[১১], ফাল্গুন-ফুল, আগুন-খেলা, দিল-ভোলা, নটকান-রাঙা[১২], প্রেম-কোকনদ, বাদশা-বাড়ী, রৌদ্র-শরাব[১৩], অলখ-সেতার, আগুন-গান, আশমান-গাঙ, গোলাপ-আনন, গোলাপ-গাল, স্মৃতি-মেঘ, শিশির-সন্ধ্যা[১৪], অলোক-আলোক-আঁখর, শিশির-স্বপন, জীবন-সায়র, নিশীথ-নীরব, স্বরগ-সুধা, স্বপন-কারা, রূপ-হর্ম, দেহ-পত্র-বাট, দেহ-দ্রুম, হৃদয়-বাঁশরী, চিত্ত-কুহর, সোমসূর্য-রথচক্র, পরিণয়-যূপ, মৃত্যু-নীল, মর্ম-মধু, চিত্ত-চূড়া, বাসনা-বহ্নি, তিমির-দুকূল, উল্কা-হার, জন্ম-পারাবার, অন্ধ-আরতি, ময়ূখ-হার, মর্মর-মসৃণ, দৃষ্টি-চুমা, স্মরণ-শিখা, দুপুর-নিঝুম, আলোক-দুকুল, গোধূলি-ধূসর, পাপ-ভীরু, সুখ-লম্পট, শৈল-চুচুক, জ্যোৎস্না-স্নেহ, চাহনি-বাণ, মরণ-নদী, জ্যোৎস্না-গোধূলি, স্মৃতি-বিষ[১৫], স্বর্গ-পথিক, পল্লব-পারাবার, আকাশ-মরু[১৬], অভিজ্ঞান-তারকা-অঙ্গুরী, কুয়াশা-রঙীন, জীবন-যমুনা, ছায়া-তরু, প্রাণ-প্রবাহিনী, বুদ্বুদ-বিলাস, অশ্রু-শিশির, রৌদ্র-মদিরা, তুমি-মদ।

জীবনানন্দের যৌগিক শব্দগুচ্ছ "ঝরা পালক" থেকে আহৃত ; মোহিতলালের যৌগিক শব্দব্যবহার ক্রমশ শমিত হ'য়ে এসেছে ; কিন্তু একেবারে অবলেশ হ'য়ে যায়নি কখনো। জীবনানন্দের যৌগিক শব্দ "ঝরা পালক"-উত্তর কাব্যে প্রায় প্রযুক্তই হয়নি আর (প্রায় গোয়েন্দা লাগিয়ে খুঁজে বের করতে হয় 'হিম-চোখ', 'তিমির-বিলাসী', 'তিমির-বিনাশী' ইত্যাদি শব্দ)। যৌগিক শব্দে যে-অর্থঘনিমা ও বাচংযম দ্রষ্টব্য মোহিতলালের কাব্যচারিত্র্য ছিলো তারই অনুরূপ, আর জীবনানন্দের বিস্তারিত ও বহুলাঙ্গ কবিতার প্রয়োজনেই পরে তাঁকে বর্জন করতে হয়েছিলো যৌগিক শব্দভাণ্ডার। জীবনানন্দ-যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে তা

[১১] জীবনানন্দে : 'অলখ অরুণোদয়' ('সময়ের কাছে', সা. তা. তি.)।
[১২] জীবনানন্দ এই যৌগিক-শব্দটি অবিকল ব্যবহার করেছেন ; পরে পরিবর্তিত ব্যবহার করেছেন : 'নটকান-রক্তিম'।
[১৩] জীবনানন্দে : 'চাঁদিনী-শরাব'।
[১৪] সুধীন্দ্রনাথে : 'বৈদেহী বিচিত্রা আজি সঙ্কুচিত শিশির-সন্ধ্যায়' ('হৈমন্তী', "অর্কেস্ট্রা")।
[১৫] এই যৌগিক শব্দটি সুধীন্দ্রনাথ একটি অনুবাদ-কবিতার নাম হিশেবে ব্যবহার করেছেন ("প্রতিধ্বনি")।
[১৬] জীবনানন্দ এই শব্দটি অবিকল ব্যবহার করেছেন।

করেছিলেন তা নয়, কিন্তু যে-কবিস্বভাব কবির চারিত্র্য নির্মাণ করে, তা-ই তার নিজের নিয়মে কবিতার প্রকরণেরও ঈশ্বর। বস্তুত উত্তরকালে জীবনানন্দ কএকটি যৌগিক শব্দে যে-উপমা বা-প্রতিমা প্রচ্ছন্ন থাকে, তাকেই বের ক'রে এনে শিথিল সাজিয়েছিলেন তাঁর কবিতায়। মোহিতলালের 'রৌদ্র-মদিরা' বা 'রৌদ্র-শরাব' যৌগিক শব্দ জীবনানন্দে কীভাবে রূপান্তরিত হ'য়ে গিয়েছিলো তার সাক্ষ্য ধ'রে রেখেছে জীবনানন্দের একটি অগ্রন্থিত কবিতা 'জীবন-সঙ্গীত'। মোহিতলালের মতোই মৃত্যুত্তীর্ণ জীবনের গান রণিত হয়েছে এই কবিতায় ; এখানে 'রৌদ্র-মদিরা' বা 'রৌদ্র-শরাব' শব্দটিকে ভেঙে একটি দীঘল ইমেজে পল্লবিত ক'রে তুলেছেন তিনি—এবং ফলত তা একটি নূতন স্বাদের সূচনা করে। অন্য একটি কবিতা : 'ডালিম-ফুলের মতো ঠোঁট যার—রাঙা আপেলের মতো লাল যার গাল,/চুল যার শাঙনের মেঘ,—আর আঁখি গোধূলির মতো গোলাপী রঙীন' —এই উপমা-চতুষ্টয়কে চারটি যৌগিক-শব্দে সংকুচিত করা যেতে পারতো : ডালিম-ঠোঁট, আপেল-গাল, মেঘ-কেশ, গোধূলি-আঁখি। এই কবিতাটি, 'ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল', "ঝরা পালক"-এরই অন্তর্ভুক্ত, এবং তখনো জীবনানন্দ নজরুল-মোহিতলালের মতো যৌগিক শব্দবৃত্তে সঞ্চারী, কিন্তু উত্তরকালে তাঁর যৌগিক শব্দের স্থান ক'রে নিয়েছিলো উপমা ও উৎপ্রেক্ষা, চিত্র ও চিত্রকল্প।

প্রকরণনিষ্ঠ মোহিতলাল তাঁর একটি কবিতায় স্পেনসরীয় স্তবক নির্মাণ করেছিলেন ; জীবনানন্দও তাঁর দুটি কবিতায় ঐ ছন্দ অনুসরণ করেন। সম্ভবত কবির ভিতরমহলে তখনো চলছিলো মোহিতলালের অনুবৃত্তি :

সেই এক মুক্ত-নারী !—গৃহলক্ষ্মী, জায়া ও জননী—
সেই ভোগসুখ-তরে সেই নিত্য আত্মবলিদান !
দেহের মৃত্তিকা দলি' রাসমঞ্চ গড়িছে তেমনি,
শিশুরে পিয়ায় সুধা, রতি-বিষে পুরুষ অজ্ঞান !
হৃদয়ের ক্ষুধা তার মানে না যে ন্যায়ের বিধান,
যত দুঃখ তত সুখ, নাই পুণ্য পাপের ভাবনা ;
সর্ব্বত্যাগী অন্ধ কাম—সেই তার প্রেমের প্রমাণ !
নিঃশেষে বিলায়ে দেহ হয় তার স্নেহ-উদ্দীপনা,
যে তার সর্বস্ব হরে—সেই পতি, তারি কণ্ঠে সুচির-লগনা !

[নারীস্তোত্র, স্মরগরল]

চারিদিকে বেজে ওঠে অন্ধকার সমুদ্রের স্বর—
নতুন রাত্রির সাথে পৃথিবীর বিবাহের গান।
ফসল উঠিছে ফ'লে ;—রসে রসে ভরিছে শিকড়,
লক্ষ নক্ষত্রের সাথে কথা কয় পৃথিবীর প্রাণ।
সে কোন্ প্রথম ভোরে পৃথিবীর ছিলো যে সন্তান
অংকুরের মতো আজ জেগেছে সে জীবনের বেগে।
আমার দেহের গন্ধে পাই তার শরীরের ঘ্রাণ—
সিন্ধুর ফেনার গন্ধ আমার শরীরে আছে লেগে।
পৃথিবী রয়েছে জেগে চক্ষু মেলে—তার সাথে সেও আছে জেগে।

[জীবন, ধূসর পাণ্ডুলিপি]

মোহিতলালের 'নারীস্তোত্র' ঊনিশ স্তবকে সমাপ্ত ; জীবনানন্দের স্পেনসরীয় স্তবকে নির্মিত কবিতাযুগ 'জীবন' চৌত্রিশ স্তবকে ও 'অনেক আকাশ' বাইশ স্তবকে সমাপ্ত। জীবনানন্দের 'প্রেম' দশ পঙক্তির স্তবকে গঠিত, তেরোটি স্তবকে সম্পূর্ণ। এরকম দীর্ঘ স্তবকবন্ধে মোহিতলালের বেশ-কিছু কবিতা আছে : 'বুদ্ধ' ("স্মরগরল") ছয় পঙক্তির তেইশ স্তবকে, 'পান্থ' ("বিস্মরণী") সাত পঙক্তির আটাশ স্তবকে (এটি স্পেনসরীয় স্তবক-সজ্জার একটি রূপান্তর ; মিলসজ্জা : ক খ ক খ ক খ খ—শেষ পঙক্তিটি অন্য পঙক্তির চেয়ে দীর্ঘতর), 'কালাপাহাড়' ("বিস্মরণী") সাত পঙক্তির বারো স্তবকে, 'সত্যেন্দ্র-বিয়োগে' ("বিস্মরণী") ছয় পঙক্তির নয় স্তবকে, 'আবির্ভাব' ("স্বপনপসারী") ছয় পঙক্তির ষোলো স্তবকে। জীবনানন্দও বেশ দীর্ঘ-দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন। তাঁর দীর্ঘ কবিতায় স্তবক-বন্ধের নিবিড়তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবি পালন করেননি—উপান্ত্যকালীন দীর্ঘ কবিতাগুচ্ছে তো নয়ই।

মোহিতলাল ও জীবনানন্দ : দুই কবিই রূপান্বেষী। দু'জনের আকাঙ্ক্ষার ভাষাও এক হ'য়ে দেখা দিয়েছে : মোহিতলালের 'কামনা' ("স্বপনপসারী") ও জীবনানন্দের 'যে-কামনা নিয়ে' (ঝ. পা.) কবিতাদ্বয়ের পাশাপাশি স্থাপনায় তার সাক্ষ্য প্রাপ্তব্য। মোহিতলাল বলেছেন 'মধু-পিপাসায় রঙের নেশায় ভুলাইব মধুকরে' আর জীবনানন্দ 'যে-কামনা নিয়ে মধুমাছি ফেরে বুকে মোর সেই ভাষা/খুঁজে মরি রূপ···।' 'রতি ও আরতি' ("স্মরগরল") কবিতায় মোহিতলাল জানিয়েছেন, 'আমি কবি, অন্তহীন রূপের পূজারী।' এই চিন্তারই কি ভাবরূপ নয় জীবনানন্দের 'আমি কবি, —সেই কবি' ও 'কবি' (ঝ. পা.) কবিতাদ্বয় ? মোহিতলাল তাঁর একটি

পত্রে জ্ঞাপন করেছেন, 'আমি "রূপবিলাসী" নই—"রূপতান্ত্রিক"।' জীবনানন্দ কি শুধুই রূপবিলাসী?

যে-মরণস্বামীর দখলে চ'লে গিয়েছিলেন জীবনানন্দ, কালের যে ক্ষুৎ-চেতনার শিকার হয়েছিলেন জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ, তার সূচনা হয়েছিলো মোহিতলালে ও যতীন্দ্রনাথে। মোহিতলালেই আধুনিক অর্থে প্রথম উদ্‌গত হয়েছিলো মৃত্যুচেতনা, কিন্তু মৃত্যুঅতিকামী জীবনোল্লাসও; জীবনানন্দ প্রাথমিকভাবে আরো গাঢ়ভাবে এই মৃত্যুপটভূমিকায় জীবনার্থ সন্ধান করেছিলেন: 'ভূস্তরের অন্ধকারে চূর্ণ তারা;/কিন্তু আমাদের আয়ু সানস্পট গিলে ফেলে সূর্যের মতন ব্যক্তিগত' ('জীবনসংগীত') ও 'রৌদ্র নিভে গেলে পাখি-পাখালির ডাক/শুনিনি কি? প্রান্তরের কুয়াশায় দেখিনি কি উড়ে গেছে কাক!' ('মৃত্যুর আগে', ধূ. পা.) এইসব উচ্চারণে সেই মনোভাবনা উৎকীর্ণ। মোহিতলালের 'জীবন-দর্শন' জাগৃতির সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মরণভাবনাও উচ্চকিত, এবং "বিস্মরণী" থেকেই দু'এর সূচনা: এতে পার্থিব রূপ ও পার্থিব প্রেমের প্রতি কবি-চিত্ত আকর্ষিত হয়েছে—১. 'দেহী আমি মন্দিরে মন্দিরে তাই পরশ ভিখারী' ('স্পর্শ-রসিক'); ২. 'জেলে নে রে দেহ-দীপে স্নেহ ভালোবাসা/—নবজন্ম আশা' ('মোহমুদ্‌গর'); ৩. 'সত্য শুধু কামনাই—মিথ্যা চির-মরণ পিপাসা/দেহহীন, স্নেহহীন, অশ্রুহীন বৈকুণ্ঠ-স্বপন।' ('পান্থ') মৃত্যু-ভাবনায় আচ্ছন্ন কবিতা 'মৃত্যু' ("স্বপনপসারী") ও 'মৃত্যু ও নচিকেতা' ("বিস্মরণী") প্রভৃতি কবিতা। আরো: ১. 'অমানিশার মুখের 'পরে বৃষ্টিধারার ঝালর ঝরে/সিঁথির 'পরে বিজলী-সিঁদুর, মরণ-বিয়ের বাসর-ঘরে।' ('শবসঙ্গীত') ২. 'আমি চেয়ে থাকি অনিমিখ-আঁখি মরণ-শয়নাগারে; /প্রলয় ঘটাই, তবু নিবে যাই মলয়ের ফুৎকারে।' ('দীপ-শিখা'); ৩. 'উৎসব শোভা ম্লান হ'য়ে যায়/আলোকের অবসানে/মরণের ফুল বড় হ'য়ে ফোটে জীবনের উদ্যানে' ('মৃত্যু-শোক')।—জীবনানন্দ জীবন-মৃত্যুর এই কিনারা থেকেই তাঁর কবিতার সূত্র তুলে নিয়েছিলেন, নিয়ে অগ্রসর হ'য়ে গিয়েছিলেন আরো গভীর গহনে॥

জীবনানন্দ ও নজরুল

জন্মেছিলেন একই বর্ষে, ১৮৯৯-এ, জীবনানন্দ দাশ ও নজরুল ইসলাম। কিন্তু দু'জন হ'য়ে রইলেন দু'যুগের কবি, দুই আলাদা ও পরস্পর সময়-

স্রোতে কবি-স্তম্ভ, প্রাক-ও উত্তর-পঞ্চাশ কাব্যেতিহাসে। এর কারণ, বিষয়-বিন্যাসের প্রশ্নপ্রসঙ্গটি যদি সরিয়ে রাখি, নজরুলের উত্থান কিছু আগে ১৩২৬ (১৯১৯) সালে, যখন তাঁর প্রাথমিক গদ্য-পদ্য প্রচেষ্টা বেরোতে থাকে পত্রালিপুঞ্জে ; আর জীবনানন্দের—যতোদূর জানা যায়—আদি কবিতাবলি প্রকাশিত হয় ১৩৩২ (১৯২৫) সালে। 'বঙ্গবাণী', 'কল্লোল', 'প্রগতি', 'কালিকলম' প্রভৃতি পত্রিকায় এই দুই পরিণাম-বিধর্মী কবির কবিতা একই সঙ্গে বেরোতো। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হ'তে-হ'তে 'হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম' পরিণত হন 'নজরুল ইসলাম'-এ, 'জীবনানন্দ দাসগুপ্ত' 'জীবনানন্দ দাশ'-এ। নজরুলের প্রথম কবিতাগ্রন্থ "অগ্নি-বীণা"-র প্রকাশসময় ১৩২৯ (১৯২২), আর জীবনানন্দের প্রথম কবিতা-গ্রন্থ "ঝরা পালক" বেরোয় ১৩৩৪ (১৯২৭) অব্দে। জীবনানন্দের প্রথম কবিতাগ্রন্থ প্রকাশের আগে বা সমপর্যায়ে বেরিয়ে গিয়েছিলো নজরুলের "অগ্নিবীণা" (১৩২৯), "দোলনচাঁপা" (১৩৩০) ,"বিষের বাঁশী" (১৩৩০), "ভাঙার গান" (১৩৩০), "চিত্তনামা" (১৩৩২), "ছায়ানট" (১৩৩২), "পূবের হাওয়া" (১৩৩২), "সাম্যবাদী" (১৩৩২), "সর্বহারা" (১৩৩২), "ঝিঙেফুল" (১৩৩২), "ফণিমনসা" (১৩৩৪), "সিন্ধুহিন্দোল" (১৩৩৪) প্রভৃতি কবিতাগ্রন্থ, এবং আরো অজস্র কবিতা পত্রালিতে পরিকীর্ণ হ'য়েছিলো। অর্থাৎ, ততোদিনে নজরুলের পরিপূর্ণ স্ববিকাশ সংঘটিত হয়েছিলো। এদিকে নজরুল তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থেই অবিসংবাদিতভাবে আত্ম-মুদ্রা চিহ্নিত করেছিলেন ; আর জীবনানন্দকে দ্বিতীয় কবিতাগ্রন্থ (ধূ· পা·) পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকতে হয়েছে। নজরুলের অগ্রগতি হয়েছিলো দ্রুত তালে, আর জীবনানন্দের মন্থর বেগে। নজরুলের প্রভাবরশ্মি দ্রুত বিকীর্ণ হ'য়ে যায় বাংলা কাব্যমণ্ডলে, যাঁরা তাঁর সেই অভিনব, বিস্তীর্ণ ও মোহন খর্পরে পড়েছিলেন জীবনানন্দ তাঁদের অন্যতম।

পরে, ক্রমশ পূর্বোক্ত নজরুলী খর্পর থেকে মুক্ত হ'য়েই বেরিয়ে এসেছিলেন জীবনানন্দ, খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর স্বকণ্ঠ আর আত্মভাষা। কিন্তু তাঁর উত্থান, কবি জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)-এর, বাংলা কাব্যেতি-হাসের একেবারে স্বভাবী ধারায়। উত্তররবীন্দ্রিক কবি তিনি, রবীন্দ্রপ্রভাবের চেয়ে প্রথম রবীন্দ্রবিধর্মী কবিদের ছায়াপাত তাঁর উপর স্বাভাবিক এবং সেই সম্পাত যথাযথভাবেই নিপতিত হয়েছিলো। তাঁর প্রাথমিক কবিতা-গুচ্ছে, প্রথম কবিতাগ্রন্থ "ঝরা পালক" ও তৎসাময়িক গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতাবলিতে, প্রথম রবীন্দ্রবিধর্মী কবিবৃন্দ, নজরুল ইসলাম (১৮৯৯)

সহ মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৪২), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪)-এর খুব স্পষ্ট প্রভাব এসে পড়েছিলো। সত্য, রবীন্দ্ররশ্মি থেকে জীবনানন্দও একেবারে বিমুক্ত নন : তাঁর দ্বিতীয় কবিতাগ্রন্থে (ধূ. পা.) কবি-সার্বভৌমের প্রাথমিক কবিতাচক্র একটি আবর্ত তুলেছিলো।

কিন্তু তাঁর উত্থান ঘটেছিলো নজরুল-মোহিতলাল-সত্যেন্দ্রনাথ-যতীন্দ্রনাথের হাত ধ'রেই। জীবনানন্দের জীবৎকাল মোটামুটিভাবে প্রাথমিক রবীন্দ্রবিধর্মীদেরই সমসাময়িক বটে, কিন্তু কবিতা ক্ষেত্রে তিনি এসেছিলেন আরো পরে, এবং কাব্যেতিহাসে তাঁর অবস্থান পূর্বোক্তদের পাশে নয়—উত্তরে। প্রথম-রবীন্দ্রদ্রোহিরা যে-রবীন্দ্রবিধর্মী কবিতার সূচনা করেছিলেন, যেন তিনি তাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক আয়তনে সরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। সাহিত্যেতিহাসে ট্র্যাডিশন ব'লে যে-কথাটি প্রচলিত, জীবনানন্দের কবিতার ভূমির অবস্থান তারই উৎসঙ্গে।

প্রাথমিক জীবনানন্দের উপর সর্বাধিক প্রভাব পতিত হয়েছে নজরুল ইসলামের। বাংলা কবিতায় যে-বিচিত্র প্রভাবধারা উৎসারণ করেছিলেন নজরুল তা প্রধানত তিনটি স্রোতঃপথে প্রবহমান : রোমান্টিক স্বপ্নকল্পনার ; দ্রোহজনিত ভাবনা-বেদনার ; ইসলামি ভাবাদর্শশীল কবিতার। জীবনানন্দ গ্রহণ করেছিলেন তাঁর রোমান্টিক স্বপ্নকল্পনার বিশ্ব ; নজরুলী দ্রোহজনিত ভাবনা-বেদনাও তাঁর প্রথম পর্বে তরঙ্গ তুলেছিলো। কবির প্রথম পর্ব, "ঝরা পালক", থেকে সন্দীপনমূলক নজরুল-প্রভাবিত কএকটি কবিতাংশ উদ্ধৃত করি, যে-ধরনের কবিতা উত্তরকালে কবি আর লেখেননি :

১. গাহি মানবের জয় !
—কোটি কোটি বুকে কোটি ভগবান আঁখি মেলে জেগে রয় !
সবার প্রাণের অশ্রু-বেদনা মোদের বক্ষে লাগে,
কোটি বুকে কোটি দেউটি জ্বলিছে,--কোটি কোটি শিখা জাগে,
প্রদীপ নিভায়ে মানব-দেবের দেউল যাহারা ভাঙে,
আমরা তাঁদের শস্ত্র, শাসন আসন করিব ক্ষয় !
—জয় মানবের জয় ![১]

[নব নবীনের লাগি, ঝ. পা.]

[১] নজরুল ইসলামের "সাম্যবাদী" কবিতাগ্রন্থের অনেকগুলি কবিতায় অনুরূপ বিষয় ও বিন্যাস দ্রষ্টব্য। যেমন :

২. জয়,—তরুণের জয়
জয় পুরোহিত আহিতাগ্নিক,—জয়,—জয় চিন্ময়।
স্পর্শে তোমার নিশা টুটেছিল ;—ঊষা উঠেছিল জেগে,
পূর্ব্ব তোরণে, বাংলা-আকাশে,—অরুণ-রঙীন মেঘে,
আলোকে তোমার ভারত, এশিয়া,—জগত গেছিল রেঙে ![২]
[বিবেকানন্দ ঝ. পা.]

৩. মহামৈত্রীর বরদ-তীর্থে—পুণ্য ভারতপুরে
পূজার ঘণ্টা মিশিছে হরষে নামাজের সুরে সুরে !
আহ্নিক হেথা সুরু হ'য়ে যায় আজান বেলার মাঝে
মুয়াজ্জেনের উদাস ধ্বনিটি গগনে গগনে বাজে ;
জাগে ঈদগাতে তসবী ফকির, পূজারী মন্ত্র পড়ে,
সন্ধ্যা ঊষার বেদবাণী যায় মিশে কোরাণের স্বরে :
সন্ন্যাসী আর পীর
মিলে গেছে হেথা—মিশে গেছে হেথা মসজিদ, মন্দির ![৩]
[হিন্দু-মুসলমান, ঝ. পা.]

৪. লভিয়াছে বুঝি ঠাঁই
আমার চোখের অশ্রুপুঞ্জে নিখিলের বোন ভাই ![৪]

ক. গাহি সাম্যের গান—
যেখানে আসিয়া এক হ'য়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-খৃষ্টান।
[সাম্যবাদী, সাম্যবাদী]

খ. গাহি সাম্যের গান—
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম্ম জাতি,
সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।
[মানুষ, ঐ]

[২] বিবেকানন্দের উদ্দেশে নজরুল একটি গান রচনা করেন। দ্র "রাঙাজবা"।
[৩] নজরুলের গদ্য-পদ্য বহু রচনায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনবাণী রূপায়িত।
[৪] তুলনীয় :
সাম্যের গান গাই !—
যত পাপী-তাপী সব মোর বোন, সব হয় মোর ভাই।
[পাপ, সাম্যবাদী]

৮—

আমার গানেতে জাগিছে তাদের বেদনাপীড়ার দান,
আমার প্রাণেতে জাগিছে তাদের নিপীড়িত ভগবান,[৫]

[নিখিল আমার ভাই, ঝ. পা.]

জীবনানন্দের পরবর্তী কবিতা জাগরণের এই সুর থেকে বঞ্চিত। বস্তুত বিষয়ের দিক থেকেই জীবনানন্দ সম্পূর্ণ অন্য ঘাটে চ'লে গিয়েছিলেন ; তাই সেই প্রাথমিক উচ্চারণ 'গাহি মানবের জয়/—কোটি কোটি বুকে কোটি ভগবান আঁখি মেলে জেগে রয়' ('নব নবীনের লাগি', ঝ. পা.) আর উত্তরকালীন উক্তি 'জয় অস্তসূর্য, জয়, অলখ অরুণোদয়, জয়,' ('সময়ের কাছে,' সা. তা. তি.) মর্মত পৃথক একেবারে।

যে-মানবপ্রেমে জীবনানন্দ লিখেছিলেন 'নিখিল আমার ভাই' বা 'হিন্দু-মুসলমান'-এর মতো কবিতা, তাই তাঁকে দিয়ে রচনা করিয়েছে 'পতিতা' :

ছোঁয়াতে তাহার ম্লান হ'য়ে যায় শশীতারকার শিখা,
আলোকের পারে নেমে আসে তার আঁধারের যবনিকা।
সে যে মন্বন্তর,—মৃত্যুর দূত—অপঘাত-মহামারী—
মানুষ তবু সে,—তার চেয়ে বড়,—সে যে নারী সে যে নারী !

[পতিতা, ঝ. পা.]

এরই সঙ্গে তুলনীয় নজরুলের 'বারাঙ্গনা' কবিতার মনোভাবনা :

কে তোমায় বলে বারাঙ্গনা মা, কে দেয় থুতু ও-গায়ে ?
হয়ত তোমায় স্তন্য দিয়াছে সীতা-সম সতী মায়ে ;

---

[৫] মাত্রাবৃত্তের যে—বিশেষ চালে "ঝরা পালক"-এর এই সব সন্দীপনমূলক কবিতা ('নব নবীনের লাগি', 'বিবেকানন্দ', 'হিন্দু-মুসলমান', 'নিখিল আমার ভাই') রচিত ; তা নজরুলের অনুরূপ কুশলতাকে স্মরণ করিয়ে দ্যায়। নজরুলের বহু কবিতা এই রীতিবিন্যাসে রচিত : "সাম্যবাদী"-র একাদশটি কবিতা ('সাম্যবাদী', 'ঈশ্বর', 'মানুষ', 'পাপ', 'চোর-ডাকাত', 'বারাঙ্গনা', 'নারী', 'রাজাপ্রজা', 'সাম্য', 'কুলি-মজুর') ছাড়া "সন্ধ্যা" কাব্যের কএকটি কবিতা ('আমি গাই তারি গান', 'জীবন-বন্দনা', 'ভোরের পাখী', 'জাগরণ', 'যৌবন', 'অন্ধদেবতা'), "প্রলয়শিখা" কাব্যগ্রন্থের দুটি কবিতা ('নমস্কার', 'হবে জয়ী') এই পর্যায়ী। নজরুল মাত্রাবৃত্তের এই বিশেষ বিন্যাসরীতি গ্রহণ করেছিলেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের "মরীচিকা" কাব্যের অন্তঃপাতী 'ঘুমের ঘোরে' কবিতাগুচ্ছ থেকে—কিন্তু সেই ব্যঙ্গনিষিক্ত পূর্বজ কবিতাকে তিনি রূপান্তরিত করেন সন্দীপ্ত কাব্যে। জীবনানন্দ স্পষ্টত নজরুলের কাছে ঋণী,

নাই হ'লে সতী তবু তো তোমরা মাতা ভগিনীরই জাতি,[৬]
তোমাদের ছেলে আমাদেরই মত তারা আমাদের জ্ঞাতি ;

[বারাঙ্গনা, সাম্যবাদী : নজরুল]

নজরুলের রোম্যান্টিক স্বপ্নকল্পনার বিশ্ব জীবনানন্দের উপর গভীরতর প্রভাবসম্পাতী। মর্ত্যপৃথিবীর টান দুই কবির উচ্চারণকে এক সূত্রে বেঁধেছে :

বাহিরিনু মুক্ত-পিঞ্জর বুনো পাখী
ক্লান্ত কণ্ঠে জয় চির-মুক্তি ধ্বনি হাঁকি'—
উড়িবারে চাই যত জ্যোতির্দীপ্ত মুক্ত নভ-পানে,
মা আমার ! মা আমার ! একি হ'ল হায় !
কে আমারে টানে মাগো উচ্চ হতে ধরার ধুলায় ?
মরেছে মা বন্ধ-হারা বহ্নি-গর্ভ তোমার চঞ্চল,
চরণ-শিকল কেটে পরেছে সে নয়ন-শিকল।
মা ! তোমার হরিণ-শিশুরে
বিষাক্ত সাপিনী কোন্ টানিছে নয়ন-টানে কোথা কোন্
দূরে !

[মুক্ত-পিঞ্জর, বিষের বাঁশী : নজরুল]

শকুনের মত শূন্যে পাখা বিথারিয়া
দূরে, দূরে, আরো দূরে চলিলাম উড়ে'
নিঃসহায় মানুষের শিশু একা,—অনন্তের শুক্র অন্তঃপুরে
অসীমের আঁচলের তলে !

এবং তাঁর পরবর্তী কবিতায় মাত্রাবৃত্তের অনুরূপ ঢাল প্রয়োগ করেননি তিনি আর।

[৬] বারবনিতার উদ্দেশে লেখা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতা এরই সঙ্গে তুলনামূলক পঠনীয় :

ক. দেখি তোর ভাব আজিকার—
আনন্দাশ্রু এল চক্ষু ভরে,
তুমি—খ্রীষ্ট-অবতার,—
দিনেকের ক্ষণেকের তরে !

[কুন্ধানার্দপ, বেণু ও বীণা : সত্যেন্দ্রনাথ]

স্ফীত সমুদ্রের মত আনন্দের আর্ত কোলাহলে
উঠিলাম উথলিয়া দুরন্ত সৈকতে ;
দূর ছায়াপথে।
পৃথিবীর প্রেত-চোখ বুঝি
সহসা উঠিল ভাসি তারকা-দর্পণে মোর অপহৃত আননের প্রতিবিম্ব খুঁজি
ভ্রূণ-ভ্রষ্ট সন্তানের তরে
মাটি-মা ছুটিয়া এল বুক-ফাটা মিনতির ভরে,—
[সে-দিন এ ধরণীর, ঝ. পা. : জীবনানন্দ]

জীবনানন্দের 'চাঁদিনীতে', 'দক্ষিণা' (ঝ. পা.) প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সঞ্চারী কবিতা নজরুলের অনুরূপ কবিতার—'চাঁদনী রাতে', 'ফাল্গুনী', 'রাখী-বন্ধন', 'মাধবী-প্রলাপ' (সিন্ধু-হিন্দোল)—কবিতার স্মারক। জ্যোৎস্না-রাত্রি ও বসন্তবাতাস—নিসর্গের এই বিশ্রুতির বর্ণনায় দুই কবির সাযুজ্য স্বয়ম্প্রকাশিত :

তৃতীয়া চাঁদের 'শাম্পানে' চড়ি' চলিছে আকাশ-প্রিয়া
আকাশ-দরিয়া উতলা হ'ল গো পুতলায় বুকে নিয়া
তৃতীয়া 'চাঁদের' বাকী 'তের কলা' আবছা কালোতে আঁকা,
নীলিম প্রিয়ার নীলা 'গুলরুখ' অব-গুণ্ঠনে ঢাকা।
সপ্তর্ষির তারা-পালঙ্কে ঘুমায় আকাশ-রাণী
সেহেলী লায়লি দিয়ে গেছে চুপে কুহেলী মশারি টানি'।
দিকচক্রের ছায়া-ঘন ঐ সবুজ তরুর সারি,
নীহার নেটের কুয়াশা-মশারী—ওকি বর্ডার তারি?
সাতাশ তারার ফুল-তোড়া হাতে আকাশ নিশুতি রাতে
গোপনে আসিয়া তারা-পালঙ্কে শুইল প্রিয়ার সাথে।
[চাঁদনীরাতে, সিন্ধুহিন্দোল : নজরুল]

কাহার পরশে পলাশ-বধূর আঁখির কেশরগুলি
মুদে' মুদে' আসে,—আর বার করে কুঁদে কুঁদে কোলাকুলি।
পাতার বাজারে বাজে হুল্লোড় —পায়েলার রুণ রুণ,
কিশলয়দের ডাঁশা পেষে কে গো—চোখ করে ঘুম ঘুম।
এসেছে দখিনা—ক্ষীরের মাঝারে লুকায়ে কোন এক হীরের ছুরি।

তার লাগি তবু ক্ষ্যাপা শালিখ, তমাল বকুলে হুড়াহুড়ি।
আমের কুঁড়িতে বাউল বোলতা খুনসুড়ি দিয়ে খসে যায়,
অঘ্রাণে যার ঘ্রাণ পেয়েছিল, পেয়েছিল যারে 'পোষলা'য়.
সাতাশে মাঘের বাতাসে তাহার দর বেড়ে গেছে দশগুণ,—
নিছক হাওয়ায় ঝরিয়া পড়িছে আজ মউলের কস' গুণ।
[দক্ষিণা, ঝ. পা. : জীবনানন্দ]

—জীবনানন্দের উপর নজরুলের প্রভাব পড়েছে এই যুগল ধারায় : একদিকে সন্দীপনমূলক কবিতায় ; অপরদিকে রোম্যান্টিক উন্মীলনে। রোম্যান্টিক উন্মীলনের একটি শাখা চ'লে গেছে ইতিহাস-ভূগোল বিহারে। রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-চর্চিত কবিতার দৈশিক বাংলা বাতাস (কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, জসীম উদ্দীন, বন্দে আলী মিয়া প্রমুখ অসংখ্য কবি) থেকে সত্যেন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-নজরুল বাংলা কবিতার আবহমন্ডলকে স্থাপন করেন দূরাঞ্চলে। লক্ষণীয় যে কবিতার পটদেশ যাঁরা পরিবর্তন করেছিলেন, তাঁরা নূতন বাংলা কবিতার জনক। সেই মুহূর্তেই বাংলা কবিতা দাবি করেছিলো এই পটপরিবর্তন—অন্তরের দাবি ছিলো তার বহিরাঞ্চলের যাবার। সত্যেন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-নজরুল—এঁরা কেউই অবশ্য মুখ ফিরিয়ে থাকেননি বাংলাদেশের প্রতি, বরং এঁদের কাব্যের অধিকাংশ শিকড় বাংলা মাটিতে প্রোথিত, কিন্তু একাংশ বৈদেশি ইতিহাসভূমি ভূগোলভূমির উপর।[৭] উত্তরকালে জীবনানন্দ দাশ ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের মধ্যে এই ইতিহাস-ভূগোল বিহার নূতন ভাবে ও উদ্যমে কাজ করেছে। সত্যেন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-নজরুলের মধ্যপ্রাচীকেন্দ্রিকতা তথা মুসলিম ইতিহাসপুরাণ-বৃত্তকে এঁরা আরো ব্যাপক বলয়ে নিয়ে যান।

খ. নহ মা ঘৃণ্য, কৃপার পাত্র,
আজ যে বুঝেছি খাঁটি—
মায়ের পূজায় কেন লাগে তোর
চরণে দলিত মাটি।

[বারনারী, মরীচিকা : যতীন্দ্রনাথ]

[৭] দ্রষ্টব্য নজরুলের 'কামাল পাশা', 'আনোয়ার' (অগ্নিবীণা), 'খালেদ', 'চিরঞ্জীব জগলুল', 'আমানুল্লাহ', 'উমর ফারুক' (জিঞ্জীর) ; মোহিতলালের নাদিরশাহের জাগরণ', 'নাদিরশাহের শেষ', 'ইরানী', 'শেষ-শয্যায় নূরজাহান', 'বেদুইন'' (স্বপনসারী), 'নূরজাহান ও জাহাঙ্গীর' (বিস্মরণ) ; সত্যেন্দ্রনাথের 'মমতাজ', 'মর্মর হস্ত' (বেণু ও বীণা) 'কবর-ই-নূরজাহান' প্রভৃতি কবিতা।

ইতিহাসযান হ'য়ে ওঠে জীবনানন্দের কেন্দ্রাকর্ষ, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভূগোল-ভূমি।[৮] "ঝরা পালক"-এর কবিতাগুচ্ছে সাধারণভাবে দূরতৃষ্ণা ধ্বনিত ; বিশেষভাবে স্মরণীয় কএকটি কবিতা : 'বেদিয়া', 'সাগর-বলাকা', 'নাবিক', 'চলছি উধাও,' 'একদিন খুঁজেছিনু যারে,' 'অস্তচাঁদে,' 'পিরামিড,' 'চাঁদিনীতে,' 'মিশর,' 'মরুবালু' প্রভৃতি কবিতা।

জীবনানন্দের উত্তর-কাব্যেও এই ইতিহাস-ভূগোল ভ্রমণ শমিত হ'য়ে যায়নি ; বরং নতুন আয়তন সৃষ্টি করেছে "ধূসর পাণ্ডুলিপি" ও "বনলতা সেন" কাব্যগ্রন্থদ্বয়ে। "ঝরা পালক"-এ অবশ্য নজরুল-মোহিতলাল সত্যেন্দ্রনাথের ইতিহাসোত্থ কবিতার সঙ্গে জীবনানন্দের কবিতার ইতিহাস-ভূগোলের স্বপ্নকল্পনা-পাশ পৃথকতা রচনা করেছিলো। এ-কথা বিস্মৃত হ'লে চলবে না যে ইতিমধ্যে "রূপসী বাংলা"র সনেট-পরম্পরায় জীবনানন্দ দৈশিক দেনা চুকিয়ে দিয়েছিলেন। অতঃপর জীবনানন্দের কবিতা থেকে ঐতিহাসিক খ্যাতনামাদের ও বিখ্যাত স্থানগুলির একটি চয়নিকা তৈরি করা যাক।

ঐতিহাসিক খ্যাতনামাগণ :

দেশবন্ধু, বিবেকানন্দ, শাক্য, আকবর, সেলিম, সাজাহাঁ, ইয়োসোফ (ঝরা পালক) ; বিম্বিসার, অশোক, মহেন্দ্র (বনলতা সেন) ; মৈত্রেয়ী, আত্তিলা, নচিকেতা, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, কুইসলিং, হিটলার, গগাঁ, জরাথুস্ট্র, লাওৎ-সে, এঞ্জেলো, রুশো, লেনিন, এম্পিডোক্লেস (সাতটি তারার তিমির)।

[৮] স্মরণীয় জীবনানন্দ ও প্রেমেন্দ্রের আত্মজ্ঞাপক দুটি কবিতাংশ :

ক. সে যেন দেখেছে মোরে জন্মে-জন্মে ফিরে-ফিরে-ফিরে
মাঠে ঘাটে একা-একা,—বুনো হাঁস—জোনাকীর ভিড়ে।
দুশ্চর দেউলে কোন্—কোন্ যক্ষ-প্রাসাদের তটে,
দূর উর—ব্যাবিলোন—মিশরের মরুভূ-সঙ্কটে,
কোথা পিরামিড তলে—ঈসিসের বেদিকার মূলে,
কেউটের মত নীলা যেইখানে ফণা তুলে উঠিয়াছে ফুলে'
কোন মন-ভুল্যানিয়া পথ-চাওয়া দুলালীর সনে
আমারে দেখেছে জ্যোৎস্না—চোর চোখে—অলস নয়নে।
[অস্তচাঁদে, ঝ. পা. : জীবনানন্দ]

ভৌগোলিক স্থানগুলি :

মিশর, ব্যাবিলন, উর, এশিরিয়া, স্পেন, ইন্দনুস্ন, উজ্জয়িনী, মথুরা, বৃন্দাবন, পাটলীপুত্র, শ্রাবস্তী, কাশী, কোশল, ভারত, এশিয়া, তক্ষশীলা, অজন্তা, নালন্দা, দিল্লী, লাহোর, গ্রীস, ফতেহপুর, কার্থেজ, রোম (ঝরা পালক) ; সিংহল, মালয়, বিদর্ভ, নাটোর, বিদিশা, শ্রাবস্তী, বেবিলন, দ্বারকা, এশিরিয়া, মিশর, ইউরোপ, গ্রীস, কলকাতা (বনলতা সেন) ; মালাবার, ভারত, চীন, আফ্রিকা, মিশর, ব্যাবিলন (মহাপৃথিবী) ; মালয়, কুয়ালালাম্পুর, জাভা, সুমাত্রা, ইন্দোচীন, বালি, হঙকঙ, সাংহাই, বেবিলন, নিনেভ, মিশর, চীন, উর, বৈশালী, আলেকজান্দ্রিয়া, লিবিয়া, হনলুলু, ম্যানিলা, হাওয়াই, গ্রীস, টাহিটি, বোর্নিও, আলাস্কা, জুহু, হিরেনা, টোকিও, রোম, মিউনিখ, মিশর, চীন, ইউরোপ, এশিয়া, লন্ডন, দিল্লী, কলকাতা (সাতটি তারার তিমির)।

নজরুল (ও সত্যেন্দ্রনাথ-মোহিতলাল)-প্রভাবিত হ'য়ে, এবং বৈদেশিক আবহ নির্মাণের প্রয়োজনে জীবনানন্দ তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থে অনেক আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেন। পরে এরকম অজস্রতায় আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেননি তিনি আর, তাঁর কবিতার আবহও অন্য লোকে প্রস্থান করেছিলো। কিন্তু জীবনানন্দে ছিলো প্রাকৃত শব্দ ব্যবহারের একটি ঝোঁক, এবং বাঙালির মৌখিক ভাষায় যেহেতু অনেক আরবি-ফারসি শব্দ মিশে গেছে, অতএব প্রাকৃত বাকব্যবহার করতে গিয়ে কিছু আরব্য-পারশ্য শব্দ স্থান ক'রে নিয়েছে তাঁর কবিতাধারে। **"ঝরা পালক" থেকে কবির আরবি-ফারসি** শব্দ নির্মাণের একটি সংক্ষিপ্ততা :

দরিয়া, দিওয়ানা, জিঞ্জির, খেয়াল, খোশ, আখের, রেওয়াজ, পশমিনা, তালাস, সোয়ার, দিলদার, খুন, খারাবী, দরাজ, বেহুঁশ, দিলওয়ার, মেজাজ, দস্তানা, বান্দা, রোশনাই, খুশরোজী, মুসাফের, রোজা,

খ. সেই সব হারানো পথ আমাকে টানে ;—
কেরমানের নোনা মরুর ওপর দিয়ে,
খোরাশান থেকে বাদক্ শান,
পামিরের তুষার-পৃষ্ঠ ডিঙিয়ে, ইয়ারকন্দ থেকে খোটান।
চমরীর ক্ষুরে লেগেছে বরফ-গলা কাদা।

[পথ, সম্রাট : প্রেমেন্দ্র মিত্র]

ঈদ, মসগুল, তাবিজ, মশলাদার, মুসল্লা, একশা, মেহেরাব, শফর [৯], গজল-ইলাহী, দরদ, শের, শরাব, আসর, মোতিয়া, পানসী, জর্দা, আঙিয়া, পেয়ালা, কলেজা।

প্রথম পর্যায়ে কবির উপর নজরুলের কবিতার আরো বহু কুশলতা কাজ ক'রে গেছে। যেমন, মধ্যমিল :

১. এস দক্ষিণা,—কাননের বীণা——বনানী পথের বেণু!
২. আজ দখিনার ফর্দা হাওয়ায় পর্দা মানে না মানা!
৩. মন্দে মন্দে আসে,—আর বার করে কুঁদে কুঁদে কোলাকুলি
৪. এসেছে দখিনা—ক্ষীরের মাঝারে লুকায়ে কোন এক হীরের ছুরি!
৫. এসেছে নাগর যামিনীর আজ জাগর রঙীন আঁখি!
৬. আমি দক্ষিণা দুলালীর বীণা—পউষপরশ হারা
৭. আমি গো লালিমা,—গোধূলির সীমা—বাতাসের লালা ফুল
৮. হয়তো সেদিন আপেলের ফুল কেঁপেছে আকুল হাওয়ার সনে
৯. হয়তো সেদিনও ডেকেছে পাপিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া সরোর শাখে
১০. হয়তো সেদিনও পাড়ার নাগরী ফিরেছে এমনি গাগরী কাঁখে

অনুপ্রাস :

১. কণ্ঠ-বাজের আওয়াজ তাদের বেজেছে স্তব্ধ নভে।
[জীবন মরণ দুয়ারে আমার]
২. ঘুম-কুমারীর মুখে চুমো খায় যখন আকাশ।
[অস্তচাঁদে]
৩. নীলার ঘোলা জলের দোলায় লাফায় কালো সাপ।
[মিশর]
৪. চাঁদের আলোয় চাঁদমারী জুড়ে,—সবুজ চরায় সবজী ক্ষেতে।
[চাঁদিনীতে]
৫. শিশির-শীর্ণা বালার কপোলে কুহেলির কালো জাল।
[দক্ষিণা]

[৯] বহুপরবর্তী একটি কবিতায় 'শফর' শব্দটি দ্রষ্টব্য :
পর্বতের পথে-পথে রৌদ্রে রক্তে অক্লান্ত শফরে
খচ্চরের পিঠে কারা চড়ে?

যৌগিক শব্দ :

দাদুরী-কাঁদানো [১০], শাঙন-দরিয়া, স্বপ্ন-ময়ূর, মানব-দেব, দাব-মরুভূমি, জোছনা-রাঙা, ছলা-মরীচিকা, মরণ-সাহারা, কেউটে-ঢেউ, অতীত-আখের, ফেনা-সই, জলধি-পাখী, জল-বেদিয়া, ঊর্মি-নাগবালা, ছায়া-বৌ, বাদল-বৌ, হৃদয়-মাস্তুল, আকাশ-মরু, জীবন-বীণা, আকাশ-শুঁড়িখানা, আগুন-ছাড়, নাসপাতি-গাল, কপোত-ব্যথা, মেঘ-বৌ[১১], পৌষ-নীরবতা, শকুন-বধূ, ঘুম-কুমারী, ময়ূর-নীলিমা, কামনা-সাহারা, হিমানী-পাথর, করাত-দাঁত, নীহার-নীল, প্রেত-প্রাণ, চাঁদিনী-শরাব [১২], শিশির-শীর্ণ, আকাশ-শিথান, সৃষ্টি-বধূ, প্রেত-জ্যোৎস্না, ভ্রূণ-ভ্রষ্ট গরল-মদির মায়া-ভুজঙ্গিনী, নভো-নীল, বীর-শের[১৩], সাগর-শকুন্ত, সিন্ধু-বেদুঈন, দিল-পিয়ালা[১৪], স্বপন-ফানুষ, রাত্রি-কুমারিকা, আঁধার-সাগর, আঁধার-সাহারা, নিশি-মরু, প্রেম-খঞ্জর, করুণা-প্রদীপ, চিতা-ফণা, বিধবা-নয়ন, অশ্রু-অমানিশা, মশলা-দরাজ, নটকান-রাঙা, খুন-রোশনাই, সাগর-বলাকা, প্রেত-চাঁদ, কপাল-কবর, মুসাফের-হিয়া[১৫], রবাব [১৬], দূর-সোহাগী, ঘর-বিবাগী।

উক্ত উদাহরণসমুচ্চয় "ঝরা পালক" থেকে আহৃত। নজরুলের এই-সব কুশলতা—আরবি-ফারসি শব্দনির্মাণ, মধ্যমিল, অনুপ্রাস, যৌগিক শব্দ —জীবনানন্দের উত্তরকালিক কবিতায় ক'মে এসেছে, তাঁর নিজেকে খুঁজে

[১০] তুলনীয় নজরুল : 'কপোত-কাঁদানো'।

[১১] জীবনানন্দের কোনো-কোনো যৌগিক শব্দে যে-নারীত্ব ও শারীরিকতা সূচিত (মেঘ-বৌ, ছায়া-বৌ, বাদল-বৌ, ফেনা-সই, ঊর্মি-নাগবালা, সৃষ্টি-বধূ, শকুন-বধূ, ঘুম-কুমারী, নাসপাতি-গাল, বিধবা-নয়ন ইত্যাদি), তা নজরুলের অনুরূপ চেনা শব্দমিশ্রণ স্মরণ করিয়ে দ্যায় (তমাল-চোখ, বিরহী-আঁখি, আঁখি-পাখি, কমল-পা, অধর-আঙুর, হেম-কপোল, গোলাপ-কপোল, গোলাপ-গাল ইত্যাদি)।

[১২] তুলনীয় নজরুল : 'চাঁদিনী-শিরাজী'।

[১৩] তুলনীয় নজরুল : 'শের-নর'।

[১৪] তুলনীয় নজরুল : 'হৃদয়-পেয়ালা'।

[১৫] জীবনানন্দের কোনো-কোনো যৌগিক শব্দ বাংলা ও আরবি-ফারসি শব্দ যোগে সিদ্ধ (চাঁদনী-শরাব, দিল-পিয়ালা, বীর-শের, মুসাফের-হিয়া ইত্যাদি), অনুরূপ শব্দসৃজনে নজরুল দক্ষ (শরম-শাড়ী, শিরাজী-শোনিমা, খুন-খচা, তড়িৎ-তাঞ্জাম, খুন-গৈরিক, আঁসু-পরিমল ইত্যাদি)।

[১৬] তুলনীয় নজরুল : 'জীবন-বাঁশি'।

পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে। কিন্তু এইসব কুশলতা-যে জীবনানন্দে উপকারী হয়েছিলো, আত্মসন্ধানের কাজেই লেগেছিলো, তাতে সন্দেহ নেই ;— বিস্মৃত হ'লে চলবে না যে জীবনানন্দ ও নজরুল দু'জনেই অলংকারঋণিত কবি। ছন্দ বিষয়েও প্রাথমিকভাবে তিনি সহায়তা পেয়েছিলেন নজরুলের কাছ থেকে : "ঝরা পালক" এর 'দেশবন্ধু'[১৭] ও 'বিবেকানন্দ' শীর্ষক প্রশস্তি-কবিতাদ্বয় নজরুলের 'খালেদ', 'উমর ফারুক' প্রভৃতি কবিতার স্মারক—ছন্দে ও বাক্যবন্ধে। নজরুলের প্রাথমিক প্রভাব-যে জীবনানন্দে বহুলভাবে উপকারী ও দূরতাৎপর্যশীলিত হ'য়ে উঠেছে তার প্রমাণ নজরুলের মতো জীবনানন্দও শব্দবাহারে, ইমেজপুঞ্জে, অলংকাররণনে, হয়তো বা আত্মোৎসারী শিথিলতায়ও কবি হ'য়ে রইলেন কাব্যেতিহাসে দুজনই হ'য়ে রইলেন প্রতিমাপ্রধান কবি। অবশ্য এই দুই কবির প্রতিমানির্মাণ-পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা : নজরুল প্রতিমা এনেছিলেন বহিঃপৃথিবী থেকে, জীবনানন্দের চিত্রকল্পে মিশে আছে তাঁর মানসলোকী আবহ ; নজরুলের প্রতিমা কবিপ্রসিদ্ধি থেকে জাত, উপমার সন্নিকটবর্তী, পরিচ্ছন্নভাবে আহরণযোগ্য, জীবনানন্দ রচনা করেছেন চূর্ণ চিত্রকল্প, মিশ্র চিত্রকল্প, আপাতভাবে বিপ্রতীপের সম্মিলন যার স্বাভাবিক, তাই তাঁর কবিতা থেকে সযত্নে মুছে দিয়েছিলেন নজরুলের প্রভাব, অথবা তাঁর কবিতা দারুণ মৌলিক হ'য়ে উঠেছিলো তাঁর আত্মার উচ্চারণ মুদ্রিত ক'রেই। কিন্তু এই প্রভাব সম্পাত ক'রে নজরুল প্রমাণ করেন তিনি 'বিদ্রোহী কবি' নন—তিনি বহুভূমিক কবি।

অন্তর্গত ঐ কৃতজ্ঞতাবশেই কি জীবনানন্দ লিখেছিলেন 'নজরুলের কবিতা' শীর্ষক সন্দর্ভটি ? আলাদাভাবে আর কোনো বাঙালি কবির উপর লিখবার প্রয়োজন বা অবসর ঘটেনি তাঁর ? সত্য, নজরুল সম্বন্ধে স্বতন্ত্র একটি নিবন্ধ রচনা করলেও, সেখানেও নজরুলকে তিনি স্থাপন করেছিলেন তৎসাময়িক পটে ;—সেই হিশেবে লেখাটি খুবই সাময়িক রচনা,

[১৭] দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুতে (১৩৩২ সাল) অজস্র কবিতা উৎসারিত হয়েছিলো বাঙালি কবিদের হাত থেকে। নজরুল লিখেছিলেন একটি সম্পূর্ণ বই "চিত্তনামা" (১. অর্ঘ্য, ২. অকাল-সন্ধ্যা, ৩. সান্ত্বনা, ৪. ইন্দ্র-পতন, ৫. রাজভিখারী) ; মোহিতলাল লিখলেন 'চৌঠা' আষাঢ়' নামে চিত্তরঞ্জন শোকগীতি ; যতীন্দ্রনাথ লিখলেন "মরুশিখা" কাব্যান্তর্গত 'নাই' ও 'শৃঙ্খল-মোচন' কবিতাদ্বয়। দেশবন্ধুর স্মৃতিতে জীবনানন্দ আর একটি কবিতা লেখেন : "রূপসী বাংলা"র 'অশ্বত্থে সন্ধ্যার হাওয়া।'।

যদিচ তা থেকে নজরুল সম্বন্ধে ও সাধারণভাবে কবিতা তথা শিল্প সম্বন্ধে তাঁর একটি ধারণা পরিষ্কার পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখনীয় যে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলাদা কোনো নিবন্ধ জীবনানন্দ রচনা করেননি ; যে-ক'টি রচনায় রবীন্দ্রনাথ মুখ্য আলোচ্য, সেখানে কবি-সার্বভৌমের সঙ্গে পরবর্তীদের সম্বন্ধই মূলত নির্ণীত হয়েছে।

নজরুলের উপর জীবনানন্দের লেখাটি, 'নজরুলের কবিতা' ('কবিতা', নজরুল-সংখ্যা), ১৩৫১ সালে লেখা—মন্বন্তরের, দ্বিতীয় মহাসমরের ছায়া প'ড়ে আছে তখন দেশের উপর ; স্থূল, ব্যর্থ, জাগরণমূলক, উদ্দেশ্যপ্রধান গদ্যকবিতা লেখার যুগ চলছে তখন। ততোদিনে নজরুল অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন (১৩৪৯-এর দিকে), 'নজরুল ইসলাম অনেক দিন থেকে কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছেন', একথা তাই সত্য। 'জনগণ, ভদ্রসাধারণ এখনও ম'রে বেঁচে আছে ; আসছে সার্বিক মৃত্যু এদের জন্যে—এবং তার ভিতর থেকে আরও একবার বেঁচে উঠবার অধ্যায়—জীবনকে নতুন করে প্রতিপালন করবার প্রয়োজনে।' এই উক্তির পটভূমিকায় কবির তৎসময়ে রচিত একটি অগ্রন্থিত কবিতা স্মরণ করা যেতে পারে :

এই শতাব্দী-সন্ধিতে মৃত্যু

(অগণন সাধারণের)

সে এক বিচ্ছিন্ন দিনে আমাদের জন্ম হয়েছিল
ততোধিক অসুস্থ সময়ে
আমাদের মৃত্যু হয়ে যায়।
দূরে কাছে শাদা উঁচু দেওয়ালের ছায়া দেখে ভয়ে
মনে করে গেছি তাকে—ভালোভাবে মনে করে নিলে—
এইখানে জ্ঞান হতে বেদনার শুরু ;--
অথবা জ্ঞানের থেকে ছুটি নিয়ে সান্ত্বনার হিম হ্রদে
একাকী লুকালে
নির্জন স্ফটিকস্তম্ভ খুলে ফেলে মানুষের অভিভূত উরু
ভেঙে যাবে কোনো এক রম্য যোদ্ধা এসে।
নরকেও মৃত্যু নেই—প্রীতি নেই স্বর্গের ভিতরে ;
মর্তে সেই স্বর্গ-নরকের প্রতি সৎ অবিশ্বাস
নিস্তেজ প্রতীতি নিয়ে মনীষীর প্রচারিত করে।

['পরিক্রমা', শারদীয়া সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৫০]

কবির এ কথাও সত্য যে 'এখনকার বাংলা কবিতায় এই দুটি স্বভাবই লক্ষিত হয়' : তার একটি 'অত্যন্ত স্থূল' 'নিশান হাতে অগ্রসর হয়েছে' : অপরটি 'একান্তভাবে ভাবনানিষ্ঠ', 'তনু সূক্ষ্ম'। 'এই দুই প্রকৃতির মিশ্রণে ভালো কবিতাও' রচিত হয়েছে ;—এবং 'এই শতাব্দী-সন্ধিতে মৃত্যু' তার অন্যতম। নজরুলের কবিতাকে জীবনানন্দ একটি বিশেষ সময়-পর্বের ফল ব'লে মনে করেছেন ; কিন্তু অভিযোগ করেছেন তিনি নজরুলের ছিলো না 'মননপ্রতিভা ও অনুশীলিত সুস্থিরতা'। ফলে 'তাঁর কবিতা চমৎকার কিন্তু মানোত্তীর্ণ নয়।' তাহ'লেও, জীবনানন্দের বিবেচনায় নজরুলের কোনো-কোনো কবিতা 'সফল' ও 'সার্থক' হয়েছিলো, এবং নজরুল ভিড়ের হৃদয় স্পর্শ করেছিলেন—যা তাঁর (জীবনানন্দের) সময়ের কবিতা পারছে না। 'আধুনিক অনেক কবিতা থেকে তাঁর কোনো-কোনো কবিতার অঙ্গীকার···বেশী, ধ্বনিময়তাও উৎকর্ণ না করে এমন নয়। কিন্তু নিজেকে বিশোধিত করে নেবার প্রতিভা নেই এ-সব কবিতার বিধানে, শেষ রক্ষার কোন বিধান নেই।'—নজরুল সম্বন্ধে জীবনানন্দের এই উক্তি আমাদের সরলমনা সমালোচকদের বিভ্রান্ত করতে পারে ; সেই আশংকায় এখানে শুধু এটুকু স্মরণ করতে বলি : নজরুল ও জীবনানন্দ, দুই কবি, দুই কালের দুই কবি, দুই আলাদা পথে সত্যের সন্ধান করেছিলেন ; এবং যে-কবির প্রভাব তাঁর কাব্যচর্চার উন্মেষকালে সবচেয়ে গভীরভাবে পড়েছিলো, এ উক্তি তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞতার নিদর্শন নয়—এ হচ্ছে কবি জীবনানন্দ দাশের স্বতন্ত্র যাত্রাপথের ইশারাবাহী আত্মোচ্চারণ ॥

[১৯৭৩-৭৫]

কল্পনার তিন কণ্ঠ

'কবিতা ও জীবন একই জিনিসের দুইরকম উৎসারণ।'

১

বিশ্বশিল্পসাহিত্য স্থূলতা থেকে ক্রমশ সূক্ষ্মতার প্রতি ক্রমঅগ্রসরমান। স্বর্গমর্ত্যপাতালপরিধি ছোটো হ'য়ে এসে ক্রমশ মানবজ্ঞাত এই গ্রন্থটির উপরে স্থাপিত ; আতত সমাজ ছেড়ে শিল্পদৃষ্টি যোজিত হচ্ছে ব্যক্তির দিকে ; বিন্দুর ভিতরে ঝিলমিলিয়ে উঠছে সিন্ধু ; মহাকাব্য সংরচনার দরকার নেই আর, শুদ্ধ লীরিকও মানসতার একটি অংশমাত্র দাবি ক'রে বসে—এমন-সব অংশ যেখানে বিজ্ঞান যেতে পারছে না। মননজীব বিজ্ঞান-দর্শনের বদলে যাচ্ছে হৃদয়জীব শিল্পসাহিত্য : ঢুকে পড়ছে অংক ও স্বপ্নের ভিতরে। অবশ্য শিল্পসাহিত্যে বিজ্ঞান-দর্শনের চেয়ে ব্যক্তির ভূমিকা প্রথমাবধি প্রধান ; বিজ্ঞান বা দর্শনে চিরকালই বিষয় প্রধান, শিল্প-সাহিত্যে বিষয়ী জরুরি। বিজ্ঞান বা দর্শনও নির্ভর করছে ব্যক্তিপ্রতিভার উপর—কিন্তু তাদের বিষয় বা প্রসঙ্গটি যে-কোনো একজনের আক্রমণের মুখাপেক্ষী, কিন্তু শিল্প-সাহিত্যে কোনো-একটি বিষয় বড়ো নয় বরং বিষয়ী বড়ো ব'লে তা সম্পূর্ণত ব্যক্তিপ্রতিভার উপর ভর রেখে আছে। দেশলাই বা প্রয়োগবাদ কোনো-একজন বিজ্ঞানিক বা দার্শনিক নির্মাণ বা আবিষ্কার না-করলে সম্ভবত অপর-কেউ করতেন ; কিন্তু "মোনালিসা" বা "ভিতা নুভা" বিশেষ একজন চিত্রী বা কবি সৃজন না-করলে আর-কেউ করতেন না—তা সুনিশ্চিত।

তত্রাচ এ-কথা অসত্য নয় : প্রাচীন ও মধ্যযুগে পৃথিবীর শিল্পসাহিত্যে মুখ্য ছিলো বহিঃপৃথিবী ও সমাজশরীর। ধর্ম ব্যক্তিকে নিজের ভিতরে আকর্ষণ ক'রে রেখেছিলো, সমাজ ব্যক্তিকে তার চাঁদোয়ার নিচে সংঘবদ্ধ ক'রে রেখেছিলো। বস্তুত শিল্প চিরকালই ভিতরজগতকে স্পর্শ করতে

চেয়েছে বটে, কিন্তু ব্যক্তির পূর্ণ মূল্যায়ন ও স্বয়ম্প্রকাশ যতো দিনে সম্ভব হয়নি ততোদিন ঐ আন্তর ভুবনও হ'য়ে ওঠেনি স্বাধীন বিহারের বিতত ভূমি। ক্রমশ ব্যক্তিক দৃষ্টি তথা প্রাতিস্বিকতা দখল ক'রে নিলো সমগ্র শিল্পপরিসর। পরিবর্তমান উপর্যুক্ত মুহূর্তটি প্রাতিষ্ঠানিক ধ্রুপদ থেকে খেয়ালি রোম্যান্টিকতায় স'রে আসার ক্ষণলগ্নও বটে। অথবা : ঘুরিয়ে বলা যায় : রোম্যান্টিকতা মূলত ব্যক্তির উপপ্লব এবং বিজয়। এখানেই হর্বর্ট রীড্-এর "শর্বলিত কোর্ট" গ্রন্থের 'বাস্তবতা ও পরাবাস্তবতা' নামক প্রবন্ধের অনুসরণে কএকটি কথা ধ'রে রাখি :

> রিয়ালিস্ট্ আর্ট বহিঃপৃথিবীর সত্য ও বাস্তব জিনিশকে অবিকল ধ'রে দ্যায়—যেমন ফুল, জন্তু ও মানবকে ; সুপার-রিয়ালিস্ট্ আর্ট মনের ভিতরে কল্পিত বা রক্ষিত জিনিশ তুলে ধরে—যেমন চিত্রকল্প, ভূত বা অপচ্ছায়া বা বিভ্রম ও স্বপ্নকে। উনবিংশ শতকের শিল্প প্রাকৃত-বাদী বাস্তবপন্থার ধারায় রচিত, চোখে-দেখা প্রতিরূপ গ'ড়ে তোলাই লক্ষ্য ছিলো তখন শিল্পীর। অবশ্য গিয়োতো, মিকেলেন্জেলো, রেমব্রান্ট, রুবেন্স্, এল্ গ্রেকো প্রমুখ মহান মহীরুহগুলি সর্বদাই খানিকটা স্বাধীনভাবে একটি ভাব বা দৃষ্টিকোণ ফুটিয়ে তুলেছেন, বস্তুর অবিকল প্রতিরূপ অঙ্কনেই অবিরলভাবে অভিভূত থাকেননি। তৎসত্ত্বেও তাঁদের মূলসূত্র যুক্তিবাদেই মোটামুটি চালিত, যেমন যতোই কল্পিত হোক-না তাঁদের আঁকা মানুষ মানুষই বটে, গাছ গাছ ;—কিন্তু আধুনিক শিল্পে আমরা বুঝতে পারি না—গাছ বা মানুষ কার দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করছি। আসলে শিল্পের কোনো সীমা নেই। 'কল্পিত' যে-কোনো কিছু 'প্রকাশিত' হ'লেই শিল্প তৈরি হ'তে পারে। যেমন সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের পোশাক, খাদ্য ও নৈতিকতা বদলাচ্ছে তেম্নি বদলাচ্ছে শিল্পকলাও ; আবার পোশাক খাদ্য ও নৈতিকতায় যেমন কিছু লোক প্রাক্তনকে আঁকড়ে আছেন, তেম্নি শিল্পের বেলায়ও। গার্হস্থ্য আশবাবের সঙ্গে মানসিক আশবাবও পাল্টায়। এল গ্রেকো বা রেমব্রান্ট কিছুটা যুক্তিবাদ রেখেই দিয়ে ছিলেন। তারপর তাঁদের আধ্যাত্মিক বা কাব্যিক জগত সেকালের শিক্ষিতের মন থেকে খুব ব্যবহিত ছিলো না। মরমী বা কবিতলোক ফোটাতে গিয়ে কিছু রেডিমেড উপকরণ ব্যবহার করেছেন তাঁরা : দেব-দেবী, পরি ও বনদেবতা, কিংবদন্তী ও অতিকথা। পরাবাস্তবীদের কাছে ও-রকম রেডিমেড উপকরণ কিছু ছিলো না, ছিলো না অমন সব

চিত্রল শারাদ। এই ক্রমাগত বর্বরতার দিনে আদিমতায় ফিরে গিয়েছিলো শিল্প তাঁদের। বা, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে-আদিম মানুষটি আছে তার নিরঙ্কুশ প্রকাশ ঐ পরাবাস্তব শিল্পে। যেমন এই বস্তুজগত বারংবার আবিষ্কৃত হয়েছে বিজ্ঞানিদের দ্বারা, তেম্নি কবি ও চিত্রীর দল মানসজগতকে আবিষ্কার করতে চাইলেন। শিল্পকলা ওষুধের মাত্রার মতো আমাদের স্বাস্থ্যের জোগান দ্যায়। বাস্তব জগতের মতোই স্বপ্ন ও ইচ্ছায় ভরপুর আমাদের মনোপৃথিবীও অত্যন্ত জরুরি। এবং সেই স্বপ্ন ও বাসনায় ভরন্ত মনোপৃথিবীতে প্রবেশের জন্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা দরকার ;—এই জগত থেকে জাত কবিতা ও ছবি স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে হয় না, কিন্তু ঐ ছবি ও কবিতা মানুষের যা সর্বাধিক রহস্যময় সেই মনোলোকে খানিকটা আলো ফ্যালে। আমাদের প্রতিদিনের স্থূলহস্তাবলেপে ধূলিমলিন সৌন্দর্যকে আমরা এইভাবে এই দিক থেকে ফিরে পেতে পারি।

[বাস্তবতা ও পরাবাস্তবতা, শবলিত কোট : হর্বর্ট রিড্]

সপ্তদশ শতাব্দীর রেমব্রান্ট প্রথম আত্মার গোপন থেকে শিল্পের প্রসঙ্গ নির্বাচন ক'রে নিয়েছিলেন। রোম্যান্টিকেরাও এই কৃতিত্বের অংশী, যদিচ রোম্যান্টিকতার অগ্রদূত রেমব্রান্ট-এর কাছে তাঁরা ঋণী। বস্তুত মরমীরাও প্রাতিস্বিকতার পূর্বচারী, কিন্তু তাঁরা আপনাপন ধ্যানের ভিতর দিয়ে পেতেন তাঁদের আরাধ্যকে—তা অপরদের মধ্যে সেতু সংরচন করে না। অপিচ, রেমব্রান্ট যেন প্রতিটি জিনিশ নিয়ে দ্বিতীয় ভাবনা ভেবেছেন, অভিজ্ঞানের অঙ্গুরী পরিয়ে দিয়েছেন প্রতিটি অচেনার হাতে, সব-কিছু অনুবাদ ক'রে নিয়েছেন নিজের ভাষায়। তাঁর জীবনের সর্ব বয়সে অঙ্কিত আত্মপ্রতিকৃতিসমুচয়ে আপন আত্মিক বেদনাময় রেখামালা উদ্ঘাটন ক'রে চলেছিলেন তিনি, নিজের নিঃসঙ্গতার মধ্য দিয়ে তিনি প্রবেশ করেছিলেন ক্রমশ রহস্যময়তা ও অতিপ্রাকৃতের বিজন অন্তঃপুরে।

উপর্যুক্ত ব্যক্তিতার দীপ্ততম প্রথম কবচটি ধারণ করেছিলেন, যাঁকে রাজনৈতিক-দার্শনিক রূপে চিহ্নিত করা যায়, সেই জাঁ জাক রুশো (১৭১২—১৭৭৮), যখন তিনি বাতাসে এই নিনাদ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন : 'আমি আর কারো মতো নই...আমি আলাদা।' রোম্যান্টিকতার অন্তঃশায়ী প্রাতিস্বিকতার পদপাত মুদ্রিত হ'তে থাকলো ইংল্যান্ড, জর্মানি ও ফ্রান্স-এ ;—ক্রমশ আমেরিকা ও রাশিয়া থেকে দূরতম বাংলাদেশের বাতাস পর্যন্ত ধ্বনিত হ'য়ে উঠলো এক নূতন দ্রোহ—এক অজর গান—এক অমর বিভূতি। ধ্রুপদী

য়োহান উলফগাঙ্গ ফন গ্যেটে-র ভিতর দেদীপ্য হ'য়ে উঠলো রোম্যান্টিকতার শিখা। উইলিঅম ব্লেক, ওয়ার্ডস্বার্থ ও বায়রন ; লামারতিন ও ভিক্তর উগো ; এডগার এ্যালান পো ; আলেকজান্ডার পুশকিন ; বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথ। রুশো-র স্বীকারোক্তি, ওআর্ডস্বার্থ ও কোলরিজ-এর গীতল বালাদমালা, লামারতিন-এর ধ্যানের কবিতা।

ব্যক্তির এই উপপ্লবে প্রাক্তন পৃথিবীর যুক্তির শিকল ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গেলো, ধ্রুপদ ও নব্য-ধ্রুপদ হ'য়ে উঠলো ফোঁপরা, বিজ্ঞান বিচূর্ণ হ'য়ে বেরিয়ে এলো যুক্তিহীন, ইউক্লিড-এর সাধ্বী জ্যামিতি ব্রাক্ পিকাসো-র দুঃস্বপ্নিল জ্যামিতিতে পর্যবসিত হ'য়ে গেলো। মলিএর বা সুইফট তাঁদের রচিত কীর্তির উপরে আমাদের অভিনিবেশ দাবি করতেন ; কিন্তু মুস্যে বা ওআর্ডস্বার্থ তাঁদের নিজেদের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। নিজের ভিতরকার বিভূতি তথা অনির্বচন অন্তর্দৃষ্টি ছেঁকে আনতে হবে : উনবিংশ শতাব্দীর চিত্রী দ্যলাক্রোআ ও কবি বোদলেআর আমাদের এই সত্য উপহার দিয়েছেন। সমস্ত আধুনিক কবি-শিল্পী এই অস্তিতার অধীনতা স্বীকার করেছেন। এই পৃথিবীতেই মারসেল প্রুস্ত দেখলেন : এক-একটি চোখের মনের মধ্যে বিরাজিত কোটি চরাচর। মুস্যে জানালেন : মানুষ কি নির্জন আর অচেনা। এডগার এ্যালান পো বললেন : শৈশবসময় থেকে আমি আর-কারো মতো নই। দ্যলাক্রোআ-র বাণী : তাকাবে নিজের চারপাশে নয়—ভিতরে। কার্ল জ্যাসপার্স-এর ঘোষণা : বিজনতাই অস্তিত্বের বিবরের প্রবেশপথ। সমস্ত মিলে গ'ড়ে উঠলো এক নবীন প্রাতিস্বিকতার কান্তি-বিদ্যা। একালের সমস্ত শৈল্পিক (এবং অ-শৈল্পিক তথা জীবনময়) আন্দোলন ও মতপন্থার অনিবারণ ধারক এই ব্যক্তিকতা, প্রাতিস্বিকতা, অস্তিতার আত্মজয়যাত্রা : রোম্যান্টিকতা, প্রকৃতিপন্থা, ইমেজিজম, ইম-প্রেশনিজম, প্রকাশবাদ, পরাবাস্তবপন্থা, অস্তিত্বপন্থা—প্রভৃতি সমস্ত মতপন্থা ঐ ব্যাপ্ত নীলিমার নিচে তাঁবু খাটিয়েছে।

এখানে বাংলা সাহিত্যেতিহাসের একটি প্রাতিস্বিক পরিলেখ প্রয়ো-জনীয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে কবি নিজের পরিচয় পূর্বাহ্নে দাখিল ক'রে নিতেন ; কিন্তু কাব্যবিষয়ের সঙ্গে তার যোগ ছিলো প্রত্যক্ষত অতিব্যবহিত। বৈষ্ণব কবিতায় কবি স্থিত থাকতেন এক-একটি রচনার শেষাংশে ; যদিচ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্গতভাবেই তাঁর একটি কবিতায় এই সন্দেহ উত্থাপন করেছেন যে রাধাকৃষ্ণের রূপকে আসলে ঐ কবিগণ আপনপন দয়িতা ও প্রেমার্তিকেই প্রতিষ্ঠিত ক'রে গিয়েছেন : তত্রাচ একজন

কবি ও তাঁর কাব্যপ্রসঙ্গে ব্যবধি তখনো বিপুল। আধুনিককালে এসে ঐ সমবায়ী সমর্পণের দরকার হ'লো না আর, আত্মগোপনই হ'য়ে দাঁড়ালো অপ্রাসঙ্গিক : বিহারীলাল বা মধুসূদন নিজেদের উপস্থিত করেছেন তাঁদের কবিতাবলয়ে। সারা জীবন অজস্র সমাজ-প্রসঙ্গে লগ্ন ও পরিকীর্ণ থেকেও অন্তর্জীবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহসা আপন আত্মাকে মহা-একা ব'লে শনাক্ত ক'রে গেছেন। আর নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী, যা দিয়ে তাঁর সাহিত্যভুবনে প্রবেশ, সে সমাজ-বিদ্রোহের নয়—কবির অতিবেল অস্মিতারই এক প্রদীপিত বাণীরূপ। এমনকি অদ্রোহী জীবনানন্দ দাশও প্রবেশমুহূর্তে মৃদু মর্মরে ব'লে উঠেছিলেন : 'কেউ যাহা জানে নাই—কোনো-এক বাণী/আমি ব'হে আনি' এবং তারপরই 'আমার মতন আর নাই কেউ।'

প্রাতিস্বিকতা কোনো ইজম বা মতপন্থা নয় : কারণ তাহ'লেই তার লক্ষণ ধুলায় লুণ্ঠিত হ'তো। মানুষ-যে জানোয়ার বা মেশিন নয়, প্রাতিস্বিকতাই তা শেখায়। সাধারণ মানুষের জীবনে যা সত্য শিল্পীর ক্ষেত্রে তা আরো-সত্য : প্রাতিস্বিকতাই মৌল অবলম্ব একজন শিল্পীর—চারিত্র্য ও ব্যক্তিস্বরূপ উপার্জনে তথা শুধু শিল্পী-অভিধাটি আয় করার জন্যেও তার প্রয়োজন আবশ্যিক-পর্যায়ী। এবং প্রাতিস্বিকতা উদ্দেশ্য নয় —উপায় ; গন্তব্য নয়—মাধ্যম ; কিন্তু অনন্য উপায়, অনিবার্য মাধ্যম।

২

প্রাতিস্বিকতা বিজনতারই দ্বিতীয় অভিধা। সামাজিক প্রবাহের ভিতরে ব্যক্তি এক-একটি দ্বীপের মতো—সামাজিক তরঙ্গাবলি তার দ্বীপশরীরে ক্রমাগত আছড়ে পড়ছে। কল্পনা যেন সেই দ্বীপেরই শান্তিসবুজ, সেই দ্বীপেরই শান্তিশষ্প—যদিচ সমস্ত দ্বীপের সমস্ত ঘাস একরকম নয়। যে-আমরা প্রাত্যহিকতার সরু-মোটা নানা সূত্রে যোজিত, তার বাইরে তথা খুব ভিতরে একা আমরা : মুখোমুখি একা। শিল্পমনীষা ঐ দর্পণে বিম্বিত আননটিকে ক্রমাগত শব্দে বর্ণে অনূদিত ক'রে ফেলতে চায়। বাহিরও অনেকসময় এসে মেশে বটে ; কিন্তু ভিতরের আয়নাবিম্বন থেকে যতোক্ষণ না রূপ ধরা যাবে, ততোক্ষণ তা শিল্প হ'য়ে উঠবে না। চিরকালের শিল্পেরই এটা মর্মকথা ; কিন্তু এটা বিশেষত সাম্প্রতিক কালেরই আবিষ্কার। সেজন্যেই একালে বাস্তবের অবিকল প্রতিচিত্রণ, প্রকৃতির অবিকল প্রতিমূর্তি রচনার বদলে শিল্প হ'য়ে উঠেছে বিমূর্ত—যেখানে হয়তো-বা আধখানা ভিতরের আধখানা বাইরের আশ্চর্য আলকেমিতে ঋদ্ধ হ'য়ে উঠছে শিল্প।

মন চিরকালের শিল্পেরই মুখ্য অবলম্বন, কেবল বাস্তব-নামধারী বহিঃ-পৃথিবী নয়। বিমূর্ততার ঐ উদাহরণ, তাই, দীর্ঘ পশ্চাতেও প্রাপ্তব্য : বহুযুগাতীতের এক ভাস্কর্যে শরীরের অপর-অংশে অমনোযোগ দিয়ে স্তন- ও শ্রোণী-যুগের পৃথুলতায় রচিত হয়েছিলো রমণী-রূপ ; ইসলাম ধর্মে নরনারীর প্রতিরূপ অঙ্কন নিষিদ্ধ ব'লে মুসলিম শিল্পীরা বিমূর্ত-তাকে অনুপায় অবলম্বন করেছিলেন একদিন। চিত্রকলায় সাম্প্রতিকতার যাঁরা প্রথম বিষাণবাদক সেই গগাঁ-সেজান-ভ্যান গঘ প্রমুখ অকপট বস্তু-প্রতিকৃতি রচনায় নিরুৎসাহী : বস্তুর সঙ্গে তাঁরা মিশোল ঘটালেন কল্পনার, জড়ের ভিতরে চৈতন্যের বায়বয় কিন্তু অনুভববেদ্য স্বপ্নারাশ।

বাংলা কাব্যেতিহাসে জীবনানন্দ দাশ প্রথম এই বিমূর্ততার বিশাল আকাশ মুক্ত ক'রে দিলেন যেন আমাদের চোখের উপর থেকে ক্লিশে-ক্লিষ্ট বহু-যুগমলিন একটি পরদা সরিয়ে ফেলে। সাম্প্রতিক পাঠক-যে মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-মোহিতলাল-যতীন্দ্রনাথের চেয়ে জীবনানন্দের কাব্যের আস্বাদ অধিক নিকটবর্তীভাবে পায়—চেনা অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার আয়তন অনুভব করে, তার কারণ উপ্ত এখানেই : একালের পাঠকের চৈতন্যের জমি থেকে তাঁর কবিতা রচিত। ইতিমধ্যে কবিতা স'রে আসতে শুরু করেছে নবতর পাঠকের চৈতন্যের জমির ভিতরে। এক-একটি যুগ গদ্য-ভাষা বদলে ফ্যালে, আপন ব্যবহারোপযোগী ক'রে নেয় ; কাব্য-ভাষাও ক্রমাগত পরি-বর্তমান, যুগ-রুচি তাকেও নূতন-নূতনভাবে নির্মাণ ক'রে নেয় নিজের ছাঁচের ভিতরে ফেলে। যুগ-রুচির এই ছাঁচ কেবল দেশ-কাল-সমাজের সমকালীন চাপেই তৈরি হয় না ; তার পিছনে থাকে আরো বিচিত্রবিধ শিল্পসম্ভব চাপ ও তাগিদ ও সুপারিশ। উক্ত নব্য রুচির কাছে এসে জীবনানন্দের কাব্যাকাশ ও কাব্যভূমি পৃথকতা উপার্জন ক'রে নিলো : প্রায় নিঃশব্দে তিনি কবিতার মর্মপৃথিবীতে ঢুকে একটি বিনীত হাতুড়ি দিয়ে এতোকাল-বাহিত অজস্র-পরিপ্লাবী যতো-সব কাব্যপ্রচল ভেঙে দিলেন। দেখা গেলো : তাঁর কাব্যদয়িতা পূর্বজদের থেকে একেবারে আলাদা ; দেখা গেলো : তাঁর ব্যবহৃত উপমায় তলোয়ার অগ্রজদের মতো অনায়াসে খাপের ভিতরে প্রবেশ করে না ; দেখা গেলো : যে-রবীন্দ্রনাথকে স্বপ্নজগতের অধিবাসী বলা হ'তো, তাঁর চেয়ে ভিন্নতর গভীরতর এক স্বপ্নলোকে এই কবি আমগ্ন কিংবা আমগ্নতাআকাঙ্ক্ষী (এবং সাম্প্রতিক মানুষের কাছে জীবনানন্দের স্বপ্নমগ্নতাই কাঙ্ক্ষনীয়)। ততোদিনে সাম্প্রত অর্জনের জন্যে রবীন্দ্রনাথ গদ্যকবিতার ভুল রাস্তা নির্বাচন ক'রে নিয়েছেন ; আর

জীবনানন্দ রবীন্দ্রচর্চিত স্বপ্নেরই আরো গভীরদেশে (সাম্প্রতিকতরতার তুলনায়) প্রবেশ করলেন। আর এমনিভাবে জীবনানন্দ আলাদা হ'য়ে গেলেন কল্পনার আলাদা ব্যবহারেই ;—আর, কে না জানে, এটাই সর্বাধিক কবি- তথা শিল্পী-শোভন উপায়।

জীবনানন্দ তাঁর নিবন্ধগুচ্ছেও সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন কল্পনার উপরে। 'অবচেতন ও নির্মন'-এর উপর ভর-রক্ষিত তাঁর কিছু কবিতাবলির সাক্ষ্য একটু-পরেই আমরা উদ্ধৃত করছি ; তার আগে তাঁর গদ্যরচনা থেকে এ বিষয়ে দু-একটি উদাহরণ সংগ্রহ করা যাক :

> সকলেই কবি নয় ; কেউ কেউ কবি ; কবি—কেননা তাদের হৃদয়ে **কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা** রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য-বিকীরণ সাহায্য করছে।
>
> [কবিতার কথা, ক. ক., পৃ ৯]

স্থূলাক্ষর বাক্যাংশে দেখা যাবে মুখ্য স্থান দখল করেছে কল্পনা—চিন্তা ও অভিজ্ঞতা তথা মনন সেই কল্পনাজগতেরই অধিবাসী। এরই সমান্তরে জীবনানন্দের কবিমানসও ব্যাখ্যেয় : কবিতায় রবীন্দ্র-বিপর্যাস আনতে গিয়েই-যে তিনি কল্পনার ব্যবহারে জোর দিয়েছিলেন, তা নয় ; তাঁর প্রবণতাই ছিলো কল্পনাগামিতায়, রূপবান কল্পনামার্গে, ভিতরে রবীন্দ্র-স্রস্ত নব্য কবিতা রচনার ইচ্ছাও জ্বালানো ছিলো হয়তো। 'কবিতার কথা' নামক যে-নিবন্ধে অনির্বচনীয় মনীষার আমোদ পাই, তা থেকে আর-একটি অংশ আমাদের প্রয়োজনে কেটে নিয়ে আসি। বলেছেন কবি : কবিতায় থাকতে পারে 'সমাজশিক্ষা, লোকশিক্ষা, নানারকম চিন্তার ব্যায়াম ও মতবাদের প্রাচুর্য' ; কিন্তু

> কবির প্রণালী অন্যরকম—কোনো প্রাক্‌নির্দিষ্ট চিন্তা বা মতবাদের জমাট দানা [বেঁধে ?] থাকে না কবির মনে—কিংবা থাকলেও সে-গুলোকে সম্পূর্ণ নিরস্ত করে থাকে কল্পনার আলো ও আবেগ :
>
> [ঐ, পৃ ১০]

কবিতায় কল্পনার এই সার্বভৌমত্ব দর্শানোর পরে কবি জীবনে ও শিল্পে কল্পনার সাযুজ্য-বৈসাযুজ্যও অপরূপ অন্তর্দৃষ্টিবলে উন্মোচন করেছেন, যা আমাদের প্রচলপোষিত বাঙালি মনোভাবনার বিপ্রতীপে নূতন চিন্তাব উদ্বোধন করতে পারে :

সাধারণত বাস্তব বলতে আমরা যা বুঝি তার সম্পূর্ণ পুনর্গঠন

তবুও কাব্যের ভিতর থাকে না : আমরা এক নতুন প্রদেশে প্রবেশ করেছি। পৃথিবীর সমস্ত জল ছেড়ে দিয়ে যদি এক নতুন জলের কল্পনা করা যায় কিংবা পৃথিবীর সমস্ত দীপ ছেড়ে দিয়ে এক নতুন প্রদীপের কল্পনা করা যায়—তাহলে পৃথিবীর এই দিন, রাত্রি, মানুষ ও তার আকাঙ্ক্ষা এবং সৃষ্টির সমস্ত ধুলো, সমস্ত কঙ্কাল ও সমস্ত নক্ষত্রকে ছেড়ে দিয়ে এক নতুন ব্যবহারের কল্পনা করা যেতে পারে যা কাব্য ;—অথচ **জীবনের সঙ্গে যার গোপনীয় সুড়ঙ্গলালিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধ** : সম্বন্ধের ধূসরতা ও নূতনতা।

[ঐ, পৃ ১৪]

এই পটভূমিতেই জীবনানন্দের এই দুর্ধর্ষ মন্তব্য স্পষ্ট হয় :

কবিতা ও জীবন একই জিনিসের দুইরকম উৎসারণ।

[ঐ, পৃ ১৪]

জীবনানন্দের হাতে, বস্তুত, কবিতাকে জীবনের সমান মর্যাদামূল্যের অভিষেক অনুষ্ঠিত হ'লো।

জীবনানন্দে এই ভিতরটান, এই কল্পনাব্যবহার রেললাইনের মতো সমান্তরাল নয়—বরং এতোদিনকার মৃত্তিকাবদ্ধ রেললাইন ছেড়ে তাঁর কল্পনার পাগল ট্রেনগাড়ি অপরিচিত দেশে নেমে যায়, যেখানে এমনকি বাংলাদেশের নিসর্গপ্রকৃতির মধ্য থেকে অন্য-এক স্বপ্নস্বর্গাভাস উঁকি মারে। পল গগাঁ-র উপান্ত্য চিত্রসমুচ্চয় যেমন তাহিতি-দ্বীপের নিপট প্রতিচ্ছবি নয় বরং এক স্বর্গদেশের প্রতীকী ছবিও ধ'রে রাখে, তেমনি জীবনানন্দের এই আর্কেডিআ। "রূপসী বাংলা"-র এক-একটি সনেটের স্বর্গখণ্ডে, তাই, কেবল বাংলাদেশ প্রতিচিত্রিত নয়, কবির মনো-বেহেশতী প্রতিবিম্বপাতও দ্রষ্টব্য।

কবিতাসত্য

অলীক অপিচ সত্য, বাস্তব ধারণায় অলীক অথচ কবিতার ধারণায় সত্য—এই হচ্ছে কবিতাসত্য। কবির মনোভূমিই কবিতাসত্যের জন্মস্থান। জীবনানন্দ প্রথম থেকেই খুব স্বভাবীরকমে কবিতাসত্যের প্রয়োগ করতে থাকেন। কবিতাসত্যে কল্পনারই একটি লীলা ধরা পড়ে ; কিন্তু কল্পনার যাবতীয় রূপ মাত্রেই কবিতাসত্যের অন্তর্ভূত নয়। "ধূসর পাণ্ডুলিপি"-র 'পরস্পর' কবিতার রূপকথার ভূমি কবিতাসত্যের বিষয় নয় ; কিন্তু তার প্রাথমিক সিঁড়ির মতো। "বনলতা সেন" কবিতাগ্রন্থের 'আমি যদি হতাম'

কবিতায় বনহংস হওয়ার যে-আকাঙ্ক্ষা পরিব্যক্ত তা কবিতাসত্য নয় ; কিন্তু 'বনলতা সেন' কবিতায় হাজার-বছর-ব্যাপী ভ্রাম্যমাণ পথিকটি নিশ্চিতভাবে কবিতাসত্যের পথ ধ'রেই হেঁটেছে। 'স্বপ্নের হাতে' কবিতার 'কিন্তু এই স্বপ্নের জগৎ/চিরদিন রয়' এই বিশ্বাসই হয়তো কবিকে স্বপ্নের—কল্পনার—কবিতাসত্যের মর্যাদা রাখতে নির্দিষ্ট করেছে। কবিতাসত্যের কএকটি উদাহরণ, অনন্তর, সংগ্রহ করা যাক :

১. কেউ নাই কোনোদিকে—তবু যদি জ্যোৎস্নায় পেতে থাকো কান
শুনিবে বাতাসে শব্দ : 'ঘোড়া চ'ড়ে কই যাও হে রায়রায়ান—'
[পৃথিবী রয়েছে ব্যস্ত, রূ. বা.]

২. হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি ; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূর অন্ধকার বিদর্ভ নগরে ;
[বনলতা সেন, বনলতা সেন]

৩. সুরঞ্জনা, আজো তুমি আমাদের পৃথিবীতে আছো ;
পৃথিবীর বয়সিনী তুমি এক মেয়ের মতন।
[সুরঞ্জনা, বনলতা সেন]

৪. বেবিলনে একা একা এমনই হেঁটেছি আমি রাতের ভিতর
কেন যেন ; আজো আমি জানিনাকো হাজার-হাজার ব্যস্ত
বছরের পর।
[পথ হাঁটা, বনলতা সেন]

৫. যে-রূপসীদের আমি এশিরিয়ায়, মিশরে, বিদিশায় ম'রে যেতে
দেখেছি কাল তারা অতিদূর আকাশের সীমানায় কুয়াশায়
কুয়াশায় দীর্ঘ বর্শা হাতে ক'রে কাতারে-কাতারে দাঁড়িয়ে
গেছে যেন।
[হাওয়ার রাত, মহাপৃথিবী]

৬. মিশরের মানুষী তার বুকের থেকে যে-মুক্তা আমার নীল
মদের গেলাসে রেখেছিলো
হাজার-হাজার বছর আগে এক রাতে—তেমনি—
তেমনি একটি তারা আকাশে জ্বলছে এখনো।
[শিকার, মহাপৃথিবী]

৭. এই পৃথিবীর পথে আড়াই হাজার
বছর বয়সী আমি ;
বুদ্ধকে স্বচক্ষে মহানির্বাণের আশ্চর্য শান্তিতে
চলে যেতে দেখে—

[তবু, শ্রেষ্ঠ কবিতা]

৮. ওই দ্যাখো পায়রারা—এশিরিয়া মিশরেও ইহাদের দেখিয়াছি
আমি।

[পায়রা]

৯. কেন হিংসা ঈর্ষা গ্লানি ক্লান্তি ভয় রক্ত কলরব :
বুদ্ধের মৃত্যুর পরে যেই তন্বী ভিক্ষুণীকে এই প্রশ্ন আমার হৃদয়
ক'রে চুপ করেছিলো—আজো সময়ের কাছে তেমনই নীরব।

[মহাগোধূলি, বেলা অবেলা কালবেলা]

কবির মধ্যপর্যায়ে এই কবিতাসত্যের ব্যবহার অধিক ; প্রথম পর্যায়ে কবি কল্পনার সাধারণ পথেই চলেছিলেন ; আর শেষ পর্যায়ে রূঢ় বাস্তবতায় ও মনীষায় ধূসর হ'য়ে গিয়েছিলেন—তখন আর কবিতাসত্য ব্যবহার করা সম্ভব ছিলো না তাঁর পক্ষে। তাই "বনলতা সেন" ও "মহাপৃথিবী" কবিতা-গ্রন্থদ্বয়েই কবিতাসত্যময় কবিতা তিনি রচনা করেছিলেন অধিক পরিমাণে। ইতিহাসচেতনার সঙ্গে কবিতাসত্যের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নেই ; তবে ইতিহাস-চেতনা কবিতাসত্য উপলব্ধির পথে কবিকে সাহায্য করেছিলো। ঐ কবিতা-সত্যই কবিকে পরাবাস্তব কবিতার নিকটে নিয়ে গিয়েছিলো।

পরাবাস্তবতা

'আমরা এখনো বাস করছি যুক্তির শাসনে, কিন্তু আমাদের কালের যুক্তি-পদ্ধতি কেবল জীবনের অপ্রধান সমস্যার সমাধানই জানে' আঁদ্রে ব্রেতোঁ-র 'প্রথম পরাবাস্তব ইশতাহার' শুরু হয়েছিলো এইভাবে। শুরু হয়েছিলো ব্রেতোঁ ও স্যুপোলট্-এর 'স্বসমুত্থ রচনা'-র মধ্য দিয়ে। আর স্যুররিয়া-লিজম-শব্দটিও তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন তখনকার সদ্যমৃত বন্ধুকবি আপোলিনেআর-এর লেখা থেকে। এই তথ্যটি স্মরণে জ্বালিয়ে রাখা দরকার যে স্যুররিয়ালিজম-এর ঝরনা সাহিত্যের দেশ থেকেই উৎসৃত হয়েছে ; সেখান থেকে প্রপাতের মতো ঝ'রে পড়েছে অপরাপর শিল্পের সমভূমিতে। স্বপ্ন, দিবাস্বপ্ন ; কল্পনা, প্রকল্পনা, আকল্পনা ; অবচেতন থেকে জাগ্রত কখনো, কখনো চেতন-অচেতন-অবচেতনের তিন মানসকক্ষে নির্বাধ যাতায়াত ; ফলত অনঙ্ক ও যুক্তিরহিত : এইসব পরাবাস্তবতার

পরম প্রসঙ্গ। বস্তুত পরাবাস্তব উপর্যুক্ত আন্দোলনের সঙ্গে জীবনানন্দের কোনো প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিলো না ; যদিচ তাঁর কবিতাবলির একাংশে পরাবাস্তবতার নিহিত সংক্রাম ঘ'টে গিয়েছিলো। প্রাতিস্বিক প্রবণতার সঙ্গে স্বপ্নকল্পনার দিকে পক্ষপাত প্রসারিত হয়েছিলো তাঁর কীটস-এ্যালানপো-ইএটস-ডিলান টমাস-লুই ম্যাকনিস অধ্যয়নের সঙ্গে-সঙ্গে। অপরদিকে বিজন নিঃসঙ্গতার কল্পনাজগতে ভ্রমণ করতে-করতে তিনি সেই 'মায়াবীর অপর পারের দেশে' পৌঁছেছিলেন। অথবা সুররিয়্যালিজম-এর নিহিতেই সেই অগ্নি আছে, যে-অগ্নি খুব ভিতরে-ভিতরে প্রবাহিত হয়, যার জন্যে যুক্তি-পদ্ধতি অপ্রয়োজনীয় : ঝোড়ো হাওয়ায় স্ফুলিঙ্গ যেমন এদিক-ওদিক উড়ে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি কালমানসের ঝটিকায় কোন দূর দেশ থেকে অঙ্গার উড়ে এসে পড়েছিলো জীবনানন্দের খুব মধ্যে। "বনলতা সেন" ও "মহাপৃথিবী" কবিতাগ্রন্থদ্বয়ে উদ্‌গীরিত হ'য়ে এলো কএকটি পরাবাস্তব কবিতা। "সাতটি তারার তিমির"-এর একপাশে 'অবচেতন ও নির্মন'-এর কবিতা, আরেক পাশে 'সমাজ ও ধর্ম ইত্যাদির মুখপাত্র' কবিতা। "মহাপৃথিবী" শিরোনামে যদি মহাবিশ্বলোকী ইশারা প্রকাশিত, "সাতটি তারার তিমির" নামে পরাবাস্তবিক হাওয়া। "সাতটি তারার তিমির"-এর দ্বিধাভক্ত কবিতা আপাতদৃষ্টিতে বিষম মনে হ'লেও এই বিচ্ছেদঘটিনী তাৎপর্য ধ'রে রাখে গভীর : একদিকে নগ্ন দুঃখবহ ও প্রবল বাস্তবতার আক্রমণ, অন্যদিকে সেই আক্রমণ থেকে গা বাঁচিয়ে কল্পনা-প্রকল্পনার রাজ্যে নিবিড় ভ্রমণ। এখানে কবির সম্মুখে প্রমুক্ত ছিলো দুই রাস্তা : একটি প্রকল্পনা-তন্ময়তায় প্রসারিত, অপরটি নগ্নপ্রবল বাস্তবতার সামনা করা। জীবনানন্দ বেছে নিলেন দ্বিতীয় রাস্তাটি এবং মনীষায় ধূসর থেকে ধূসরতর হ'তে থাকলেন, উপান্ত্য কবিতাগুচ্ছে তাঁর দু-একটি পঙক্তিতে কেবল রঙিন চিত্রণ আকস্মিক ঝিলিক দিয়ে যেতো।

পরাবাস্তব কবিতা ইমেজোচ্ছল, ব্যক্তিগত বাকপ্রতিমা ও বর্ণে, প্রাতিস্বিক উপমারূপকে ভরপুর। জীবনানন্দ 'বিভিন্ন কোরাসে' লিখে-ছিলেন 'ঘাসের উপর দিয়ে ভেসে যায় সবুজ বাতাস'। এই 'সবুজ বাতাস'-ই প্রবাহিত দেখি পরাবাস্তবী কবি ফেদেরিকো গারথিআ লোরকা-র 'নিশি-পাওয়া বালাদ' কবিতায়। এক প্রতীকী-চিত্রকল্পী কবির সঙ্গে এই সূত্রেই তাঁর সাযুজ্য সন্ধেয় :

নৈশচিত্র : গেঅর্গ ট্রাকল

একজন মানুষ একেলা নক্ষত্রগুচ্ছের তলে
গেছে তার পথ মধ্যরাতের ভিতর দিয়ে বেঁকে।
সহসা দুঃস্বপ্ন দেখে একটি বালক ওঠে জেগে
উজল চাঁদের নিচে প্রস্তারিত মুখের মণ্ডলে।
উন্মাদরমণী এক—তরঙ্গিত চিকুরধারায়—
স্থিরদৃষ্টি জানালার দিকে চোখ রেখে কেঁদে চলে।
তারায় সীবন-করা ম্লানায়িত সরোবরজলে
প্রেমাক্রান্ত দয়িতদয়িতাযুগ ভেসে চ'লে যায়।
পান করে আরক্ত শরাব মুক্তনেত্র হন্তারক।
মুমূর্ষু বৃদ্ধেরা যতো কাঁপে মরণের ভয়ে দুখে।
প্রার্থনায় নতহাঁটু ক্রুশবিদ্ধ খৃষ্টের সম্মুখে
প্রলুব্ধ নিশ্বাসে জ্বলা নগ্ননী ধর্মযাজিকা এক।
শিশুকে শোনায় গান, দোলা দ্যায় ঘুমন্তা জননী।
চাঁদের নরম আলো—তার দিকে তাকিয়ে শিশুটি
চোখে তার অনুপম বিশ্বাসের লাবণ্যের দ্যুতি।
নষ্টবাড়ি থেকে বেজে ওঠে বিলোল হাস্যের ধ্বনি।
ভূগর্ভস্থ গভীর কন্দরে, মোমবাতির আলোয়,
তাদের আঙুল থেকে যারা সদ্যমৃত সদ্যমৃতা,—
দেয়ালে সন্তত হয় দাঁত-বের-করা নিস্তব্ধতা।
মুর্নানিদ্র ঘুমের ভিতরে বিড়বিড় কথা কয় ॥

রাত্রি : জীবনানন্দ দাশ

হাইড্রান্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল ;
অথবা সে-হাইড্র্যান্ট হয়তোবা গিয়েছিলো ফেঁসে
এখন দুপুর রাত নগরীতে দল বেঁধে নামে।
একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেল কেশে
অস্থির পেট্রল ঝেড়ে ; সতত সতর্ক থেকে তবু
কেউ যেন ভয়াবহভাবে প'ড়ে গেছে জলে।
তিনটি রিকশ ছুটে মিশে গেল শেষ গ্যাসল্যাম্পে
মায়াবীর মতো জাদুবলে।
আমিও ফিয়ার লেন ছেড়ে দিয়ে—হঠকারিতায়
মাইল-মাইল পথ হেঁটে—দেয়ালের পাশে
দাঁড়ালাম বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে গিয়ে—টেরিটি-বাজারে
চীনেবাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাসে।
মদির আলোর তাপ চুমো খায় গালে।
কেরোসিন, কাঠ, গালা, গুণচট, চামড়ার ঘ্রাণ
ডাইনামোর গুঞ্জনের সাথে মিশে গিয়ে
ধনুকের ছিলা রাখে টান।
টান রাখে মৃত ও জাগ্রত পৃথিবীকে।
টান রাখে জীবনের ধনুকের ছিলা।
শ্লোক আওড়ায়ে গেছে মৈত্রেয়ী কবে ;
রাজ্য জয় ক'রে গেছে অমর আত্তিলা।
নিতান্ত নিজের সুরে তবুও তো উপরের জানালার থেকে
গান গায় আধো জেগে ইহুদী রমণী ;
পিতৃলোক হেসে ভাবে কাকে বলে গান—
আর কাকে সোনা, তেল, কাগজের খনি।
ফিরিঙ্গি যুবক ক'টি চ'লে যায় ছিমছাম।
থামে ঠেস দিয়ে এক লোল নিগ্রো হাসে ;

হাতের ব্রায়ার পাইপ পরিস্কার করে
বড়ো এক গরিলার মতন বিশ্বাসে।
নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।
তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব—
অতিবৈতনিক,
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।

জীবনানন্দের অনেক কবিতা আপাতভাবে নিঃসংলগ্ন মনে হ'লেও যুক্তিহীন মনে হ'লেও তা আবেগের গভীর সীবনে অনুস্যূত। 'রাত্রি' কবিতার বিরুদ্ধে একজন সমালোচক স্তবকগুলির অলগ্নতার অভিযোগ এনেছিলেন। আপাতদৃষ্টে তাই : অলগ্ন, সিঁড়িহীন ও পরম্পরারহিত। কিন্তু পুরো কবিতাটি প'ড়ে উঠলে একটি অভিঘাতের সামগ্র্য সৃজিত হয় না কি? নৈশচিত্রাবলির মধ্য দিয়ে এক অর্থাভাস দ্যোতিত নয়? অবিচ্ছিন্ন বাকপ্রতিমাচয় কি মনে হয় না একটি স্বর্ণসূত্রে গুচ্ছীকৃত হ'লো? দেশে কালে বাস্তবতার অনন্য রূপটিকেই আমরা স্বীকার করবো, আর মানসিক ল্যান্ডস্কেপকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেবো, কিংবা নির্বাপিত ক'রে? দেশে কালে বস্তুত বাস্তবতার যেমন একটি অনন্য রূপ আছে, তেমনি কল্পনার সাযুজ্যেরও এমন-একটি ভূমি আছে যেখানে পরস্পরের সম্পূর্ণ অচেনা শিল্পীরাও এসে দাঁড়াতে পারেন এক কাতারে। 'রাত্রি' কবিতা, তাই, 'নৈশচিত্র' কবিতার প্রত্যক্ষ প্রভাবে রচিত—এ উক্তি ভ্রান্তিমূলক হ'তে পারে। উইলিঅম ব্লেক্-এর 'চাই! চাই!' নামক চিত্রে দর্শনীয় : নক্ষত্ররাতে পৃথিবীপট থেকে চাঁদশরীরে লাগানো সিঁড়ি বেয়ে উঠছে একজন। এই চিত্র না-দেখেও বিভিন্ন সময়ে এইসব পঙক্তি জীবনানন্দের হাত থেকে নিঃসৃত হ'য়ে আসা অসম্ভব নয় : ১. 'সেই সিঁড়ি ঘুরে প্রায় নীলিমার গায়ে গিয়ে লাগে' (মানুষের মৃত্যু হ'লে, শ্রেষ্ঠ কবিতা) ; ২. 'নগরীর সিঁড়ি প্রায় নীলিমার গায়ে লেগে আছে' (ঐ, ঐ) ; ৩. 'একটি অমেয় সিঁড়ি মাটির উপর থেকে নক্ষত্রের/আকাশে উঠেছে' (রাত্রির কোরাস্, সাতটি তারার তিমির) ; ৪. 'পরের খেতের ধান মই দিয়ে উঁচু করে নক্ষত্রে লাগানো' (সৌরকরোজ্জ্বল, সাতটি তারার তিমির)।

পরাবাস্তব কবিদের সাধনামার্গও বিচিত্রগামী : জুলে সুপেরভিএল-এর মহাজাগতিক ভ্রামণিকচিত্ততা, আপোলিনেআর-এর গীতলতা, লুই আরাগঁ-র দেশ-দয়িতার বিমিশ্রণ, গার্থিআ লোরকা-র দেশজতায়-দেশোত্তরণ, পাবলো

নেরুদা-র বাস্তবতা ও স্বপ্নের মিশোলকল্পনা প্রভৃতি। জীবনানন্দ স্বপ্নের প্রাসাদের একটি আশ্চর্য কক্ষে বাস করেছিলেন কিছুদিন। 'ও প্রাসাদে কারা থাকে? কেউ নেই।' (একটি কবিতা, সাতটি তারার তিমির)। 'ঘোড়া', 'গোধূলিসন্ধির নৃত্য', 'সেইসব শেয়ালেরা', 'সপ্তক' (সাতটি তারার তিমির) প্রভৃতি কবিতায় কবি উপনীত হন সেই শবলিত অপ্রাকৃত লোকে। 'এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে ;—জানি না সে এইখানে শুয়ে আছে কিনা' (সপ্তক) এই প্রতীপোক্তি আসলে পরাবাস্তবতাকেই ধ'রে রাখে। 'ঘোড়া' কবিতার ঘোড়া, 'সেইসব শেয়ালেরা' কবিতার শিয়াল, 'বিড়াল' ও 'হরিণেরা' কবিতায় বিড়াল ও হরিণ (বনলতা সেন) এইসব পরিচিত জানোয়ার—ঘোড়া, শিয়াল, বিড়াল, হরিণ—যেন মুখোশ এঁটে হাজির হয় আমাদের চোখের সম্মুখে। দয়িতাও হ'য়ে ওঠে অচেনা ও সুদূর, মৃত্যুলোক থেকে জাগ্রত ব'লে হ'য়ে ওঠে অতিপ্রাকৃত : 'শঙ্খমালা' (বনলতা সেন) কবিতায় 'কড়ির মতন শাদা মুখ তার,/দুইখানা হাত তার হিম/চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম/চিতা জ্বলে' এবং 'শব' (বনলতা সেন) কবিতায় 'এইখানে মৃণালিনী ঘোষালের শব/ভাসিতেছে চিরদিন।'।

আঁদ্রে ব্রেতোঁ যাকে বলেছিলেন 'Marvellous' ,জীবনানন্দ যাকে বলেছেন 'আশ্চর্যবিস্ময়', জীবনানন্দের এইসব কবিতা তারই কারণে হ'য়ে ওঠে আনন্দআধার ও কান্তিনিকেতন।

ইতিহাস-ভূগোলের শোভাভূমি

কল্পনার একটি শাখাপথ রওনা হ'য়ে গেছে দূরবিহারে। দূরবিহারের ঐ রাস্তায় চিরকালের সব শিল্পীকেই চলতে হয়—যা বর্তমানিক বহু প্রসঙ্গে শিকড়-ছড়ানো দেশ-কাল-সন্ততিকে বাদ দিয়ে অপরতর নবীন অলীক ও শিল্পসত্যময় দেশ-কাল-সন্ততি মেলে ধরে। প্রচ্ছন্ন এই যাতায়াত দু-রকমে সম্পন্ন হয় : একদিকে আছে সাধারণ-সুস্থ-স্বস্থ শিল্পের ভ্রমণ, অপরদিকে বাস্তবের কাছে প্রহৃত শিল্প। মাইকেলের রামায়ণের গল্পাবগাহনে বা রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধ কাহিনীর উদ্‌যাপনায় যেন কোন দূরাতীতদেশ থেকে আনীত চারা-য় উজ্জ্বল মঞ্জরী পুষ্পিত হ'য়ে উঠলো আমাদেরই ছায়াচ্ছন্ন আঙিনায়। রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা কবিতা একদিন সত্যেন্দ্রনাথ-মোহিত-লাল-নজরুলের কল্যাণমাধ্যমে ইতিহাসভূগোলবিহার চয়ন ক'রে নিয়েছিলো (যতীন্দ্রনাথকে, রবীন্দ্র-বিপ্রতীপী কবি হ'লেও, এই শস্যোৎসার থেকে একটু দূরে সরিয়ে রাখতে হবে ; কেননা তাঁর কবিচারিত্র্যেই আছে বর্তমানের

সঙ্গে দূরসংলগ্নতা : দেশকালের বিকর্ষণ যেন তাঁকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে ইন্দ্রজালের মতো ধ'রে রেখেছিলো—যেমন আমরা ঘৃণায় বা ক্রোধেও অনেক সময় লগ্ন হ'য়ে থাকি। এই ইন্দ্রজাল থেকে সবলে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন তিনি একেবারে বিপরীতে : স্বপ্নপ্রয়াণে ; তা না-ক'রে উত্তরকালে, অন্য-এক সমর্পণ ঘটেছিলো তাঁর : নিজেকে তিনি সুন্দরে সঁপে দিয়েছিলেন)। খুব স্পষ্টভাবে না-হ'লেও, শিল্পে যতোদূর সাধ্য রবীন্দ্র-বিপ্রতীপী নবীনতা ফলিয়ে তোলার একটি আকাঙ্ক্ষা ভিতরে-ভিতরে কাজ ক'রে যাচ্ছিলো। রবীন্দ্রনাথের অনবরত বাংলা আকাশে বাংলা আলোয় বিহার, রবীন্দ্র-পতঙ্গদের ক্রমাগত রবীন্দ্রদীপটিকে ঘিরে-ঘিরে উড্ডয়ন—এইসবই ভিতর থেকে সাহায্য করেছিলো বাংলা কবিতার দূর-প্রয়াণে। 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুঈন' রবীন্দ্রনাথের এই ইচ্ছা একটি অভীপ্সামাত্র ছিলো। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মরুমায়া প্রতীকীকৃত রূপকীকৃত। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর আকল্পনার সৌজন্যে, তাঁর জ্ঞানতিমাযার সৌজন্যে আর একটু দূরে নীত হ'লেন। কেবল বন্দনার সূত্রেই নয়, তাঁর কবিত্বের কনকফোয়ারা উচ্ছ্রিত হ'য়ে উঠলো বাংলাতিক্রমী বাতাসে এক। অন্তত এই সূত্রে দেখা যাচ্ছে সত্যেন্দ্রনাথকে রবিমুগ্ধতা থেকে একটি সম্মানিত দূরত্ব সরিয়ে নিয়ে এসেছিলো। তাঁকে অপরাপর রবীন্দ্রানুকারী-দের মতো একেবারে নাকচ ক'রে ফেলা যাচ্ছে না। মোহিতলালের স্বপ্নের একাংশও দেখা গেলো ইতিহাসে প্রোথিত, যেমন নজরুলেরও একভাগ। এঁদের এই ইতিহাস-ভূগোল-বিহার অধিকাংশ সময়ে আরব্য-পারশ্য সন্দীপনে উজ্জ্বলিত। খানিকটা জ্ঞান থেকে (সত্যেন্দ্রনাথে প্রধানত), খানিকটা সংবাদচাঞ্চল্যে (নজরুলে প্রধানত), খানিকটা স্বপ্নাকাঙ্ক্ষায় (মোহিতলালে প্রধানত) এঁরা ইতিহাস-ভূগোলের নব-নবীন পথে বেরিয়ে পড়েছিলেন। সমস্তে কাজ করেছিলো এক স্বপ্নাভাস, এক কল্পনালোকের নিমন্ত্রণ। এই স্বপ্নকল্পনালোকে জীবনানন্দ দাশও ছিলেন নিমন্ত্রিত। প্রসঙ্গ এই তথ্যটি ফের স্মরণীয় এখানে যে জীবনানন্দ প্রথম পর্যায়ে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের দ্বারা নয়—বরং সত্যেন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-নজরুলের মতো তিন ইতিহাসভূগোলবিহারীর দ্বারা। প্রথম কবিতাগ্রন্থ তাঁর, "ঝরা পালক"-এ, এই আক্রান্তির নজির পরিদৃশ্যমান। ব্যাবিলন-নিনেভ-এর স্বপ্ন তাঁর তৎকালীন কবিতাতেই মুদ্রিত হ'য়ে গিয়েছিলো। উত্তরকালে তিনি ঐ তিন কবির প্রত্যক্ষ আলোকধারা থেকে স'রে এসেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর পরবর্তী কবিতার স্নায়ব ঝঙ্কারে ঐ তিন কবির স্মৃতিলেখা ধরা পড়ে : তাঁদেরই

মতো রূপার্ত কবি তিনি, অলংকারচঞ্চল কবি তিনি। "ঝরা পালক"-উত্তর কবিতাগুচ্ছে জীবনানন্দের ব্যক্তিস্বরূপের মুদ্রাঙ্কন স্পষ্ট ও আদীপ্র হ'য়ে উঠেছিলো। ইতিহাস ও ভূগোলও চমৎকার শোভাভূমি তৈরি ক'রে নিয়েছিলো তাঁর কাব্যপরিসরে। "ধূসর পাণ্ডুলিপি" ও আরো-বিশেষত "বনলতা সেন" কবিতাগ্রন্থদ্বয়ে ক্রমাগত সমুদ্রের উল্লেখ, অনবরত সমুদ্রচারণা এই বিহারেরই বিস্তার। 'সাগরের জলের বাতাসে/আমরা হৃদয় সুস্থ হয়' (পাখিরা, ধূসর পাণ্ডুলিপি)—এ-কথা কবিতার অন্তর্গত অর্থেই দীপ্তিমান। সমুদ্র, সমুদ্রসমীর, দ্বীপ, নাবিক, তরণী, জাহাজ : ভ্রাম্যমাণ সেই নাবিকবৃত্তিরই স্মৃতিবহ। জীবনানন্দ অবশ্য অচিরকালের মধ্যে এইসব শব্দের ভিতরে বিশাল অর্থ ভ'রে দিতে লাগলেন, তাঁর কাব্যতাৎপর্যের সঙ্গে গভীর সীবনে। এরই মধ্যে দেশজ কাঁথায় যেন গেঁথে দিতে লাগলেন সুদূরের সুতো : তাঁর সময়-ধারণার সঞ্চার ঘটালেন কবিতার ছত্রে-ছত্রে। অপরদিকে : ব্যাবিলন, নিনেভ, মিশর ; শ্রাবস্তী, উজ্জয়িনী, বিদিশা:—কখনো এইসব দেশ-শহরকে ডেকে আনলেন, কখনো সশরীরে হাজির হ'লেন এইসব দেশ-শহরে। ইতিহাস-ভূগোলের এই স্বাপ্নিল ভ্রমণ তাঁকে অর্ধজীবন আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিলো 'রৌদ্রে রক্তে অক্লান্ত সফরে'। উত্তরবর্তীকালে তিনি প্রধানত সম-সমাজ-দেশ-কাল-ভাবনায় নিজেকে নিঃসৃত করেছেন, যার সূচনা "সাতটি তারার তিমির" থেকে।

ঐ ইতিহাস-ভূগোল-বিহার জীবনানন্দকে আর-এক স্বপ্নে উত্তীর্ণ করেছিলো, অথবা স্বপ্নপ্রয়াণই সাহায্য করেছিলো সেই লোকে যেতে, যে-স্বপ্ন য়ুং-এর উচ্চারণে 'ব্যক্তি-মানুষের মীথ'। স্বপ্ন ও প্রকল্পনাভাবনায় আমরা সভ্যতার আদিমে নীত হই, য়ুং-এর এই সিদ্ধান্তের পটপরিসরে জীবনানন্দের একগুচ্ছ কবিতা চয়ন করা যায়, 'ঘোড়া' (সাতটি তারার তিমির) যার একটি সুন্দর উদাহরণ। যে-স্বপ্নকল্পনাবিহার জীবনানন্দে তাতে খুব স্বভাবীরকমেই য়ুং-কথিত 'সমবায়ী নির্জ্ঞান' স্বাক্ষরিত। তাঁর কবিতায় এই স্বপ্নোত্থান এরকম কার্যকরী যে তা অনেক সময়েই যুক্তিগ্রথিত নয়, বরং স্বপ্নসমাহৃত।—জীবনানন্দের কবিতায় এইভাবে কাজ ক'রে গেছে বিচিত্রবিধ কল্পনার অপরূপ অর্কেস্ট্রায়ন ॥

[১৯৭০ ও ১৯৭২]

দ্বিতীয় খণ্ড

'বনলতা সেন'

হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি ; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে ;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য ; অতিদূর সমুদ্রের 'পর
হাল ভেঙে যে-নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে ; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন ?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে ; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল ;
পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল ;
সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন ;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

[বনলতা সেন, বনলতা সেন]

তিনটি স্তবকে সমাপ্ত এই কবিতাটি, 'বনলতা সেন', যেন এক অনিঃশেষ ফোয়ারা—অনন্ত কাব্যোৎসারের। কবিতার—হয়তো যে-কোনো শিল্পেরই—

প্রসঙ্গ থেকে প্রকরণকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলা সমীচীন নয় ; আমাদের যাত্রা প্রকরণের পরিচয় দিতে-দিতে প্রসঙ্গের প্রতিভাস রচনা করায়।

সমান ওজনের—ছয় লাইনের তিনটি স্তবক। কবিতা জ্যামিতি নয় ; কিন্তু কবিতায় থাকে এক ভিতর-জ্যামিতি। সেই ভিতর-জ্যামিতির গোপন কাজ চলেছে এখানে তিনটি স্তবকের ত্রিলোক বিহারে। প্রথম স্তবকে কবির আত্মপরিচয় ; দ্বিতীয় স্তবকে দয়িতা-পরিচয় ; তৃতীয় স্তবকে উভয়ের সংঘট্টজনিত এক পরিণাম, এক স্বপ্নোচ্চারণ—স্বপ্নই এখানে সত্য, সেই হিশেবে সত্যোদ্ঘাটনও বটে।

প্রথম স্তবকে যে-পথিকচিত্ততা প্রকাশিত হয়েছে, দ্বিতীয় স্তবকে তারই অপর পিঠ নাবিকচিত্ততা। এই অনন্ত পথিকচিত্ততা কএকটি অতিসাধারণ প্রাকৃত বাক্যোচ্চারণে রূপায়িত : 'হাজার বছর ধরে', 'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক', 'দুদণ্ড শান্তি'—পরে 'এতদিন কোথায় ছিলেন', 'সব লেনদেন' প্রভৃতি মৌখিক বাকপ্রয়োগে। যে-ইতিহাসচৈতন্য জ্ব'লে উঠেছিলো এমনকি "ঝরা পালক"-এই মিশর-ব্যাবিলন-নিনেভ-এর স্মরণিকায়, "ধূসর পাণ্ডুলিপি"-র অতিপ্রাতিস্বিক জগৎ পেরিয়ে আবার তা রূপচরিতার্থতা খুঁজে নিলো 'বনলতা সেন' কবিতায় (এবং "বনলতা সেন" কবিতা-গ্রন্থের আরো কবিতা-কতিপয়ে)। হাজার-বছর-ব্যাপী ভ্রাম্যমাণ এই পথিকচিত্তের ক্লান্তি- ও শান্তিদায়িনী বনলতা সেন পাশাপাশি উপস্থিত। কালিক পরিচয় প্রকাশের পরে স্থানিক বিশিষ্টতাও জীবনানন্দ ফোটাতে চেয়েছেন এখানে : সিংহল সমুদ্র, মালয় সাগর, বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগৎ, বিদর্ভ নগর—তারই পাশাপাশি উল্লিখিত হয়েছে সমকালীন একটি সামান্য শহর—নাটোর। সেই নাটোরদুহিতা বনলতা সেন-ই কবির হৃদয়দয়িতা।

দ্বিতীয় স্তবকে ভ্রাম্যমাণ মানস প্রকাশিত হয়েছে নাবিকী উচ্চারণে, যা পথিকবৃত্তিরই অপর প্রকাশ। দয়িতাকেন্দ্রিক এই স্তবকে সরাসরি নগর নয় আর, ব্যবহার করা হচ্ছে নগরস্মৃতি–দয়িতার কেশদাম বিদিশার কৃষ্ণ রজনীর স্মারক, আনন শ্রাবস্তীর কারুকার্যের স্মারক। সুতরাং এখানেও তলে তলে ইতিহাসের তথা ভ্রাম্যমাণ মানসের পূর্বতন ব্যাপ্তি রক্ষা করেছেন কবি। দর্শনীয় দয়িতাটি : চুল, মুখ, চোখের বর্ণনা করেছেন কবি তার—তবু তার উপর যেন রহস্যের পরদা লুটিয়ে থাকে। তার কারণ জীবনানন্দীয় উপমার কুশলতা। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন 'অনাঘ্রাতা পূজার ফুল দুটি' তখন কোনো তরুণীর স্তনযুগল আমাদের চোখের সম্মুখে পূর্ণ প্রস্ফুটিত হ'য়ে ওঠে। কিন্তু বিদিশার নিশার মতো চিকুরজাল, শ্রাবস্তীর কারুকার্যের

মতো আনন, পাখির নীড়ের মতো চোখ—এই তিনটি শারীরিক উপমার একটিও কোষ-তলোয়ার সার্বাধিক উপমা নয়। 'বিদিশার নিশা' বা 'শ্রাবস্তীর কারুকার্য' আমরা পাঠকেরা কেন, কবি নিজেও দ্যাখেননি; তবু যখন বিদিশার সঙ্গে উপমিত হয় কেশরাশি, শ্রাবস্তীর কারুকার্যের সঙ্গে আনন-সৌন্দর্য—তখন আমাদের চোখের সম্মুখে কবিপ্রিয়ার অসম্ভব সৌন্দর্য বিকশিত হ'য়ে ওঠে। বিচ্ছিন্নভাবে কেউ যদি শুধু 'পাখির নীড়ের মতো চোখ' উপমাটি প'ড়ে তা অর্থহীন মনে করে, তাকে দোষ দেবার কিছু নেই। কিন্তু তার আগের স্তবকে আমরা এরকম দুটি চরণ পড়েছি : 'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন/আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন।' এবং বর্তমান স্তবকেই পড়েছি সেই হাল-ভাঙা নাবিকের কথা, কবি যার সঙ্গে নিজেকে তুলিত করেছেন, যে অতিদূর সমুদ্রের মধ্যে সহসা সবুজ ঘাসের দেশ লক্ষ্য ক'রে আনন্দে উন্মাতাল হ'য়ে উঠেছে ;—এর পরে পাখির নীড়ের মতো চোখ-যে ক্লান্তপ্রাণ কবির আশ্রয়-আধার হ'য়ে উঠবে, তা কি ব'লে দিতে হয়। একটি পরোক্ষ উপমাও ব্যবহার করেছেন কবি : সবুজ ঘাসের দেশ—যা বনলতা সেন-এর দেহের উপমা কিন্তু শরীরের চেয়ে বেশি। সুতরাং শরীর সম্বন্ধীয় হ'লেও এইসব উপমা—বিদিশার নিশার মতো চুল, শ্রাবস্তীর কারুকার্যের মতো মুখ, পাখির নীড়ের মতো চোখ, বা এমনকি সবুজ ঘাসের মতো দেহ—এদের আমরা বলবো আত্মিক উপমা। বাংলা কবিতায় আত্মিক উপমাসৃজন জীবনানন্দের দান। এই কবিতায় দয়িতার সেই অতিসাধারণ ও অনন্ত জিজ্ঞাসা 'এতদিন কোথায় ছিলেন?' নিরুত্তর থেকে যায়। কিন্তু এ তো ঠিক প্রশ্ন নয়, এ হচ্ছে উপস্থাপন : এই উক্তির মধ্য দিয়ে দয়িতা নিজের আর্তি ও আবেদনের আকুলতা রাষ্ট্র ক'রে যায়।

তৃতীয় স্তবকে অঙ্কিত হয়েছে দিনান্তের একটি চিত্র, যা আপাত-দৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক কিন্তু গভীরভাবে অনুস্যূত মূল প্রসঙ্গের সহিত। এই দিনান্ত আসলে প্রাগুক্ত যাত্রাশেষের মুহূর্ত : 'সমস্ত দিনের শেষে' অর্থ সমস্ত যাত্রার শেষে। সন্ধ্যা বা আসন্ন রাত্রির এই পটভূমিকায় এই মন্তব্য ; তাই অন্ত্যসূচক এ ধরনের পঙক্তি রচিত হয় : 'সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন।' জীবনের সব লেনদেন ফুরোনোর পরেও দেখা যাচ্ছে : 'থাকে শুধু অন্ধকার মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।' জীবনের সব লেনদেন ফুরোনোর পরেও বনলতা সেনের সঙ্গে কবির মুখোমুখি উপবেশন সম্ভবপর হয় কিভাবে? কবির উত্তরকালীন দুটি

কবিতাংশ এই মুহূর্তে আমাদের সহায়ক হ'তে পারে :

১. তবু এই পৃথিবীর সব আলো একদিন নিভে গেলে পরে
মানুষ রবে না আর, রবে শুধু মানুষের স্বপ্ন তখন
সেই মুখ আর আমি রবো এই স্বপ্নের ভিতরে।

[বুনো হাঁস, বনলতা সেন]

২. উড়ুক উড়ুক তারা পউষের জ্যোৎস্নায় নীরবে উড়ুক
কল্পনার হাঁস সব ; পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রং মুছে গেলে পর
উড়ুক উড়ুক তারা হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর।

[স্বপ্ন, মহাপৃথিবী]

'বনলতা সেন' কবিতার শেষাংশেও কবিমানব লুপ্ত হ'য়ে গেছে, জেগে আছে স্বপ্ন, স্বপ্নের ভিতরেই কবি ও বনলতা সেন মুখোমুখি উপবিষ্ট।

তিনটি স্তবকেরই উপান্ত্য লাইনের শেষে ফিরে-ফিরে আসছে বনলতা সেন, গানের ধ্রুবপদের মতো। 'থাকে শুধু **অন্ধকার** মুখোমুখি **বসিবার** বনলতা সেন' এই অংশের মধ্য-মিল কবিতার আভ্যন্তরিক অর্থের দিক থেকেও মূল্যবান। যেমন আগের স্তবকে 'চুল **তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার** নিশা'-র পর-পর চারটি মধ্য-মিল আঘাতে-আঘাতে যেন স্তর-পরম্পরাক্রমে আমাদের সুদূর অতীতে নিয়ে গেছে ; কেননা ঐ লাইনটি আমরা পড়ি এভাবে : 'চুল তা-র কবেকা-র অন্ধকা-র বিদিশা-র নিশা।' তেম্নি অন্বয় রক্ষা করেছে কবিতায় উক্ত দীর্ঘ ক্লান্ত যাত্রার সঙ্গে এই কবিতার দীর্ঘ মন্থর চরণাবলি : 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে'। সূচনাপঙক্তির বাইশ মাত্রা এইভাবে পথযাত্রাকেও ফুটিয়ে তুলেছে। বনলতা সেন নামের বনলতা-অংশটি হয়তো কোনো তন্বঙ্গীর আভাস দ্যায়, কবি যার রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন কএকটি রেখায়। কিন্তু সেন-উপাধিধারিণী নাটোর নামক স্হানের অধিবাসিনী হিশেবে কবি তাঁর দয়িতাকে যতোই শরীরী ক'রে তুলতে চেষ্টা করুন-না কেন, তার উপর কেবলি লুণ্ঠিত থাকে এক অভেদ্য রহস্যের বহুস্তর আবরণ। সে হ'য়ে ওঠে স্বপ্ননায়িকা ; এবং বাস্তব থেকে স্বপ্নে উত্তীর্ণ হ'য়ে আমাদের সকলেরই দয়িতা ॥

[১৯৭১]

'মৃত্যুর আগে'

আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষসন্ধ্যায়,
দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল
কুয়াশার ; কবেকার পাড়াগাঁর মেয়েদের মতো যেন হায়
তারা সব ; আমরা দেখেছি যারা অন্ধকারে আকন্দ ধুন্দুল
জোনাকিতে ভ'রে গেছে ; যে-মাঠে ফসল নাই তাহার শিয়রে
চুপে দাঁড়ায়েছে চাঁদ—কোনো সাধ নাই তার ফসলের তরে ;

আমরা বেসেছি যারা অন্ধকারে দীর্ঘ শীত রাত্রিটিরে ভালো,
খড়ের চালের 'পরে শুনিয়াছি মুগ্ধরাতে ডানার সঞ্চার :
পুরোনো পেঁচার ঘ্রাণ ; অন্ধকারে আবার সে কোথায় হারালো !
বুঝেছি শীতের রাত অপরূপ, মাঠে-মাঠে ডানা ভাসাবার
গভীর আহ্লাদে ভরা ; অশথের ডালে-ডালে ডাকিয়াছে বক ;
আমরা বুঝেছি যারা জীবনের এইসব নিভৃত কুহক ;

আমরা দেখেছি যারা বুনোহাঁস শিকারীর গুলির আঘাত
এড়ায়ে উড়িয়া যায় দিগন্তের নম্র নীল জ্যোৎস্নার ভিতরে,
আমরা রেখেছি যারা ভালোবেসে ধানের গুচ্ছের 'পরে হাত,
সন্ধ্যার কাকের মতো আকাঙ্ক্ষায় আমরা ফিরেছি যারা ঘরে ;
শিশুর মুখের গন্ধ, ঘাস, রোদ, মাছরাঙা, নক্ষত্র, আকাশ
আমরা পেয়েছি যারা ঘুরে ফিরে ইহাদের চিহ্ন বারোমাস ;

দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হ'য়ে ঝরেছে দু-বেলা

নির্জন মাছের চোখে ; পুকুরের পারে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ ল'য়ে গেছে তারে ;

মিনারের মতো মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে,
বেতের লতার নিচে চড়ুয়ের ডিম যেন নীল হ'য়ে আছে,
নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বার-বার তীরটিরে মাখে,
খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নার উঠানে পড়িয়াছে ;
বাতাসে ঝিঁঝিঁর গন্ধ—বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে ;
নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে ;

আমরা দেখেছি যারা নিবিড় বটের নিচে লাল-লাল ফল
প'ড়ে আছে ; নির্জন মাঠের ভিড় মুখ দেখে নদীর ভিতরে ;
যত নীল আকাশেরা র'য়ে গেছে খুঁজে ফেরে আরো নীল আকাশের তল ;
পথে পথে দেখিয়াছি মৃদু চোখ ছায়া ফেলে পৃথিবীর 'পরে ;
আমরা দেখেছি যারা শুপুরির সারি বেয়ে সন্ধ্যা আসে রোজ,
প্রতিদিন ভোর আসে ধানের গুচ্ছের মতো সবুজ সহজ ;

আমরা বুঝেছি যারা বহু দিন মাস ঋতু শেষ হ'লে পর
পৃথিবীর সেই কন্যা কাছে এসে অন্ধকারে নদীদের কথা
ক'য়ে গেছে ; আমরা বুঝেছি যারা পথ ঘাট মাঠের ভিতর
আরো-এক আলো আছে : দেহে তার বিকালবেলার ধূসরতা ;
চোখের দেখার হাত ছেড়ে দিয়ে সেই আলো হ'য়ে আছে স্থির :
পৃথিবীর কঙ্কাবতী ভেসে গিয়ে সেইখানে পায় ম্লান ধূপের শরীর ;

আমরা মৃত্যুর আগে কি বুঝিতে চাই আর ? জানি না কি তাহা,
সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে জাগে
ধূসর মৃত্যুর মুখ ; একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিলো—সোনা ছিলো যাহা
নিরুত্তর শান্তি পায় ; যেন কোন্ মায়াবীর প্রয়োজনে লাগে।
কি বুঝিতে চাই আর ?...রৌদ্র নিভে গেলে পাখিপাখালির ডাক
শুনিনি কি ? প্রান্তরের কুয়াশায় দেখিনি কি উড়ে গেছে কাক !

[মৃত্যুর আগে, ধূসর পাণ্ডুলিপি]

এই কবিতায় হর্ষ ও বিষাদ, তমসা ও সৌন্দর্য, নিসর্গ ও আত্মিক অভিজ্ঞতাকে অনির্বচনীয় শরাবের মতো পান করেছেন কবি। জীবনানন্দ, তথা একালের কোনো কবি, বক্তব্যপ্রধান নন ; বক্তব্য তাঁদের রচনাতেও আন্তঃশায়িত, জীবনের সারাৎসার ও অভিজ্ঞতার নির্যাস তাঁরাও ধ'রে দ্যান এতোটুকু আধারে, কিন্তু তা মুক্তাকাশে ডালপালা মেলে রাখে না ভিতরমাটিতে শিকড় ছড়ায় বরং। অর্থাৎ সমস্ত সম্পন্ন হয় একটি আচ্ছাদনের ভিতরে, যদিচ এই আচ্ছাদন নয় বহিঃপ্রসাধন—তা আন্তর মাধুরীরই বহিঃপ্রকাশ। প্রতীক, উপমা, চিত্রকল্প সাধারণত কবিতার ঐ রঙিন আচ্ছাদন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও জীবনানন্দ দাশ—অলংকারমুখর এই দুই কবির অলংকার ব্যবহারের মধ্য দিয়েই উপরের উক্তি অর্থবান হ'য়ে ওঠে : অলংকার সত্যেন্দ্রনাথে ভূষণ, জীবনানন্দে সৃজনেরই অংশ : 'রূপশালী ধান বুঝি/এই দেশে সৃষ্টি/ধূপছায়া যার শাড়ী/তার হাসি মিষ্টি' ('দূরের পাল্লা') ও 'পাড়াগাঁর গায় আজ লেগে আছে রূপশালি-ধানভানা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ' ('অবসরের গান') এই দুই উচ্চারণ বহিরঙ্গত যতো সাদৃশ্যবহই হোক আন্তর মূল্যে আলাদা। কবিতাশরীরে এইভাবে আত্মার পরিচিহ্ন প'ড়ে থাকে।

আটটি স্তবকের আটচল্লিশ পঙক্তির এই কবিতাটি বস্তুত একটি (বা দুটি বলা চলে বড়োজোর) বাক্যে সমাপ্ত। এই দীর্ঘ, জটিল, গ্রন্থিবহুল বাক্য—জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথে—আসলে আগন্তুক জটিলতাকে ধারণ করার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলো : সুধীন্দ্রনাথে পরিচ্ছন্নতা পায় যুক্তিগ্রথিত পরম্পরায়, আর জীবনানন্দের কাব্যশরীরে বাক্যবন্ধেই লেগে থাকে এই জটিলতা। কবির অজস্র কবিতায় ঐ দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্বোত্তরণ দ্রষ্টব্য। 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় ক্রমাগত স্তরপরম্পরাক্রমে এক শবলিত জগৎ উদ্ভাসিত ক'রে-ক'রে সপ্তম স্তবকে কবি তাঁর বক্তব্যের আভাস রেখেছেন, অষ্টম বা শেষ স্তবকে যা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত। সেই বক্তব্য বা বক্তব্যাভাসে পৌঁছোনোর আগে উক্ত শবলিত জগৎ আমাদেরও অতিক্রম ক'রে আসা চাই।

এখানে ছত্রে-ছত্রে স্তবকে-স্তবকে যে-নৈসর্গিক জগৎ রচিত ও উন্মোচিত প্রথমে প্রবেশ করা যাক তার ভিতরে। কএকটি উপমার ব্যবহার লক্ষণীয়। প্রথম স্তবকের একাংশ :

> দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল
> কুয়াশার ; কবেকার পাড়াগাঁর মেয়েদের মতো যেন হায়
> তারা সব;

'নরম নদীর নারী' এই metaphor-এর নদীকে নারীর রূপে দর্শন আসলে একটি প্রাক্তন ও ব্যবহৃত উপমা ; কবির প্রকাশে ও প্রয়োগে নূতন রূপে দ্যোতিত। [১] 'নরম নদীর নারী' কোমল বর্ণ দন্ত ন-এর পর-পর তিনটি প্রযুক্ত অনুপ্রাসে একটি লীলায়িত তরঙ্গিনী সমুদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। কিন্তু নারী-রূপ নদী ব'লেই ক্ষান্ত হচ্ছেন না কবি ; তাকে বিশেষিত করছেন 'কবেকার পাড়াগাঁর মেয়েদের মতো' ব'লে, পরবর্তী অংশবাক্যে। নিসর্গের মধ্য থেকে উপমা চয়ন নৈসর্গিক পরিবেশ রচনার এক সহায়ক। 'রেশমের মতো রোম', 'মিনারের মতো মেঘ' বা 'দেয়ালের মতো মৃত্যু'-র অপেক্ষাকৃত প্রত্যক্ষ ও বর্ণনাময় simile আমাদের আলোচ্য নয় ; (যদিচ মৃত্যুর মতো একটি বিমূর্ত বিষয় প্রাচীরের দৃশ্যরূপে কি-রকম গ্রাহ্য হ'য়ে ওঠে, তা-ও এড়াবার নয় ;) কিন্তু নৈসর্গিক উপমা রচনার বিশেষ প্রয়াস আমরা দেখতে পাবো আরো তৃতীয় স্তবকের নিম্নোদ্ধৃত পঙক্তিতে : 'সন্ধ্যার কাকের মতো আকাঙ্ক্ষায় আমরা ফিরেছি যারা ঘরে' ; এখানেও গোধূলির নীড়াভিমুখী কাকের সঙ্গে আমাদের ঘরে ফেরার তুলনা নৈসর্গিক অর্থেই মূল্যবান। তেমনি স্বতন্ত্র দাম নিয়ে আসে ষষ্ঠ স্তবকের একটি উপমা : 'প্রতিদিন ভোর আসে ধানের গুচ্ছের মতো সবুজ-সহজ', ধানের গুচ্ছের মতো সবুজ-সহজ ভোর আর-একটি প্রাকৃতিক উপমা, যা কেবল নিহিত অর্থেই দ্যুতিমান।

নৈসর্গিক পরিবেশ জাগ্রৎ হয়েছে জীবজগত (পেঁচা, বক, বুনোহাঁস, কাক, মাছরাঙা, বুলবুলি, ইঁদুর, মাছ, চিল, চড়ুই) ও উদ্ভিদজগতের

[১] প্রচলিত উপমা ব্যবহারকৌশলে নবীন রূপায়িত এরকম আরো কবিতাংশ :

ক. আসিয়াছে শান্ত অনুগত
বাংলার নীল সন্ধ্যা—কেশবতী কন্যা যেন এসেছে আকাশে :
['আকাশে সাতটি তারা', "রূ. বা."]

খ. নক্ষত্রের রাতের আঁধারে
বিরাট নীলাভ খোঁপা নিয়ে যেন নারী মাথা নাড়ে
['শব', "মহাপৃথিবী"]

গ. সূর্য অস্তে চ'লে গেলে কেমন সুকেশী অন্ধকার
খোঁপা বেঁধে নিতে আসে—
['১৯৪৬-৪৭', "শ্রেষ্ঠ কবিতা"]

কেশরাশির সঙ্গে অন্ধকারের তুলনা সুপ্রচলিত ; অন্ধকারের সঙ্গে কেশরাশির তুলনাও অপ্রচলিত নয় ; ব্যবহারগুণে হ'য়ে উঠলো অনুচ্ছিষ্ট ও নবীন।

(আকন্দ, ধুন্দুল, ধান, ঘাস, হিজল, বেত, নোনা, বট, সুপারি) উল্লেখে। ইন্দ্রিয়সান্দ্র পরিবেশ রচিত হয়েছে এদের সূক্ষ্ম ও পেলব ব্যবহারেই।

বিশেষণ প্রয়োগে কবির বিশিষ্টতা আরো পরে দ্যোতিত। যদিচ এই কবিতাতেই এরকম অনুপম ও অবাক-করা বিশেষণের প্রয়োগ দর্শনীয়: **পুরোনো** প্যাঁচা (খুব সহজ ও প্রাকৃত : এত সহজ যে এর আগে কবিতায় এর ব্যবহারোপযোগিতার কথাই মনে পড়েনি কারো); **নির্জন** মাছ (এই কবিতারই প্রথম পঙ্‌ক্তির 'নির্জন খড়ের মাঠে' সাধারণ ও প্রত্যাশিত ছবি রচে, কিন্তু নির্জন মাছ আরো দ্যুতিবহ : একাকীত্বের আরো গাঢ় ছবি ফোটায়) [২]; **ধূসর** গন্ধ (গন্ধের উপরে রঙের বিশেষণ প্রয়োগে এটি বিশিষ্ট)।

যে-ইন্দ্রিয়সান্দ্র প্রতিবেশ এই কবিতায় রচিত, তা তৃতীয় স্তবকের একটি পঙ্‌ক্তিবাক্যে অর্থবিগাঢ় : 'শিশুর মুখের গন্ধ, ঘাস, রোদ, মাছরাঙা, নক্ষত্র, আকাশ'—কমা-দ্বারা যোজিত এই মানবিক ও প্রাকৃতিক জিনিশগুলি একটি ইন্দ্রিয়ঘন ভূগোল রচনা করেছে। যে-বিচ্ছিন্ন উদাহরণমালার একত্রনিবেশ কবির উত্তরবর্তী অনেক কবিতায় ফলবান, এখানে তা অনুপস্থিত: 'শিশুর মুখের গন্ধ, ঘাস, রোদ, মাছরাঙা, নক্ষত্র, আকাশ' এরা অন্যোন্য-জড়িত হ'য়ে (অবিচ্ছিন্ন পারম্পর্যে শিশুর মুখের গন্ধ [মানবিক] ঘাস, রোদ, মাছরাঙা [প্রাকৃতিক] নক্ষত্র, আকাশ [প্রাকৃতিক] এক অভিরাম চিত্র-রচয়িতা অথবা স্বয়ং চিত্র) যে-জগৎ নির্মাণ করেছে তার সঙ্গে 'চারিদিকে পামগাছ—ঘোলা মদ—বেশ্যালয়—সেঁকো—কেরোসিন' (নিরঙ্কুশ, সাতটি তারার তিমির) শুধু বহিঃপ্রসঙ্গের দিক থেকে নয়, অন্তর্মূল্যেও স্বতন্ত্র। যেন প্রাক্তন সৌকুমার্য হাত থেকে কঠিন মাটিতে প'ড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে গেলো। ফলত এ হচ্ছে প্রাক্তন জগৎ ছেড়ে অন্য-কোনো জগতে চ'লে আসা। প্রত্যেক কবি-যে আদিকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত পরিক্রমণ ক'রে আসেন নিজের ভিতর দিয়ে একবার, উদ্ধৃতিযুগে মুদ্রিত হ'য়ে আছে সেই বিহারেরই দুই পদচিহ্ন।

চতুর্থ ও পঞ্চম স্তবকদ্বয় যেন দুই হাতে তুলে ধরেছে ইন্দ্রিয়ঘন এক দেশপরিবেশ। স্তবকযুগলে দৃষ্টি-শ্রুতি-স্পর্শের অনেকগুলি বিষয় সমন্বয়ী প্রমূল্য অর্জেছে। প্রতিষঙ্গের ব্যবহার এখানকার বিশেষ-লক্ষণীয় দিক : ১. 'চালের ধূসর গন্ধ' (ধূসর বর্ণবোধক ; গন্ধ ঘ্রাণবোধক ; গন্ধের উপর

[২] আরো পরে কবি লিখেছেন 'নির্জন হাত' (নগ্ন নির্জন হাত, মহাপৃথিবী)।

রঙের বিশেষণ প্রয়োগ করলেন কবি) ; ২. 'পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ' (ঘুমের ঘ্রাণ, অর্থাৎ নিদ্রার গন্ধ ; প্রতিষঙ্গ চেতনায় সম্ভব, ফলত একরকম তন্দ্রাতুর মনোভাব বিভাসিত। দ্বিতীয় স্তবকে অনুরূপভাবেই প্রযুক্ত হয়েছিলো 'পুরোনো প্যাঁচার ঘ্রাণ') ; ৩. 'বাতাসে ঝিঁঝিঁর গন্ধ' ('ঝিঁঝিঁ' পতঙ্গ-বিশেষ, শব্দে তার প্রকাশ ; ঝিঁঝিঁর গন্ধ বলায় একটি নিবিড় বিশেষ অবস্থা সূচিত) ; ৪. 'বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাস' [৩] (বাতাস নির্বর্ণ তথা অদৃশ্য ; তার উপর রঙের প্রয়োগ তাকে জীবিত ও দৃষ্টি-...না, বরং অনুভূতি-গ্রাহ্য ক'রে তুলেছে)। এই স্তবকদ্বয়ে আছে আরো দৃষ্টি-বোধক রঙের প্রসঙ্গ : সবুজ, হলুদ, ধূসর, সোনালি, নীল, নীলাভ ; গন্ধবোধক : চালের ধূসর গন্ধ, ঘুমের ঘ্রাণ, নরম জলের গন্ধ, বাতাসে ঝিঁঝিঁর গন্ধ ; স্পর্শবোধক : রেশমের মতো রোম, মেয়েলি হাতের স্পর্শ। আরো কএকটি ছোটো কিন্তু নিবিড় বিষয় এখানেই শনাক্ত ক'রে দিতে চাই। এই কবিতার অক্ষরবৃত্তিক বাইশ মাত্রা কোথাও-কোথাও দীর্ঘ হ'য়ে নিবিড় নিয়ম থেকে যেন জীবনের মতোই প্রসারিত হ'য়ে গেছে : ১. 'যত নীল আকাশেরা র'য়ে গেছে খুঁজে ফেরে আরো নীল আকাশের তল' ; ২. 'পৃথিবীর কঙ্কাবতী ভেসে গিয়ে সেই খানে পায় ম্লান ধূপের শরীর' ; ৩. 'ধূসর মৃত্যুর মুখ ; একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিলো সোনা ছিলো যাহা—' এর মধ্যেকার ১-সংখ্যক উদ্ধৃতি দীর্ঘ হ'য়ে প্রায় আকাশব্যাপ্তিকেই ধারণ করতে চেয়েছে যেন। জীবনানন্দের কবিতার ভাবাসঙ্গের মতোই তাঁর ছন্দ ও মিলের বিন্যাসও কোনো অতিনিরূপিতকে যেন কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না ; তাই প্রকরণে অতিনিটোল এমন তাঁর কোনো কবিতাই পাওয়া যাবে না ; তাই "রূপসী বাংলা"-র Sonnet sequence ও কেবল অতিদীর্ঘ ও কখনো এলোমেলো মাত্রাবিন্যাসেই কেবল নয়, সনেট-নামক প্রকরণটিকে অগ্রাহ্য ক'রে যায়।—দ্বিতীয় স্তবকের 'মুগ্ধরাত' কথাটি জোৎস্নারাত্রির প্রতিভাস রচনা করেছে ; এবং হ'য়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের 'মধুরাত' বা কীটস-এর 'tender night' ও 'honey'd middle of the night'-এর প্রতিদ্বন্দ্বী।— 'সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে জাগে/ধূসর মৃত্যুর মুখ'—এই অংশবাক্যে

[৩] চিত্রল জীবনানন্দ এমনকি বাতাসকেও বর্ণাঢ্য ক'রে তুলেছেন : 'প্রান্তরের সবুজ বাতাস'। পরবর্তীকালেও : 'ঘাসের উপর দিয়ে ভেসে যায় সবুজ বাতাস/অথবা সবুজ বুঝি ঘাস।' (ভিন্ন কোরাস, সা. তা. তি.) 'লঘু মুহূর্ত' (সা. তা. তি.) কবিতায় লিখেছেন 'ধূসর বাতাস'।

রাঙা কামনার-র বিপ্রতীপে সংস্থাপিত হয় ধূসর মৃত্যু ; কামনা ও মৃত্যু—দুই বিমূর্ততা রঙিন হ'য়ে ওঠে এইভাবে—রঙিন, ও আমাদের কাছে যেন রূপ ধ'রে আসে। এই স্তবকের উত্তরাংশে বিপ্রতীপের সংস্থাপন ঘুরে যায় : তাই রৌদ্র নির্বাপিত হ'লেও বিহঙ্গের কলস্বর বেজে ওঠে, কুয়াশা ভেদ ক'রে উড়ে যায় কাক।

আমরা মৃত্যুর আগে কি বুঝিতে চাই আর ? জানি নাকি আহা,
আলো সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে
জাগে **অন্ধকার**
অন্ধকার ধূসর মৃত্যুর মুখ ; একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিল সোনা
ছিল যাহা **আলো**
অন্ধকার নিরন্তর শান্তি পায় ; যেন কোন্ মায়াবীর প্রয়োজনে লাগে।
অন্ধকার কি বুঝিতে চাই আর...রৌদ্র নিভে গেলে
পাখি-পাখালির ডাক **আলো**
অন্ধকার শুনিনি কি ? প্রান্তরের কুয়াশায় দেখিনি কি উড়ে গেছে কাক !

প্রথম স্তবকমালায় যে-সব বিহঙ্গ ভিড় করেছে উপান্ত্যপঙক্তির উপান্ত্যশব্দ ঐ 'কাক' নিশ্চিতভাবেই তাদের গোত্রজ নয়, ঐ কাক প্রতীকিত। শুধু কাক নয়, শেষ পঙক্তিদ্বয়ের 'রৌদ্র', 'পাখি', 'কুয়াশা', 'কাক' বস্তুত প্রতীকী। 'রৌদ্র নিভে গেলে পাখি-পাখালির ডাক/শুনিনি কি ?' এ তো প্রশ্ন নয়, এ হচ্ছে জবাব ; কিংবা হয়তো প্রশ্নই কিন্তু নিজের কাছে, জীবনমৃত্যুর দ্বন্দ্বক্ষত কবিমানসের কাছে। 'শুনিনি কি'র পরে যে-জিজ্ঞাসাচিহ্ন কবি ব্যবহার করলেন, পরবর্তী অংশবাক্যে তা আর করলেন না : 'প্রান্তরের কুয়াশায় দেখিনি কি উড়ে গেছে কাক' এর পরে তাই ব্যবহৃত হয় বিস্ময়-বোধক চিহ্ন—যে-বিস্ময় আসলে মৃত্যু-অতিক্রমী জীবনেরই বিস্ময়।

কীটস-এর 'Ode to a Nightingle' কবিতার সঙ্গে জীবনানন্দের 'মৃত্যুর আগে' কবিতার আন্তরসাদৃশ্য স্বয়ম্প্রকাশ। (জীবনানন্দের উপর, বিশেষত "ধূসর পাণ্ডুলিপি" কাব্যে কীটস-এর প্রভাব-'Ode to a Ninghtingale' ও 'To Autumn' কবিতার দীর্ঘ প্রভাব দ্রষ্টব্য। 'And gathering swallows twitter in the skies' [To Autumn] ও 'আকাশে পাখিরা কথা কয় পরস্পর' [পাখিরা] সমীপবর্তী।) কীটস-এর 'নাইটিঙ্গেল' ও জীবনানন্দের 'মৃত্যুর আগে'—উভয় কবিতাই আটটি

স্তবকে সম্পূর্ণ। কীটস-এর কবিতার শেষ প্রশ্নদ্বিত্ব জীবনানন্দেও বর্তমান :

> Was it a vision, or a waking dream?
> Fled is that music: Do I wake or sleep?

> কি বুঝিতে চাই আর?...রৌদ্র নিভে গেলে পাখিপাখালির ডাক
> শুনিনি কি? প্রান্তরের কুয়াশায় দেখিনি কি উড়ে গেছে কাক!

“ধূসর পাণ্ডুলিপি” কাব্যগ্রন্থে জীবনানন্দের কবি-হৃদয়ের আলো-অন্ধকারের সুমেরু-কুমেরু স্পর্শ করেছে ‘অবসরের গান’ ও ‘বোধ’ কবিতা-যুগ। ‘অবসরের গান’ কবিতায় শস্যোৎসব বস্তুত কবির হৃদয়োৎসব ; তেম্নি ‘বোধ’ কবিতার ক্ষমাহীন চৈতন্য আর এক প্রান্তপরশী। ‘মৃত্যুর আগে’ কবিতায় উক্ত যুগলকেই ধরেছেন কবি আপন আত্মায়। উত্তরকালে একদিন তবু-নামক একটি অব্যয়কে কেন্দ্রে রেখে পৃথিবীতে থেকে সমর্পণ করেছিলেন স্বপ্নের হাতে নিজেকে : ‘অবসরের গান’ ও ‘বোধ’ কবিতার দুই মেরু থেকে নেমে এসে কবি একদিন বিজন একটি উপত্যকায় দাঁড়িয়েছিলেন। “ধূসর পাণ্ডুলিপি”-র শেষ কবিতা ‘স্বপ্নের হাতে’ সেই বিজন ভূমি! [৪] জীবনানন্দকে একপ্রান্তে স্পর্শ ক’রে রেখেছিলেন মরণস্বামী, ‘দেহে তার বিকালবেলার ধূসরতা’, কিন্তু যেমন ‘মৃত্যুর আগে’ কবিতায় বুনোহাঁস শিকারীর গুলির আঘাত এড়িয়ে দিগন্তের নম্রনীল জ্যোৎস্নার ভিতরে উড্ডীন তেম্নি শরীরে-মানসে বিষাদ মেখেও জীবনানন্দ হর্ষে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন একদিন। দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্বোত্তরণের সাক্ষ্য রয়েছে তাঁর অজস্র কবিতাশরীরে। বিষাদবিমিশ্র হর্ষে এই আত্মিক অভিজ্ঞানকে জীবনানন্দ ‘মৃত্যুর আগে’ কবিতার পাত্রে চাড়িয়ে দিয়েছিলেন প্রথমবার ; এই একটি কবিতায় তাঁর বাণীসারাৎসার গুচ্ছীকৃত রইলো—যেখানে মৃত্যুকে বিস্মৃত হ’য়ে গিয়ে নয়, স্মরণে জ্বেলে রেখেই জীবনপাত্র উচ্ছলিত হ’য়ে উঠেছে ॥

[১৯৭২]

[৪] সংক্ষেপে নকশাটি এরকম ছ’কে ফেলা যায় :

মৃত্যুর আগে

অবসরের গান　　　　বোধ

স্বপ্নের হাতে

'সুচেতনা'

সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ
বিকেলের নক্ষত্রের কাছে ;
সেইখানে দারুচিনি-বনানীর ফাঁকে
নির্জনতা আছে।
এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা
সত্য ;   তবু শেষ সত্য নয়।
কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে ;
তবুও তোমার কাছে আমার হৃদয়।

আজকে অনেক রূঢ় রৌদ্রে ঘুরে প্রাণ
পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মতো
ভালোবাসা দিতে গিয়ে তবু
দেখেছি আমারি হাতে হয়তো নিহত
ভাই বোন বন্ধু পরিজন প'ড়ে আছে ;
পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন
মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে।

কেবলি জাহাজ এসে আমাদের বন্দরের রোদে
দেখেছি ফসল নিয়ে উপনীত হয় ;
সেই শস্য অগণন মানুষের শব ;
শব থেকে উৎসারিত স্বর্ণের বিস্ময়
আমাদের পিতা·বুদ্ধ কনফুশিয়সের মতো আমাদেরো প্রাণ
মূক ক'রে রাখে ;   তবু চারিদিকে রক্তক্লান্ত কাজের আহ্বান।

সুচেতনা, এই পথে আলো জেবলে— এ-পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে ;
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ ;
এ-বাতাস কি পরম সূর্যকরোজ্জবল ;
প্রায় ততদূর ভালো মানব-সমাজ
আমাদের মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে
গ'ড়ে দেবো, আজ নয়, ঢের দূর অন্তিম প্রভাতে।

মাটি-পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে কখন এসেছি,
না এলেই ভালো হ'তো অনুভব ক'রে ;
এসে যে গভীরতর লাভ হ'লো সে-সব বুঝেছি
শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জবল ভোরে ;
দেখেছি যা হ'লো হবে মানুষের যা হবার নয়—
শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।

[সুচেতনা, বনলতা সেন]

জীবনানন্দের মধ্যপর্যায়ী এক প্রতিভূ-কবিতা, এক উজালা গেলাশ চৈতন্যের, 'সুচেতনা', তাঁর কাব্যমহাফিলে। প্রকরণ ও প্রসঙ্গে জীবনানন্দীয় চারিত্র্য খচিত এর ছত্রে-ছত্রে। তৎকালে, এডগর এ্যালান পো-র দ্বারা অধিগত হ'য়েই বুঝি, সম্বোধনাত্মক বাক্যপঙ্ক্তি-দ্বারা সূচিত হয়েছিলো তাঁর কএকটি কবিতা : ১. 'সুরঞ্জনা, আজো তুমি আমাদের পৃথিবীতে আছো' (সুরঞ্জনা); ২. 'সবিতা, মানুষজন্ম আমরা পেয়েছি' (সবিতা) ; ৩. 'সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ' (সুচেতনা) ;—আরো-একটি কবিতা এই অনুষঙ্গজাত মনে হয় : 'তোমার সৌন্দর্য, নারি, অতীতের দানের মতন' (মিতভাষণ)। সবগুলি কবিতাই "বনলতা সেন" কবিতাগ্রন্থে উপস্থিত। কিন্তু 'সুরঞ্জনা', 'সবিতা' ও 'সুচেতনা'—"বনলতা সেন" কবিতাগ্রন্থের এই ত্রয়ী কবিতা একেবারে সমান্তরাল নয় : 'সুরঞ্জনা' ও 'সবিতা' প্রেমকবিতা—যে-প্রেমকবিতা চরাচরের পটভূমিকায় স্থাপিত, যে-প্রেমকবিতা দীর্ঘসময়পরিসরের মধ্য থেকে উত্থিত। বরঞ্চ উক্ত কবিতাদ্বয়ের নিকটাত্মীয় 'বনলতা সেন' কবিতাটি—প্রেম সেখানেও অনন্তের লতার মতো। 'বনলতা সেন', 'সুরঞ্জনা', 'সবিতা', 'মিতভাষণ' ও 'সুচেতনা' : উল্লিখিত এই পাঁচটি কবিতাতেই জীবনানন্দীয় নাবিকবৃত্তি পরিদৃশ্যমান। সমগ্র "বনলতা সেন" কবিতাগ্রন্থেই কবির এই নাবিকচিত্ততা ব'য়ে গেছে। "বনলতা সেন"-এর 'সুদর্শনা' ও 'শঙ্খমালা' কবিতার নিছক প্রেমকেন্দ্র যেন একটু স'রে গিয়ে

নিখিলের আনন্ত্য বিসারেই স্থাপিত হয়েছে প্রেমকেন্দ্র থেকে এতটুকু বিচ্যুত না-হ'য়ে 'সুরঞ্জনা', 'সবিতা', 'মিতভাষণ' ও 'বনলতা সেন' কবিতায়। আবার 'সুচেতনা' কবিতাটিকে আনন্ত্য প্রসারে সাজিয়ে দিয়ে প্রেমকে যেন নিঃশব্দে লুকিয়ে ফেলা হ'লো। সুচেতনা-কে তাই 'সুরঞ্জনা' বা 'সবিতা'-র মতো দয়িতা মনে হয় না।

প্রথম স্তবকে প্রথমত মনে হয় প্রেমের একটু সুরঞ্জন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরই মধ্যে উঁচু হ'য়ে উচ্ছ্রিত হ'য়ে আছে পার্থিব যাবতীয় কল্লোলের ভিতরে নির্জন একটি দ্বীপ। পৃথিবীর রণ-রক্ত মাড়িয়ে ঐ দ্বীপের প্রতি কবিহৃদয় বিনীত ও কৃতজ্ঞ হ'য়ে আছে। দ্বিতীয় স্তবকেই প্রধানভাবে ফুটে বেরোলো অপর আয়তন—সময়চৈতন্য। কবি তাঁর একটি গদ্যরচনায় জানিয়েছেন :

> মহাবিশ্বলোকের ইশারার থেকে উৎসারিত সময় চেতনা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো ; কবিতা লিখবার পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই এ আমি বুঝেছি, গ্রহণ করেছি।

[পৃ ১৪, কবিতার কথা]

"বনলতা সেন" কবিতাগ্রন্থ থেকেই আসলে এই সময়চৈতন্যের ব্যবহার শুরু হয়, আমাদের কথিত কবিতাগুলোর মধ্যেও যা সংগতি সাধন করেছে। 'সুচেতনা' কবিতায় ঠিক 'মহাবিশ্বলোকের ইশারা থেকে উৎসারিত সময়-চেতনা' কাজ করেনি ; ব্যবহৃত বরং সমসময়চৈতন্য—আসন্ন বা দূর ভবিষ্যৎ নির্মাণের স্বপ্নকল্পনায় স্বাক্ষরিত এই কবিতা। জীবনানন্দীয় গ্রন্থিবহুল বাক্যবুননের মধ্যে-মধ্যে গ্রথিত হয় সমকালিক জটিলতা : 'আজকে অনেক রূঢ় রৌদ্রে ঘুরে প্রাণ/পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মতো/ভালোবাসা দিতে গিয়ে তবু/দেখেছি আমারি হাতে হয়তো নিহত/ভাই বোন বন্ধু পরিজন প'ড়ে আছে ;/পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন ;/মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে।' (সুচেতনা, বনলতা সেন)। এই স্তবকটিকে বিভক্ত ক'রে ফেললে কি দেখি ? প্রাণ রূঢ় রৌদ্রে ঘুরছে ; রূঢ় রৌদ্রে ঘুরেও ভালোবাসাশ্রয় দান করতে আকাঙ্ক্ষী, তখনই দেখা গেলো ভালোবাসা যিনি বিতরণে-আকাঙ্ক্ষী তারই হাতে নিহত তাঁর প্রিয়জন ; পৃথিবীর অসুখ ;

তবুও পৃথিবীর কাছে মানুষের ঋণিতা ; কবিমানসের দ্বন্দ্বজটিল দিবারাত্রি এখানে এইভাবে রূপ পায় :

আজকে অনেক রূঢ় রৌদ্রে ঘুরে প্রাণ	অন্ধকার
পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মতো	আলো
ভালোবাসা দিতে গিয়ে তবু	আলো
দেখেছি আমারি হাতে হয়তো নিহত	অন্ধকার
ভাই বোন বন্ধু পরিজন প'ড়ে আছে ;	অন্ধকার
পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন ;	অন্ধকার
মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে।	আলো

‘পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মতো/ভালোবাসা দিতে গিয়ে তবু/দেখেছি আমারি হাতে হয়তো নিহত/ভাই বোন বন্ধু পরিজন পড়ে আছে’ পঙ্‌ক্তিগুচ্ছ স্মরণে আনে আলবেআর কামু-র “ভ্রান্তি”-নাট্যের সেই ভয়নীয় উপসংহার—যেখানে মাতা-ভগ্নি অজ্ঞাতসারে হত্যা ক'রে ফ্যালে আপন পুত্র-ভ্রাতাকে। উপর্যুক্ত নাট্যের মতোই সমকালের দারুণ্য ফুটে বেরিয়েছে মর্মান্তিক ঐ কএকটি ছত্রের ভিতর থেকে। ‘পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন’ পঙ্‌ক্তিতে সূচিত পৃথিবীর অসুস্থতা : এবং সেই আশ্চর্য ও কুশলী জীবনানন্দীয় অব্যয়-চাবি ‘তবু’ যেন খুলে ফেললে পৃথিবীর কাছে তবু মানুষের কৃতজ্ঞতার কৌটো-রক্ষিত গহন দেরাজখানি। তৃতীয় স্তবকে ফিরে এলো আবার সমুদ্রপ্রসঙ্গ। জাহাজ ফসল নিয়ে উপনীত হচ্ছে ; সেই ফসল, দেখা যাচ্ছে, মানুষিক লাশ ; সেই লাশ থেকে ফের কনকরেখা উচ্ছ্রিত। এই স্তবকেও কবির মানস-দ্বন্দ্ব প্রকাশিত :

কেবলি জাহাজ এসে আমাদের বন্দরের রোদে	আলো
দেখেছি ফসল নিয়ে উপনীত হয় ;	আলো
সেই শস্য অগণন মানুষের শব ;	অন্ধকার
শব থেকে উৎসারিত স্বর্ণের বিস্ময়	আলো

কবির অজস্র কবিতায় এই দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্বোত্তরণ দ্রষ্টব্য। বক্ষ্যমাণ কবিতাটিতে এই দ্বন্দ্ব এরকম প্রকাশ্য, যে, এ মনে হয় এমন এক দিন—যেদিন আকাশে-আকাশে চলছে মেঘ ও রৌদ্রের খেলা, একবার মেঘান্ধ হ'য়ে আসে চারদিক, একবার রৌদ্র-উজালা, পরিশেষে ঘটে ‘অনন্ত সূর্যোদয়’। চতুর্থ স্তবক আশাভরসায় উজ্জ্বলিত। ‘সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে—

এ-পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে'—'এই পথে'-র পরেই 'এ-পথেই'-এর প্রত্যয়ী উচ্চারণ চমৎকারিতা জেবলে দ্যায়। এই স্তবকে ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে মানবসমাজ গ'ড়ে দেবার অভীপ্সা প্রকাশিত হ'তেই স্পষ্ট কবিতার শব্দ মাত্রেই কি-রকম প্রতারক। এই একটি নাবিক-শব্দ ভিন্ন অর্থাভাস জাগ্রত করার সঙ্গে-সঙ্গে অনুষঙ্গ শব্দসমুচ্চয়ও অপর অর্থের দ্যোতনা দ্যায়—এই সত্য আমরা টের পেয়ে যাই : সমুদ্র, বন্দর, শস্য—এবং প্রথম পঙক্তির দ্বীপ মুহূর্তে অন্য অর্থের বিভাসন জাগিয়ে দিয়ে যায়। পঞ্চম স্তবকে 'মাটি-পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে কখন এসেছি/না এলেই ভালো হ'তো অনুভব ক'রে-'তে চরম নিরাশা উচ্চারিত ; আলো জ্ব'লে উঠলো অনন্তর : 'এসে যে গভীরতর লাভ হ'লো সে সব বুঝেছি'। শেষ পঙক্তি 'শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়' যেন মানুষের সমস্ত তুচ্ছ-খণ্ড-সামান্য আশানিরাশা এক নিশীথান্তে প্রবল অরুণোদয়ে উদ্ভাসিত-সন্দীপিত হ'য়ে উঠলো। **'শাশ্বত রাত্রি'-র বুকে 'অনন্ত সূর্যোদয়'** সংঘটিত হ'য়ে যেন দুঃখ নিরাশার স্থায়িতার উপর আশা-ভরসার জয়নিশান উড্ডীন হ'লো।

সুচেতনা-ও কি দয়িতা নয় তাহ'লে সুদর্শনা, সুরঞ্জনা, সবিতা-র মতো ? সুচেতনা-ও দয়িতা ; অপ্রাপনীয়া, কিন্তু যার উদ্দেশে আমরা—ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকেরা—চলেছি। সুচেতনা দয়িতা, কিন্তু নারী নয় ॥

[১৯৭২]

'আট বছর আগের একদিন'

শোনা গেল লাসকাটা ঘরে
নিয়ে গেছে তারে ;
কাল রাতে—ফাল্গুনের রাতের আঁধারে
যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ
মরিবার হ'লো তার সাধ।
বধূ শুয়ে ছিলো পাশে—শিশুটিও ছিলো ;
প্রেম ছিলো, আশা ছিলো—জ্যোৎস্নায়—তবু সে দেখিলো
কোন্ ভূত ? ঘুম কেন ভেঙে গেলো তার ?
অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল—লাসকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার।

এই ঘুম চেয়েছিলো বুঝি !
রক্তফেনামাখা মুখে মড়কের ইঁদুরের মতো ঘাড় গুঁজি
আঁধার ঘুঁজির বুকে ঘুমায় এবার ;
কোনোদিন জাগিবে না আর।

'কোনোদিন জাগিবে না আর
জাগিবার গাঢ় বেদনার
অবিরাম—অবিরাম ভার
সহিবে না আর—'
এই কথা বলেছিলো তারে
চাঁদ ডুবে চ'লে গেলে—অদ্ভুত আঁধারে
যেন তার জানালার ধারে
উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা এসে।

তবুও তো পেঁচা জাগে ;
গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
আরেকটি প্রভাতের ইশারায়—অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।

টের পাই যূথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে
চারিদিকে মশারির ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা ;
মশা তার অন্ধকার সঙ্ঘারামে জেগে থেকে জীবনের স্রোত ভালোবাসে।

রক্ত ক্লেদ বসা থেকে রৌদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি ;
সোনালি রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত কীটের খেলা কতো দেখিয়াছি।

ঘনিষ্ঠ আকাশ যেন—যেন কোন বিকীর্ণ জীবন
অধিকার ক'রে আছে ইহাদের মন ;
দুরন্ত শিশুর হাতে ফড়িঙের ঘন শিহরন
মরণের সাথে লড়িয়াছে ;
চাঁদ ডুবে গেলে পর প্রধান আঁধারে তুমি অশ্বত্থের কাছে
একগাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু একা-একা ;
যে-জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের—মানুষের সাথে তার হয়নাকো দেখা
এই জেনে।

অশ্বত্থের শাখা
করেনি কি প্রতিবাদ ?   জোনাকির ভিড় এসে
সোনালি ফুলের স্নিগ্ধ ঝাঁকে
করেনি কি মাখামাখি ?
থুরথুরে অন্ধ পেঁচা এসে
বলেনি কি : 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে
চমৎকার !—
ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার !'
জানায়নি পেঁচা এসে এ-তুমুল গাঢ় সমাচার ?

জীবনের এই স্বাদ—সুপক্ক যবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকেলের—
তোমার অসহ্য বোধ হ'লো ;
মর্গে কি হৃদয় জুড়োলো

মর্গে—গুমোটে—
থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁটে।

শোনো
তবু এ মৃতের গল্প ; কোনো
নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই ;
বিবাহিত জীবনের সাধ
কোথাও রাখেনি কোনো খাদ,
সময়ের উদ্বর্তনে উঠে এসে বধূ
মধু—আর মননের মধু
দিয়েছে জানিতে ;
হাড়হাভাতের গ্লানি বেদনার শীতে
এ-জীবন কোনোদিন কেঁপে ওঠে নাই ;
তাই
লাসকাটা ঘরে
চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।

জানি—তবু জানি
নারীর হৃদয়—প্রেম—শিশু—গৃহ—নয় সবখানি ;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে ;
আমাদের ক্লান্ত করে,
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে ;
লাসকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নাই ;
তাই
লাসকাটা ঘরে
চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।

তবু রোজ রাতে আমি চেয়ে দেখি, আহা,
থুরথুরে অন্ধ পেঁচা অশ্বত্থের ডালে বসে এসে,

চোখ পাল্টায়ে কয় : 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে ?
চমৎকার !
ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার'—

হে প্রগাঢ় পিতামহী, আজো চমৎকার ?
আমিও তোমার মতো বুড়ো হবো—বুড়ি চাঁদটারে আমি
ক'রে দেবো কালীদহে বেনোজলে পার ;
আমরা দু-জনে মিলে শূন্য ক'রে চ'লে যাবো জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার।

[আট বছর আগের একদিন, মহাপৃথিবী]

কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিলো 'কবিতা' পত্রিকার ১৩৪৪ সালের চৈত্র সংখ্যায়। রচনাকাল সম্ভবত এরই সন্নিকট সময়বর্তী। স্থান পেয়েছে কবির মধ্যপর্যায়ী "মহাপৃথিবী" কাব্যগ্রন্থে। শুধু এই পর্যায়েরই নয়, এটি জীবনানন্দের একটি প্রতিভূ-কবিতা। বিষয় ও বিন্যাস—দু-দিক থেকে তার বিচারে অগ্রসর হ'য়ে যাবো আমরা।

কবিতাটি ফেলে এসেছে "ঝরা পালক", "রূপসী বাংলা", "ধূসর পাণ্ডুলিপি" ও "বনলতা সেন"-এর উজ্জ্বল গ্রহ ; এর পরে "সাতটি তারার তিমির", "বেলা অবেলা কালবেলা" ও অন্যান্য অসংকলিত উপান্ত্য কবিতার ধূসর বিশ্ব আসন্ন। পূর্বজ কাব্যগ্রন্থগুলির রোমান্টিক মেদুরতা, উজ্জ্বলতা, দীর্ঘশ্বাসের অন্তিমে যেন বস্তুপৃথিবীর প্রথম মোকাবিলা করলেন জীবনানন্দ "মহাপৃথিবী" কাব্যগ্রন্থে। আগেও দ্বন্দ্ব ছিলো কবিচিত্তে, ছিলো দ্বন্দ্বোত্তরণ ; কিন্তু সে-সব যেন পার্থিব জমির উপরে নয়—মানসের শূন্যাকাশে। বস্তুপৃথিবীর মোকাবিলায় রোমান্টিক কবির দীর্ঘশ্বাস আর বায়ব্য সন্ধানের পরিবর্তে দেখা দিলো জ্বালাময় বিদ্রূপ, আত্মকরুণা, অসমীকরণের উচ্চহাস্য। যে-দ্বন্দ্ব জীবনানন্দের চিরসহচর, এখানে যেন তা পেলো একটি মৃৎভূমিকা ; যে-দোলাচল জীবনানন্দের বহু কবিতায় দ্রষ্টব্য, এখানে রইলো তার অনিবারণ মুদ্রামালা—দোলাচলের জীবনানন্দীয় মীমাংসাও হয়তো।

উপর্যুক্ত মৃৎভূমিকার জন্যে প্রয়োজন পড়লো কাহিনীর—কাহিনীর একটুখানি সূত্রের গায়ে অনেকখানি কল্পনা দানা বেঁধে উঠলো। লিরিক-কবির আত্মোৎসারণকে দমিত রেখে, কিংবা নূতনতর খাতে বইয়ে দিয়ে

জীবনানন্দ লিখেছিলেন কএকটি কাহিনী-আভাসিত কবিতা।[১] তাঁর গল্প-গুচ্ছও তাঁর এই মধ্যপর্যায়ে রচিত। কাহিনীআশ্রিত কবিতায় জীবনানন্দের লক্ষ্য ছিলো জীবনের একটি সাধারণ সত্যে পেঁছোনোর—এবং বক্ষ্যমাণ কবিতার গন্তব্যও অনন্য।

বিষয়টি এক-হিশেবে খুব সাধারণ ও সামান্য। এক আত্মহন্তারককে ঘিরে কবিচিত্তে বিচ্ছুরিত হয়েছে কিছু প্রতিক্রিয়া। কিন্তু এরই মধ্যে জীবনানন্দ প্রবেশ করিয়েছেন অসামান্য অন্তরাখ্যান—সঞ্চার করেছেন গভীরতম অর্থাভাস। মৃত্যুকে ঘিরে জীবনের রহস্যোদ্‌ঘাটনের এরকম সাহিত্য-চেষ্টা বাংলা ভাষায় দেখা যায়নি আর। মরণস্বামী জীবনানন্দের কবিতার এক প্রভু; কিন্তু আর কোথাও তাঁকে এতো তীব্র ও গভীরপ্রোথিত মনে হয়নি। মরণভাবনা, মরণচেতনা, মৃত্যুইচ্ছা, জীবনমৃত্যুর দৈবতনৃত্য : জীবনানন্দের কবিতার এইসব প্রিয় প্রসঙ্গের অতীত হ'য়ে উঠেছে এই মৃত্যু-কেন্দ্রিক মৃত্যুত্তীর্ণ কবিতাটি। কবিতাটি আপাতভাবে মনে হয় না নিটোল ও সুমিত, মনে হয় কি-রকম এলোমেলো ও খাপছাড়া, কখনো মনে হ'তে পারে কবির বক্তব্য অনচ্ছ হয়তো। কিন্তু এই কবিতার গড়ন জীবনের মতোই এলোমেলো, জীবনের মতোই এর এলোমেলোমির মধ্যে কোথাও লুকিয়ে আছে গহন অর্থের জলোৎস। অন্তত এই কবিতাটির বিন্যাস জীবনানন্দের কবিস্বভাবের সঙ্গে জীবনার্থের চমৎকার সালোক্য সংঘটন করেছে। অন্তত এই কবিতায় রোমান্টিক কবির গাঢ় অভিজ্ঞান হ'য়ে উঠেছে গভীর ভাবে শিল্পিত, এই কবিতার নড়বড়ে গঠনের অন্তঃস্থলে শায়িত এক ভিতরজ্যামিতি, এক শিল্পশাসন, এক জীবনাভিজ্ঞান।

সাক্ষ্য পাওয়া যাবে কএকটি কাব্যকুশলতার দীপ্তিমান প্রয়োগে।

কবির আরো অনেক কবিতার মতো এখানেও ব্যবহৃত ক্রমিক পুনরুক্তি। এখানকার বিশিষ্টতা এই, যে, এইসব পুনরুক্তি বা দ্বিতীয়োক্তিগুলি কবিতার সার্বিক সচলতার সঙ্গেই সর্বদা সংযুক্ত। 'আট বছর আগের একদিন' জীবনানন্দের অজস্র কবিতার মতো একরৈখিক নয়—বিবর্তমান বরং। প্রথমবারের উক্তির পর দ্বিতীয়বার যখন একই উক্তি করা হয়, তখন দেখা যায় অপর অর্থের উদ্ভাসন। বিবর্তমান এই কবিতায় এই কুশলতা অসম্ভব সিদ্ধার্থ পেয়েছে। এইভাবে ১১ পঙক্তির

রক্তফেনামাখা মুখে মড়কের ইঁদুরের মতো ঘাড় গুঁজি
আঁধার ঘুঁজির বুকে ঘুমায় এবার

---

[১] 'ক্যাম্পে' (ধু. পা.) ও 'লঘু মুহূর্ত' (সা. তা. তি.) এই ধরনের কবিতা।

এক নৈর্ব্যক্তিক বিশাল পটাকাশ মেলে ধরে ; এরপর ৪৮পঙক্তিতে উক্ত

মর্গে—গুমোটে

থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁটে !

হ'য়ে ওঠে ব্যঙ্গ ও করুণায় আত্মক। প্রথমবার ছিলো তৃতীয় পুরুষে বর্ণনা, দ্বিতীয়বার সরাসরি মন্তব্য। সেজন্যেই দ্বিতীয়বার একই ইঁদুরের সঙ্গে তুলনাই হ'য়ে ওঠে তীক্ষ্ণতর। তেম্নি ১৩ পঙক্তিতে

কোনোদিন জাগিবে না আর

সাধারণ বর্ণনা হিশেবেই গ্রাহ্য। কিন্তু তার পরেই ১৪ পঙক্তিতে পাড় যখন

'কোনোদিন জাগিবে না আর

তখন ঐ উদ্ধৃকমা এক মারাত্মক পরামর্শের সূচনায় পরিণত হয়। তেম্নি ৪২ পঙক্তিতে

থুরথুরে অন্ধ প্যাঁচা এসে
বলেনি কি : 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে ?
চমৎকার !—
ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার !'

মরণোন্মুখ ব্যক্তির কাছে প্যাঁচার জীবনকামী তুমুল গাঢ় সমাচার হিশেবে দেখা দ্যায় ; এবং ৭৬ পঙক্তিতে

তবু রোজ রাতে আমি চেয়ে দেখি, আহা,
থুরথুরে অন্ধ প্যাঁচা অশ্বত্থের ডালে বসে এসে,
চোখ পালটায়ে কয় : 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে ?
চমৎকার !
ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার—'

নায়কের মৃত্যুত্তর প্রাত্যহ জীবনোল্লাসকেই উন্মুক্ত ক'রে দ্যায়। একইভাবে ৬০ পঙক্তির

তাই
লাশকাটা ঘরে
চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।

নারীর প্রণয়, বিবাহিত জীবনের সুখ, আর্থিক সচ্ছলতা—সমস্ত সত্ত্বেও নায়কের স্বেচ্ছামৃত্যু—একটিমাত্র ভয়াবহ মোড়-ফেরা 'তাই' শব্দে চিহ্নিত ক'রে দ্যায় ; এবং ৭৩ পঙক্তিতে

তাই
লাশকাটা ঘরে
চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।

একই শব্দপুঞ্জ ব্যবহৃত হ'লেও সম্পূর্ণ ভিন্ন-ভিন্ন ভঙ্গিতে—ভিন্ন অর্থে প্রতিভাত হয় আমাদের কাছে। কেননা ততোক্ষণে আমরা জেনেছি : কোনো-এক কারণ-দ্বারা কোনো এক বিপন্ন বিস্ময়-দ্বারা নায়ক ছিলো অভিভূত, যা অন্তিমে তাকে নিয়ে গেছে স্বেচ্ছামরণের প্রতি।—এইভাবে আমরা দেখছি : পুনরাবৃত্ত দ্বিতীয়োক্তিগুলি সবসময় কাহিনীর সঙ্গে অগ্রসর হ'য়ে গিয়ে প্রবেশ করছে নূতন—নূতনতর আয়তনে।

মিলবিন্যাসের বিশিষ্ট কুশলটিও, এই কবিতার, লক্ষণীয়। কখনো দুটি মিল, কখনো তিনটি বা চারটি মিল, আবার দু-একটি পঙক্তি নির্মিল থেকে যাচ্ছে : মিলের এই বিন্যাস এই কবিতার বিষয়ের দিক থেকে অর্থদ্যোতক :

১. তারে/আঁধারে ; চাঁদ/সাধ ; ছিলো/দেখিল ; তার/এবার ; বুঝি/গুঁজি ; এবার/আর ; মাছি/দেখিয়াছি ; লভিয়াছে/কাছে ; একা/দেখা ; এসে/ভেসে ; হ'লো/জুড়োলো ; গুমোটে/ঠোঁটে ; শোনো/কোনো ; সাধ/খাদ ; বধূ/মধু ; জানিতে/শীতে ; নাই/তাই ; ঘরে/'পরে ; জানি/সবখানি ; নয়/বিস্ময়।

২. আর/বেদনার/ভার ; জাগে/মাগে/অনুরাগে ; জীবন/মন/শিহরণ ; চমৎকার/এবার/সমাচার ; ভিতরে/করে/ঘরে ; চমৎকার/পার/ভাঁড়ার।

৩. ঘরে ; এসে ; নিরুদ্দেশে ; বিরুদ্ধতা ; ভালোবেসে ; জেনে ; শাখা ; ঝাঁকে ; মাখামাখি।

মিলগুচ্ছ আশ্চর্যরকম সহজ, অনায়াস ও স্বসমৃদ্ধ : পাঠ করার সময় স্রোতের ধারার মতো ব'হে যায় ; ত্রয়ী মিল বা অমিলগুলিও এই স্রোতের উচ্চাবচতার সঙ্গে আশ্চর্যরকম সংযুক্ত ; যেন কবি ছন্দমিলের ভিতর দিয়ে জীবনস্রোতটিকেই ধ'রে দিয়েছেন : 'ছিল/দেখিল', 'মাছি/দেখিয়াছি', 'লভিয়াছে/কাছে', 'হ'লো/জুড়োলো' ইত্যাদি ক্রিয়াপদের এইসব মিলকে কাঁচা বলা যেতো—যদি-না কবির বক্তব্যের মহত্ত্ব ও ভাষাব্যবহারের জীবানানুগ সহজ সচলতা ধ'রে রাখতো, ভ'রে রাখতো এদের। এই কবিতায় একটি মিলও নেই, যা মনে হয় অসহজ বা চেষ্টাকৃত। ত্রয়ী বা ততোধিক মিলগুলি অনেকসময় এই কবিতার অন্তর্গত অর্থের দিক থেকে তাৎপর্যবান ; অন্তত এরকম দুটি মিলগুচ্ছের উল্লেখ আমি করতে চাই :

'কোনোদিন জাগিবে না আর
জাগিবার গাঢ় বেদনার

অবিরাম—অবিরাম ভার
সহিবে না আর'

এই মিলগুলি নিস্তব্ধতার পরামর্শকে ভয়াবহভাবে প্রতিরোধহীন ক'রে তুলেছে ; সঙ্গে কাজ করেছে এই পঙক্তিগুলির ক্রমাগত আ-ধ্বনির অনুলাপ. 'অবিরাম' শব্দটির দু-বার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে জাগরণের অবিচ্ছিন্ন চাপের যন্ত্রণা। নিস্তব্ধতার এই কূট পরামর্শ-যে নায়কের মধ্যে মন্ত্রের মতো কাজ করেছে, তার কারণ এই পরামর্শের ভাষাতেই আছে মন্ত্রের পুনরাবৃত্তির আবেশ : আ-ধ্বনিগুলি (ছোট্টো চার পঙক্তির মধ্যে বারোবার), একই অন্ত্যমিলগুলি (চার পঙক্তিতে একটিমাত্র), শব্দের পুনর্ব্যবহারগুলি (মোট তেরোটি শব্দের মধ্যে ছয়টি শব্দ) ঐ কর্মে হয়েছে সহায়ক। কিংবা যখন বলেছেন কবি :

আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে ;
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে ;
লাশকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নাই ;

তখন 'করে' অন্ত্যমিলের বারংবার প্রয়োগ, 'ক্লান্ত' শব্দের আবৃত্তি জীবনের রুদ্ধশ্বাস অবস্থার পরিচায়ক ; শেষ 'লাশকাটা ঘরে'-র 'ঘরে'-র সঙ্গে পর-পর পাঁচটি মিল (ভিতরে/করে/করে/করে/ঘরে) সম্পন্ন হওয়ার পর যখন পাই 'সেই ক্লান্তি নাই' তখন ঐ মিলবন্ধন থেকে মুক্তি রুদ্ধশ্বাস জীবনের থেকে মুক্তির সমান্তরালে তাৎপর্যবিদ্যুৎ বহন ক'রে নিয়ে আসে। এই কবিতার অমিল পঙক্তিগুলি অনেকরকম মিলের ফাঁকে-ফাঁকে যেন জীবনের অপরিতৃপ্তির ইশারা দিয়ে-দিয়ে গেছে। বিশেষত

অশ্বত্থের শাখা
করেনি কি প্রতিবাদ ? জোনাকির ভিড় এসে সোনালি ফুলের
স্নিগ্ধ ঝাঁকে
করেনি কি মাখামাখি ?

এই ত্রয়ী পঙক্তির অন্ত্যশব্দগুলি (শাখা, ঝাঁকে, মাখামাখি) খুব কাছাকাছি এসেও, মিলের ইঙ্গিতবহ হ'য়েও, সম্পূর্ণ মিলান্ত্য হ'য়ে উঠতে পারলো না ; কেননা ঐ পঙক্তিগুলিতে বর্ণিত নিসর্গও ব্যর্থ হয়েছে মৃত্যুমুখীকে জীবনে

ফেরাতে। শব্দগুলি তাই ব্যর্থ হ'য়ে কাছাকাছি বিচ্ছেদে প'ড়ে থাকে।[২]— মিলবিন্যাসের এ-ধরনের এলোমেলো রীতি জীবনানন্দের বহু কবিতায় লভ্য, সর্বত্র হয়তো এরকম সিদ্ধার্থে নয় ; কিন্তু মিলবিন্যাসের এই স্বকীয় নিয়ম জীবনানন্দের বিশিষ্ট জীবনদৃষ্টিকেও খুলে দ্যায় : মিলবিন্যাসের আত্ম-রীতিতে তাঁরা জীবনদৃষ্টির ব্যাখ্যা সম্ভব।

জীবনানন্দীয় আরো কুশলতা ছড়িয়ে আছে এই কবিতার শরীরে। আছে তাঁর ছন্দব্যবহারের নিজস্ব বিশিষ্টতা : 'মর্গে কি হৃদয় জুড়োলো/ মর্গে গুমোটে' এখানে লক্ষণীয় একই মর্গে শব্দকে দু-রকম মাত্রায় ব্যবহার। আছে জীবনানন্দীয় বিমূর্ত উপমার প্রয়োগ : 'উটের গ্রীবার মতো কোনো-এক নিস্তব্ধতা।' আছে সূক্ষ্ম কারুকাজ : 'বধূ শুয়ে ছিলো পাশে/ শিশুটিও ছিলো ;/ প্রেম ছিলো আশা ছিলো' পঙক্তিদ্বয়ে বধূর সমান্তরালে

[২] মিলকৌশলের লীলার মধ্যে আর একজন আধুনিক কবি মাঝে-মাঝে অর্থ ভ'রে দিয়েছেন : অমিয় চক্রবর্তী। পেশ করা যাক তাঁর দুটি কবিতা :

ক. কিছুই না ব'লে
কী কথা গেলেন তিনি ব'লে
ভগবান বুদ্ধ, হাতে তুলে ধ'রে
পদ্মটি, আলোয় তুলে ধ'রে ॥
[ধর্মতার্কিক ব্রাহ্মণকে একদিন প্রশ্নোত্তরে/দ্বীপাবলী : ঘরে-ফেরার দিন]

খ. বহুদিন বাঁচো অধার্মিক—
মর্মে যদি জানো স্বধার্মিক
আঙুর, নারঙ, কালো জাম,
হ'য়ে আঙুর, নারঙ, কালো জাম ;
যদি খোলা চোখে যোগ করো
ভোরের আলোয় যোগ করো
রাঙা মন
প্রাণে গানে-রাঙা মন ;
খুশি
হ'য়ে দুঃখসুখজয়ী, শুধু, খুশি
জীবনের মধ্যে থেকে
এই সম্পূর্ণ সবার মধ্যে থেকে ॥
[আস্তিক/চলতি : ঘরে-ফেরার দিন]

মিলের জন্যে একই শব্দপ্রয়োগের অভিনবত্ব জয়ী হয়েছে এই কারণে যে মূল অস্তিপ্রসঙ্গের সঙ্গে এ অটুট সংলগ্ন।

প্রেমের, শিশুর সমান্তরালে আশার অবস্থান। এই কবিতার হেমন্ত অবশ্যই প্রতীকসিদ্ধ—বৎসরচক্রের অন্তর্ভূত নয় : 'জীবনের এই স্বাদ—সুপক্ক যবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকেলের—' : এই উচ্চারণের হেমন্ত রিক্ততারও প্রতিভূ নয়, হেমন্তকে জীবনানন্দ যে কখনো-কখনো পরিপূর্ণতার প্রতীকে ব্যবহার করেছেন তারই নজির। আছে বিশেষণ-শব্দের তীব্র-দীপ্র ব্যবহার : 'বিস্ময়'-এর পূর্বে 'বিপন্ন' শব্দটি ব'সেই তো জীবনের সেই নামহীন যাতনাকে চিহ্নিত ক'রে দিয়ে গেলো ; আর জীবনানন্দের প্রিয় অন্ধকার শনাক্ত হ'লো কএকটি বিশেষণশব্দে ('অদ্ভুত আঁধার', 'যূথচারী আঁধার', 'প্রধান আঁধার')। কএকটি প্রাকৃত শব্দব্যবহারও বিশিষ্ট জীবনানন্দীয় ঘ্রাণে ভরপুর : 'ঘুঁজি', 'থ্যাঁতা', 'হাড়হাভাতে' কবিতায় আজকের দিনের পক্ষেও বিস্ময়কর ব্যবহার। আর তাঁর সেই বহুব্যবহৃত অতিপ্রিয় অতিপ্রয়োজনীয় অব্যয় শব্দটি : তবু। আমরা তো জানি এই অব্যয়শব্দটি জীবনানন্দের কবিতার একটি মূল্যবান চাবি-শব্দ। হতাশায় অধিকৃত তাঁর মানসকে ঐ শব্দটি বারংবার জাগ্রত ক'রে গেছে। 'তবু' শব্দের দুটি অসাধারণ প্রয়োগ আছে ; আমাদের পক্ষে, এই কবিতার পক্ষে জরুরি 'তবু' শব্দের দুটি অসামান্য কিন্তু জীবনানন্দস্বভাবী ব্যবহার। নিস্তব্ধতা-কর্তৃক স্বেচ্ছা মৃত্যুর দারুণ কূট বুদ্ধি দানের পরেই :

> তবুও তো প্যাঁচা জাগে ;
> গলিত স্থবির ব্যাঙ আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
> আরেকটি প্রভাতের ইশারায়—অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।

'তবু'র পথ বেয়ে কেবল প্যাঁচা আর ব্যাঙ আসেনি, পর-পর এসেছে মশা, মাছি, ফড়িং, জোনাকি, দোয়েলের জীবনস্রোত—মৃত্যুর নিরুদ্দেশে। আরেকবার এই কবিতার অন্তিমে মৃত্যুর পাহাড়ের উপর দিয়ে ব'য়ে গেলো জীবননদীর স্রোতোল্লাস : লাশকাটা ঘরে আত্মহন্তারকের চিৎ শয়নের বর্ণনার পরেই :

> তবু রোজ রাতে আমি চেয়ে দেখি, আহা,
> থুরথুরে অন্ধ প্যাঁচা অশ্বত্থের ডালে বসে এসে...

এই কবিতার নাট্যীভবনও দ্রষ্টব্য। মূল চরিত্র আত্মহন্তারক ; আর একজন আছেন কথক, অর্থাৎ কবি : আছে প্যাঁচা, ব্যাঙ, মশা, মাছি, ফড়িং, জোনাকি ইত্যাদির সপ্রাণ প্রাকৃতিক কিন্তু অনৈসর্গিক পরিপার্শ্ব। বস্তুত কথক যিনি, তিনি আছেন নেপথ্যে : মূল ঘটনা থেকে দূরে, হয়তো আট বছরের এপারে। মৃত আত্মহন্তারককে ঘিরে আছে কিছু সজীব

প্রাণী—তার চার পাশের বিশ্ব আশ্চর্য জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে—কিন্তু কোনো জীবিত মানুষ নেই, কোনো মানুষ নয়। নেপথ্যনিবাসী দূরপ্রবাসী কথক-রূপী জীবিত মানুষটি যেন মৃত্যু থেকে শিক্ষা নিয়ে সঞ্চয় করছে বেঁচে-থাকার যন্ত্রণাদায়ী রশদ, আবশ্যিক অভিজ্ঞান। এই অভিজ্ঞান অর্জনের জন্যেই হয়তো ভিতরে-ভিতরে আট বছরের সময়স্রোত পেরিয়ে আসা ছিলো প্রয়োজনীয়। আট বছরের ব্যবধানে শ্রোতা-কবির মানসে আর অব্যবহিতির চাপ নেই, আছে অনিবারণের সম্মুখীন হওয়ার স্বস্থ সমাধানের আবহ।

কেন ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো আত্মহন্তারকের? অথবা তার কী দীর্ঘ-কাল বিনিদ্রায় কেটেছে? তাই কি নিস্তব্ধতা তাকে পরামর্শ দিয়েছিলো: জেগে-থাকার গাঢ় নির্বিরাম ব্যথাভার তাকে বহন ক'রে যেতে হবে না আর? যে-বিষাদ আর বিনষ্টির সূচনা হয়েছিলো "ঝরা পালক"-এ, "ধূসর পাণ্ডু-লিপি"-তে তা জীবনের মহাভার হ'য়ে চেপে বসেছিলো:

১. আলো-অন্ধকারে যাই—মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়—কোন এক বোধ কাজ করে!
স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়!
আমি তারে পারি না এড়াতে
সে আমার হাত রাখে হাতে;
সব কাজ তুচ্ছ হয়,—পণ্ড মনে হয়,
সব চিন্তা—প্রার্থনার সকল সময়
শূন্য মনে হয়,
শূন্য মনে হয়!

[বোধ, ধূ. পা.]

২. এখানে চকিত হ'তে হবে নাকো,—ত্রস্ত হ'য়ে পড়িবার নাহিক সময়;
উদ্যমের ব্যথা নাই,—এইখানে নাই আর উৎসাহের ভয়!
এইখানে কাজ এসে জমে নাকো হাতে,
মাথার চিন্তার ব্যথা হয় না জমাতে!
এখানে সৌন্দর্য এসে ধরিবে না হাত আর,—
রাখিবে না চোখ আর নয়নের 'পর;
ভালোবাসা আসিবে না,—
জীবন্ত কৃমির কাজ এখানে ফুরায়ে গেছে মাথার ভিতর!

[অবসরের গান, ধূ. পা.]

৩. মৃত্যুরে বন্ধুর মত ডেকেছি তো,—প্রিয়ার মতন !—
চকিত শিশুর মত তার কোলে লুকায়েছি মুখ ;
রোগীর জ্বরের মত পৃথিবীর পথের জীবন ;
অসুস্থ চোখের 'পরে অনিদ্রার মতন অসুখ;

[জীবন, ধূ. পা.]

৪. ক্লান্তির পরে ঘুম,—মৃত্যুর মতন শান্তি চাই।

[প্রেম, ধূ. পা.]

৫. আমার জীবনে কোনো ঘুম নাই
মৎস্যনারীদের মাঝে সব চেয়ে রূপসী সে নাকি
এই নিদ্রা ?

[এই নিদ্রা/সংযোজন, ধূ. পা.]

এইসবের পরে "বনলতা সেন"-এর প্রেমকবিতাগুচ্ছের মধ্যে বোধ-জর্জরিত হালাক্ চিত্তের একটি আবেদন আকুল হ'য়ে উঠেছিলো : 'সর্বরিতা, কবে তুমি আসিবে বলো তো।' (স্বপ্নের ধ্বনিরা : ব. সে.) এই সবেরই পথ বেয়ে স্মৃতির ভিতর পুঞ্জিত হ'য়ে এসে ফ'লে উঠলো 'আট বছর আগের একদিন'।

জীবনানন্দের কবিতায় শিশুশোভন রূপকথাশোভন কবিশোভন এক বিস্ময় বারংবার বিভাসিত। এর একটি দৃষ্টান্ত তাঁর অমানবের মুখে কথা বসানোর মধ্যে প্রাপ্তব্য : এই রীতির দরোজায় গিয়েছেন কবি বারংবার। মৃত্যুর আগে আত্মহন্তারককে কূট পরামর্শ দিয়েছিলো 'উটের গ্রীবার মতো কোনো-এক নিস্তব্ধতা এসে।' নিস্তব্ধতার এই উক্তি, যাকে একেবারে উদ্ধর্কমা দিয়েই চিহ্নিত ক'রে দিয়েছেন কবি, সে-ও স্বপ্নের ভাষা, মায়া-আবহের উচ্চারণ। কবির এই বিশিষ্ট প্রকাশনিয়ম আরো দ্রষ্টব্য :

১. বিকেল বলেছে এই নদীটিকে : 'শান্ত হতে হবে—'

[শিরীষের ডালপালা, ব. সে.]

২. 'কেন মৃত্যু খোঁজো তুমি ?' চাপা ঠোঁটে বলে দূর কৌতুকী আকাশ।
'তোমারি নিজের ঘরে চ'লে যাও'—বলিল নক্ষত্র চুপে হেসে—
'অথবা ঘাসের 'পরে শুয়ে থাকো আমার মুখের রূপ ঠায় ভালোবেসে'

[নিরালোক, মহা.]

৩. বলিল অশ্বত্থ ধীরে : 'কোন দিকে যাবে বলো—
তোমরা কোথায় যেতে চাও ?'

[বলিল অশ্বত্থ সেই, মহা.]

৪. প্রান্তরের শুষ্ক ঘাসে যে-সবুজ বাতাসের আশা
একদিন বলেছিলো, 'আবার করিব আমি অমৃত সঞ্চয়—'

[শান্তি/তিনটি কবিতা, মহা.]

জীবনানন্দের আরো সুপ্রচুর কবিতার মতো এই কবিতার পরিসরেও দ্রষ্টব্য জীবজগতের উদ্‌ঘাটন। প্যাঁচা, ব্যাঙ, মশা, মাছি, ফড়িং, দোয়েল, ইঁদুর প্রভৃতি প্রাণী এতোকাল কবিতার বিশ্বে ছিলো উপেক্ষিত ; জীবনানন্দ যেমন সাধারণ্যের ভাষাকে কবিতার জাতে তুলে দিয়েছেন, তেমনি এইসব অবহেলিত পাখি-পতঙ্গের স্থান ক'রে দিয়েছেন কবিতায়। খুব অবলীলাক্রমেই জীবনানন্দ প্রাক্তন কবিতার প্রচল ভেঙে চ'লে গিয়েছেন। উপেক্ষিত এইসব পাখি-পতঙ্গের সৌন্দর্যের সঙ্গে সমীকরণ ঘটেছে বারংবার :

১. অলস মাছির শব্দে ভ'রে থাকে সকালের বিষণ্ন সময়,
পৃথিবীরে মায়াবীর নদীর পারের দেশ ব'লে মনে হয় ;

[অবসরের গান, ধূ. পা.]

২. খড়ের চালের 'পরে শুনিয়াছি মুগ্ধরাতে ডানার সঞ্চার :
পুরানো পেঁচার ঘ্রাণ ;—

[মৃত্যুর আগে, ধূ. পা.]

৩. ধানের সোনার ছড়া নাই মাঠে—ইঁদুর তবুও যাবে নাকো ঘরে
তাহার রূপালি রোম জ্যোৎস্নায় একবার সচকিত ক'রে যায় মন

[শীত শেষ, ধূ. পা.]

কখনো এদের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছেন সত্যের সারাৎসার—নিসর্গের ছবি হ'য়ে আসেনি, এসেছে সত্যোদ্‌ঘাটক হিশেবে বক্তব্যবাহক হিশেবে ; যেমন আলোচ্য কবিতায় পাখি ও পতঙ্গ মিলে একটি সত্যের দিকেই নির্দেশ করে :

১. গলিত স্থবির ব্যাঙ আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
আরেকটি প্রভাতের ইশারায়—অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।

২. মশা তার অন্ধকার সঙঘারামে জেগে থেকে জীবনের স্রোত
ভালোবাসে।

৩. রক্ত ক্লেদ বসা থেকে রৌদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি।

৪. দুরন্ত শিশুর হাতে ফড়িঙের ঘন শিহরণ
মরণের সাথে লড়িয়াছে।

৫. জোনাকির ভিড় এসে সোনালি ফুলের স্নিগ্ধ ঝাঁকে
করেনি কি মাখামাখি ?

তাঁর কবিতার বাঘ ও হরিণ কবিপ্রসিদ্ধিকে অনুসরণ ক'রে ভয়ংকর ও সৌন্দর্য/কোমলতা/সংবেদনার প্রতীক। কিন্তু প্যাঁচার প্রতীক তাঁরই

সৃষ্ট। অনেকসময় অবশ্য তাঁর প্যাঁচা নিসর্গের অংশ :

১. কাঁঠাল-শাখার থেকে নামি
পাখনা ডলিবে পেঁচা এই ঘাসে

[কোথাও চলিয়া যাব, রূ. বা.]

২. পেঁচার ধূসর ডানা সারারাত জোনাকির সাথে কথা কয়

[একদিন পৃথিবীর রূ. বা.]

৩. তখন হয়তো মাঠে হামাগুড়ি দিয়ে পেঁচা নামে—

[কুড়ি বছর পরে, ব. সে.]

কিন্তু কখনো-কখনো প্যাঁচার মধ্যে তিনি সঞ্চার করেছেন অপরতর অর্থ-দ্যুতি :

১. সে-সব পেঁচারা আজ বিকালের নিশ্চলতা দেখে
তাহাদের নাম ধ'রে যায় ডেকে-ডেকে

[অবসরের গান, ধূ. পা.]

২. শালের গলির ফাঁকে মাঠ ছুঁয়ে হামাগুড়ি দিয়ে
উড়েছে রাত্রির পেঁচা—এ জীবন যেন দুটো মৃদু পাখা : তার
'পরে ভর ;

[তাই শান্তি/ধূ. পা./সংযোজন]

এই কবিতার থরথরে অন্ধ প্যাঁচা, প্রগাঢ় পিতামহী, মহাসময়ের প্রতীক। আত্মহন্তারকের মৃত্যুর পরেও সে রোজ অশ্বত্থের ডালে বসে এসে, গায় প্রবহমান গান। তার এই নির্বিকার সত্তা বহমান মহাসময় বা মহা-জীবনের প্রতীক ধ'রে রাখে।[৩] মানুষহীন জীবজগতকে তিনি যতো সজীব-ভাবে অঙ্কন করুন-না কেন, মানুষকে তিনি আলাদা এক মহিমায় সমুত্তীর্ণ করেছেন। প্যাঁচা-ব্যাঙ-মশা-ফড়িঙের জীবনঘনিষ্ঠতার (বর্ণনার) পরেও আত্মহন্তারক তবু অশথগাছের প্রতি চ'লে যায় 'যে-জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের—মানুষের সাথে তার হয় নাকো দেখা/এই জেনে।' এ অংশটি তাৎপর্যভরা : এখানেই তিনি মানুষকে পাখি-পতঙ্গ থেকে পৃথক ক'রে দিলেন ; মানুষ পাখি-পতঙ্গের মনোহীন জীবন পাবে না। 'ঘুঘুদের শাদা ডানা—নীল রাত্রি—কমলারঙের মেঘ—সমুদ্রের ফেনা রোদ—হরিণের বুকে বেদনার/নীরব আঘাত ;/এরা প্রশ্ন করে নাকো : ইহারা সুন্দর

[৩] এ এক হিশেবে রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের কোনো দুর্ঘটনার পরে উদাসীন ও নির্বিকার নিসর্গের সঙ্গে তুলনা পেতে পারে। কিন্তু জীবনানন্দের প্যাঁচা হয়তো অতোটা উদাসীন নয়, কেননা সে জীবিতকে ক্রমাগত প্রাণসঞ্জীবনী হাস্য হেনে যাচ্ছে।

শান্ত—জীবনের উদ্‌যাপনে সন্দেহের হাত/ইহারা তোলে না কেউ আঁধারে আকাশে।/ইহাদের দ্বিধা নাই—ব্যথা নাই—চোখে ঘুম আসে।' (এই নিদ্রা : ধূ. পা., সংযোজন)। প্যাঁচা-ব্যাঙ-মশা-ফড়িং-জোনাকি এদেরই অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু মানুষের যে-জীবন, সে তো আলাদা ; কেননা তার আছে মন : বিপন্ন বিস্ময়। তাই প্রেম-কীর্তি-সচ্ছলতার সমস্ত প্রাপ্তির পরেও কেউ-কেউ রজনী যাপন করে বিনিদ্রায়, কাউকে লোভায় 'একগাছা দড়ি', তীক্ষ্ণ ব্লেড কি শীতল পিস্তল।

এই কবিতায় মৃত্যুঅতিক্রমী জীবনের জয়গাথা গীত ; কিন্তু জীবনের বিপন্ন বিস্ময়কে স্মরণে জেলে রেখেই। 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় মৃত্যুকে মনে জাগ্রত রেখেই যেমন জীবনের প্রদীপ জ্বালানো হয়েছে, তেমনি এই কবিতায় জীবনের বিস্ময়ের মহান বিপদকে মনে রেখেই জীবনের আরতি ধ্বনিত। জীবনবন্দনার এ কোনো সরল উচ্চারণ নয়, যেমন দেখেছি জীবনানন্দের পূর্বজ বহু কবিতায় ; জটিল অরণ্য পেরিয়ে আসতে হয়েছে এই প্রমত্ত আয়তনে ; এই বোধ ও চৈতন্য একালের মানুষের —একালের মানসের। এই কবিতায় আছে সেই বিরল জিনিশ, শিল্পে যাকে বলে অভিজ্ঞতা ॥

[১৯৭৩]

তৃতীয় খণ্ড

প্র ব ন্ধ

....

১

জীবনানন্দ দাশ, কবি, একান্তভাবে কাব্যনিমজ্জিত হ'য়েও কিছু মননমূলক নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধ-যে কবিতা-বিষয়ক হবে, এ তো একরকম ধ'রে নেওয়াই যায়। প্রায় তাঁর আত্মচারিত্রিক কাব্য "ধূসর পাণ্ডুলিপি"র সমসময় থেকেই কবিতা লেখার ফাঁকে-ফাঁকে কবিতা-বিষয়ক তাঁর কিছু ভাবনা-ধারণা লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর পরে "কবিতার কথা" নামে কবির কবিতা-প্রাসঙ্গিক পনেরোটি প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এছাড়া তাঁর আরো কিছু প্রবন্ধ আছে সাহিত্য, সমাজ বা আত্মস্মৃতিমূলক। তাহ'লেও মোটামুটি এই প্রবন্ধসমষ্টিতেই রূপ ধ'রে আছে তাঁর কবিতা-বিষয়ক ভাবনাবলি। এই প্রবন্ধগ্রন্থ ১৩৪৫ থেকে ১৩৬০—এই ষোলো বছর ধ'রে লেখা ;—তাঁর কবিতাসৃষ্টিরও মুখ্য কাল এটি। "বনলতা সেন", "মহাপৃথিবী" ও "সাতটি তারার তিমির"-এর অধিকাংশ কবিতা এই সময়-পর্যায়ে লেখা। অর্থাৎ, এইসব নিবন্ধ জীবন ব্যেপে কবি যে-কাব্যচিন্তা করেছেন, তারই সমাহৃত প্রকাশ।

২

অন্তত পাঁচটি প্রবন্ধে বাংলা কবিতা মুখ্য আলোচ্য তাঁর : 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা', 'উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য', 'কবিতার আত্মা ও শরীর', 'বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ', ও 'অসমাপ্ত আলোচনা'। অন্য প্রবন্ধসমূহে স্বাভাবিকভাবেই বাংলা কবিতা- তথা সাহিত্য-প্রসঙ্গ প্রায়ই এসেছে।

স্বাভাবিকভাবেই তাঁর আলোচনার অন্যতম কেন্দ্রনাভি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের উপর জীবনানন্দ অন্তত দু'টি আলোচনা লিখেছি-

লেন,[১] অন্তত তিনটি কবিতা[২]। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মৃত্যুর আগে' কবিতা প'ড়ে একটি মন্তব্য করেছিলেন,[৩] তাঁকে দুটি পত্র লিখেছিলেন[৪] : জীবনানন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সংস্পর্শ এটুকুই। রবীন্দ্রনাথ, তাঁর বিবেচনায়, 'লোকোত্তর পুরুষ', রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা 'আধ্যাত্মিক সত্যে বিশ্বাসী ও বুর্জোয়া সভ্যতার প্রতীক' হিশেবে দেখেছেন তাঁদের তিনি বলেছেন অসাহিত্যিক এবং বাংলা সাহিত্য রবীন্দ্রকেন্দ্র থেকে কখনোই চ্যুত হবে না—এই তাঁর বিশ্বাস। তবে রবীন্দ্রনাথকে সব সময়ই তিনি বিচার করেছেন পরবর্তী কাব্যপ্রচেষ্টার পটভূমিকায়। এবং ফলত রবীন্দ্রনাথের কিছু-কিছু সীমা সম্বন্ধে তিনি সচেতন এবং আমাদের চেতনা জাগিয়ে দিয়েছেন :

১. তাঁর প্রকৃত কাব্যলোকে সমাজ-ও-ইতিহাসচেতনা একটা নির্ধারিত সীমায় এসে তারপর মন্থর হয়ে গেছে। আধুনিকের কবিতা সেই কিনারার থেকে সূত্র তুলে নিয়ে যে ধরনের সমাজ ও ঐতিহ্য বোধের আশ্রয় গ্রহণ করেছে তার পরিচয় রবীন্দ্রকাব্যে পাওয়া যায় না বললে উক্তি অসঙ্গত হবে, কারণ রবীন্দ্রকাব্য বিরাট সমুদ্রের মতো—কিন্তু তাঁর শেষ জীবনের কবিতায়ও—'পুনশ্চ', 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থেও—এই জিনিষ রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান স্মরণীয় বিষয় নয় বলে কবি এর দিকে সম্পূর্ণ

---

[১] রবীন্দ্রনাথের উপর কবির একক প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথ', প্রকাশিত হয় 'দৈনিক স্বরাজ'-এর সাময়িকী-পৃষ্ঠায়, ১৩৫৪ সালের ২৪শে শ্রাবণ সংখ্যায়। লেখাটি আমি দেখিনি।

[২] দ্র. জীবনানন্দ দাশের কবিতা : আবদুল মান্নান সৈয়দ।

[৩] মন্তব্যটি এই : 'জীবনানন্দ দাশের চিত্ররূপময় কবিতাটি আমাকে আনন্দ দিয়েছে।'

[৪] জীবনানন্দকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি দুটি এই :

ক. তোমার কবিত্বশক্তি আছে তাতে সন্দেহ মাত্র নেই—কিন্তু ভাষা প্রভৃতি নিয়ে এত জবর্দস্তি কর কেন বুঝতে পারিনে। কাব্যের মুদ্রাদোষটা ওস্তাদীকে পরিহসিত করে। বড়ো জাতের রচনার মধ্যে একটা শান্তি আছে যেখানে তার ব্যাঘাত দেখি সেখানে স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। জোর দেখানো যে জোরের প্রমাণ তা নয় বরঞ্চ উল্টো।

খ তোমার কবিতাগুলি পড়ে সুখী হয়েছি। তোমার লেখায় রস আছে, স্বকীয়তা আছে এবং তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে।

মনঃক্ষেপ করতে উদাসীন এবং এর প্রকাশ তাঁর কাব্যে রবীন্দ্র প্রতিভার স্বাক্ষর থেকে বঞ্চিত।

[রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা, পৃ. ২১]

২. 'কল্লোলে'র লেখকেরা মনে করেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ অনেক সার্থক কবিতা লিখেছেন—কিন্তু তিনি যাবতীয় উল্লেখ্য বিষয় নিয়ে কবিতা লেখবার প্রয়োজন বোধ করেন না—যদিও তাঁর কোনো কোনো কবিতায় ইতিহাসের বিরাট জটিলতা প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে হয় ; তিনি ভারত ও ইউরোপের অনেক জ্ঞাত ও অনেকের মতে শাশ্বত বিষয় নিয়ে শিল্পে সিদ্ধিলাভ করেছেন, কিন্তু জ্ঞান ও অন্তর্জ্ঞানের নানারকম সংকেত রয়েছে যা তিনি ধারণা করতে পারেননি বা করতে চাননি।

[অসমাপ্ত আলোচনা, পৃ. ১১২]

১৩৪৮ ও ১৩৬০—বারো বছর আগে-পরে লেখা এই প্রবন্ধদ্বয় থেকে মোটামুটি স্পষ্ট, যে, এই ছিলো জীবনানন্দের রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ধারণা। আমরা জানি তাঁর নিজের কবিতায় 'সমাজ-ও-ইতিহাসচেতনা' একটা পর্যায়ে এসে কাজ করেছে— এবং তাঁর কবিতায় 'জ্ঞান ও অন্তর্জ্ঞানের নানারকম সংকেত' তিনি ধারণ করতে চেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত যে-সব বাঙালি কবি-সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে তিনি টুকরো-খুচরো মন্তব্য ক'রে গেছেন, তাঁরা হচ্ছেন : দেবেন্দ্রনাথ সেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত[৫], নজরুল ইসলাম[৬], সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, আলাওল, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, লালন ফকির, রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বর গুপ্ত, প্রমথ চৌধুরী, বিদ্যাপতি, ভারতচন্দ্র প্রমুখ। ছিন্ন উল্লেখ করেছেন কএকটি বই সম্পর্কে : রবীন্দ্রনাথের "পুনশ্চ", "রোগ-শয্যায়", "আরোগ্য", "বলাকা" ; ব্যাসের "মহাভারত" ; শিবনাথ শাস্ত্রীর "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" ; সুধীন্দ্রনাথ দত্তের "উত্তর-ফাল্গুনী"। দুটি কবিতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা এবং তা থেকে তাঁর কাব্য চিন্তার নির্দেশ : সুধীন্দ্রনাথের 'উটপাখী' (কবির ভাষায় এখানে প্রাপ্তব্য

[৫] সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে কবির অগ্রন্থিত পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিলো 'অনন্ত' পত্রিকায়।

[৬] নজরুল সম্পর্কে কবির অগ্রন্থিত পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো।

'স্মরণীয়তর বাণী') ও সমর সেনের 'নাগরিক' ('স্মরণযোগ্য বাক্যসমষ্টি')।

জীবনানন্দ যখন উচ্চারণ করেন সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় মহৎ কবির নয়—সুকবির শব্দ-ও ছন্দ-প্রেমই দেখিয়েছেন, তখন তাঁর উক্তির যথার্থতায় কোনো সন্দেহ থাকে না আমাদের। কিন্তু কবি যখন বলেন, 'বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার উদয়ের আগে রবীন্দ্রকাব্যের আওতার থেকে বেরিয়ে পড়বার দু-একটা প্রয়াস দেখা গিয়েছিল। সে ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবি হচ্ছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।' (পৃ. ২০) তখন আমরা কেবল বিস্ময় বোধ করি। রবীন্দ্র-মুক্তির কাব্যেতিহাসে সত্যেন্দ্রনাথই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য? তাহ'লে নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার, ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মহিমা কোথায়? এই তিনজনই রবীন্দ্রকাব্যলোক থেকে বেরিয়ে আসার উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, যে-প্রচেষ্টা সত্যেন্দ্রনাথের চেয়ে সন্দেহাতীতভাবেই অনেক বেশি তীব্র ও আত্মচেতন। আর এঁদের সম্বন্ধে জীবনানন্দ-যে ওয়াকিফহাল ছিলেন না, তা নয়—তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "ঝরা পালক"-এ সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাবের সঙ্গে-সঙ্গে নজরুল[৭]-মোহিতলাল[৮]-যতীন্দ্রনাথের প্রভাব ছিলো পুরোমাত্রায় সক্রিয়। যাই হোক, সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে জীবনানন্দের উক্ত বিবেচনা আমরা অযথার্থ ব'লেই মনে করি।

আধুনিক কবিদের সম্পর্কে জীবনানন্দের মতামত বরং অনেক বেশি লক্ষ্যভেদী। তাঁর অসামান্য অন্তর্দৃষ্টিবলে তিনি ঠিকই বুঝে নিয়েছিলেন; যে, আধুনিক কাব্যান্দোলন 'রবিকাব্যলোকের বিপক্ষে ঠিক নয়, রবীন্দ্রসৃষ্ট সাহিত্যস্বভাব ও সময়স্বভাবের বিরুদ্ধে।' অমিয় চক্রবর্তীর প্রকরণ-বিচিত্রতা, বুদ্ধদেব বসুর 'মানুষ ও প্রকৃতির নিরন্তর উৎকর্ষ-পরিবর্তনের পথে' পরিক্রমা, প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ভূগোল ও মানুষের ইতিহাসে' লিপ্ত থাকা, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'নিরাশাকরোজ্জ্বল চেতনা'—সমস্তই তিনি খুব যথার্থভাবে চিহ্নিত করেন[৯]। সুধীন্দ্রনাথের কবিতাকে—মনে হয়—তিনি সবচেয়ে মূল্য দিতেন; লিখছেন কবি: সুধীন্দ্রনাথ 'আধুনিক বাংলা কাব্যের সবচেয়ে বেশি নিরাশাকরোজ্জ্বল চেতনা'; লিখছেন:

[৭] বিশদ আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য এই বইএর 'জীবনানন্দ ও বাংলা কবিতা' প্রবন্ধভূক্ত 'জীবনানন্দ ও নজরুল' অংশটি।

[৮] বিশদ আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য এই বইএর 'জীবনানন্দ ও বাংলা কবিতা' প্রবন্ধভূক্ত 'জীবনানন্দ ও মোহিতলাল' অংশটি।

[৯] 'উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য' প্রবন্ধে বিষ্ণু দে-র নাম না-দেখে আমাদের অবাক লাগে। জীবনানন্দ কি বিষ্ণু দে-র মনন-হৃদয়শীল কবিতাকে বুঝে উঠতে কিংবা স্বীকার ক'রে নিতে পারেননি?

'আধুনিক সাহিত্যের প্রায় বারো আনা তথাকথিত প্রাগ্রসর কবিতার চেয়ে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা বেশি প্রবীণ ; তার নিজের এষণার কবিতালোকে তিনি আধুনিক প্রায় সকল কবির চেয়েই বেশী আন্তরিক নন কি?'

জীবনানন্দ প্রচারধর্মীমর্মী কবিতায় বিশ্বাস করেন না, যেমন 'অর্থহীন অসন্তোষে বা দুর্বল বিদ্রোহের অভিমানে' পূর্ববর্তী বড়ো কবিকে ডিঙিয়ে যাওয়ায় আস্থা নেই তাঁর। তাঁর প্রতিটি কবিতার মুক্তি আসবে 'বিশুদ্ধ' কবিতার পথ ধ'রেই। 'কল্পনাপ্রতিভা'কে জীবনানন্দ সর্বাধিক মর্যাদা দিতেন, তার অভাবে জন্ম নেয় যে-নিঃসার বুদ্ধিজীব কবিতা তাকে কবি আমল দ্যাননি, কবিতায় 'বিশুদ্ধ রসের অবতারণা'ই আকাঙ্ক্ষা ছিলো তাঁর। 'গদ্যপ্রায় পদ্যছন্দ বা গদ্যছন্দ' অবলম্বন ক'রে চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে যে-সংখ্যাহীন পদ্যের বান ডেকেছিলো, তার সম্বন্ধে তিনি স্পষ্টত বিরূপতা প্রকাশ করেছেন।

'আধুনিক' তথা তাঁর সমকালীন বাংলা কবিতা সম্বন্ধেই তাঁর মতামত সবচেয়ে পরিষ্কারভাবে জ্ঞাপন করেছেন তিনি। আধুনিক বাঙালি কবিরা বোদলেআর, ইএটস, এলিঅট, পাউন্ড-এর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন—মালার্মে, পল ভেরলেন, রঁসার-এর কাছ থেকে। জীবনানন্দ আধুনিক বাংলা কবিতা সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত জানাননি অবশ্য—নিরাসক্ত দৃষ্টি তাঁর। প্রতীকী, সুররিয়্যালিস্ত ও অন্তর্জ্ঞানী কএকটি দিক আধুনিক কবিতায় এসেছে—এটুকুই বলেছেন তিনি। তাঁর মতে 'প্রকৃত সিদ্ধি' বৈষ্ণব কবিতা ও রবীন্দ্রনাথেই দ্রষ্টব্য। একটি লেখায় তিনি পরবর্তী বাংলা কাব্যেতিহাসে দীর্ঘকবিতা ও মহাকবিতা ও কবিতানাট্য সৃষ্ট হ'তে পারে ব'লে জানিয়েছেন, যেহেতু তাঁর সমকালে ওসবের চর্চা বিশেষ হয়নি। কবিতায় লোকশিক্ষা বা সমাজশিক্ষাকে তিনি আমল দ্যাননি।

'কবিতার আত্মা ও শরীর' নিবন্ধেই একমাত্র জীবনানন্দ কাব্যপ্রকরণ বিষয়ে কিছু চিন্তা লিপিবদ্ধ করেছেন। ছন্দ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য : 'কবিপ্রেরণার তারতম্য অনুসারে ছন্দের জাতি নির্ণয় হয়।' ভাবাক্রান্ত কবির 'চোখও অনুভব করে যেন ছন্দবিদ্যুৎ'। পয়ার (জীবনানন্দ বুঝিয়েছেন অক্ষরবৃত্তকে) আধুনিক বাংলা কবিতায় সর্বব্যাপী। আধুনিক বাংলা কবিতায় '২২ ও ২৬ এবং ক্বচিৎ তার চেয়েও দীর্ঘতর মাত্রার' অক্ষরবৃত্ত ব্যবহার করেছেন কবিরা।[১০] যতিপ্রান্তিক ছন্দ লুপ্ত হ'য়ে গিয়ে বাংলা

[১০] জীবনানন্দ নিজেই অনুরূপ ব্যবহার সর্বাধিক করেছেন :

ক. আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষসন্ধ্যায় [২২]

কবিতায় প্রবহমানতা একচ্ছত্র হ'য়ে উঠেছে। কবি ঠিকই বলেছেন : আজকের কবিরা মুক্তক অক্ষরবৃত্ত, মুক্তক স্বরবৃত্ত ও মুক্তক মাত্রাবৃত্তেই লেখেন সাধারণত। বলেছেন তিনি : 'কবিতার ছন্দ যদি যুগের নাড়ীমূলের নির্দেশ দান করে : তাহ'লে মাত্রাবৃত্ত মুক্তকে প্রচুর কবিতা আশা করা যায়।'[১১] স্বরবৃত্ত বা প্রাকৃত বাংলার ছন্দ-যে অব্যবহৃত র'য়ে গেলো, সেটিও ইঙ্গিত করেছেন তিনি।[১২] স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও একসময় স্বরবৃত্ত ছন্দ প্রসঙ্গে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। তবু, তাহ'লেও, রবীন্দ্রনাথ নিজে স্বরবৃত্ত ছন্দকে প্রধানত লঘুচাপল্যেই ব্যবহার করেছেন। জীবনানন্দ তাঁর জীবনের শেষ দিকে মানবপ্রাকৃতিক সিরিআস দিক এই কবিতায় ফোটাতে চেয়েছিলেন—কিন্তু, মনে হয়, এই ছন্দ তাঁর স্বভাবের ঠিক অনুকূল ছিলো না।

কোনো বিদেশি কবি বা কাব্যধারা সম্পর্কে আলাদা ও একক্‌ কোনো সন্দর্ভ রচনা করেননি জীবনানন্দ, তবে কবিতা আলোচনার বিভিন্ন প্রসঙ্গে অনেক ভিন্‌দেশি কবিশিল্পীর নাম এসেছে : ইএট্‌স্‌, এলিঅট্‌, শেক্‌স্‌-পীয়র্‌, মালার্মে, ভের্‌লেন্‌, র‍ঁসার্‌, বোদলেআর্‌, পাউন্ড, অডেন, কামিংস, হার্ডি, হাউ্‌সম্যান্‌, সিট্‌ওএল্‌, ডে লুইস্‌, স্পেণ্ডার, ম্যাক্‌-নীস্‌, আলেক্‌জাণ্ডার পোপ, দান্তে, সোফোক্লেস, ইসকাইলাস, হোমর, হক্স্‌লি, হেমিংওএ, কোএসলার, ইশারউড্‌, ব্লেক, রিলকে, ভিলো, ডান্‌, কীট্‌স্‌, ওঅর্ডস্‌ওঅর্থ্‌, ড্রাইডেন্‌, জনসন্‌, পেটার, ল্যাম, গ্যয়টে, আর্নল্ড, শেলি, কোলরিজ, টলস্টয় প্রমুখ। কএকজন কবির নাম করেছেন যাঁদের কাছ থেকে গ্রহণ ক'রে আধুনিক বাঙলা কবিতা ঋদ্ধ হয়েছে—রবীন্দ্রনাথকে ছেড়ে বাঙালি কবিরা শরণ নিয়েছিলেন এঁদের একদিন : বোদলেআর, ইএট্‌স্‌, এলিঅট্‌, পাউন্ড, মালার্মে, ভের্‌লেন্‌, র‍ঁসার প্রমুখ। এলিঅট্‌-এর "ওএস্টল্যান্ড" সম্পর্কে তাঁর মত : 'বিশেষ সময়-চিহ্নের ছাপ তার উপর এমন জাজ্জ্বল্যমান যে তা আজ না হোক কাল

খ. যত নীল আকাশেরা র'য়ে গেছে খুঁজে ফেরে
আরো নীল আকাশের তল [২৬]
[মৃত্যুর আগে. ধূ. পা.]

[১১] মুক্তক মাত্রাবৃত্তে লেখা নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' ও 'ধূমকেতু' (অগ্নি বীণা) কবিতাদ্বয় এই উক্তির আলোয় বিচার করা যেতে পারে।

[১২] এই পরীক্ষা থেকেই বোধহয় কবি "বেলা অবেলা কালবেলা"-র দশটি কবিতা লিখেছিলেন স্বরবৃত্ত ছন্দে।

অন্তত ফিকে হয়ে যাবে।' কামিংস ('অবান্তর চাতুরী'), অডেন-এর 'মেমোরেবল স্পীচ'কে স্বীকার করেননি তিনি।

৩

জীবনানন্দ দাশের গদ্যভাষা তাঁর কাব্যভাষার মতোই একান্ত নিজস্ব ; এবং তাঁর গদ্যভাষা ও কাব্যভাষা অসমান্তরাল। দীর্ঘ বাক্য গড়নে তাঁর বিশিষ্টতা, দীর্ঘ ও জটিল, নানারকম সংশয়ে ও জিজ্ঞাসায়, আবর্তে ও ঘূর্ণিতে ঠেকে-ঠেকে এগিয়ে যায়। এর মধ্যে চলতি রীতিই প্রশ্রয়িত, সে-ও আবার জীবনানন্দের নিজস্ব বাকভঙ্গির অনুসারী। একটি উদ্ধার করা যাক :

> এখন আমি আর একটা কথা বলতে চাই খানিকটা অত্যুক্তি করেই যেন, অথবা যা অত্যুক্তি নয়—আমার কাছে অন্তত সত্য বলে মনে হয় : কাব্যের ভিতর লোকশিক্ষা ইত্যাদি অর্ধনারীশ্বরের মতো একাত্ম হয়ে থাকে না ; ঘাস, ফুল, বা মানবীর প্রকট সৌন্দর্যের মতো নয় : তাদের সৌন্দর্যকে সার্থক করে কিন্তু তবুও সেই সৌন্দর্যের ভিতর গোপনভাবে বিধৃত রেখা উপরেখার মতো যে জিনিষগুলো মানবী বা ঘাসের সৌন্দর্যের আভার মতো রসগ্রাহীকে প্রথমে ও প্রধানভাবে মুগ্ধ করে না—কিন্তু পরে বিবেচিত হয়—অবসরে তার বিচারকে তৃপ্ত করে।
>
> [কবিতার কথা, কবিতার কথা : জী. দা.]

মোহিতলালে এরকম দীর্ঘ বাক্য এতো বেশি দেখা না গেলেও তাঁর জটিল গদ্যরীতি মনে প'ড়ে যায় আমাদের :

> সকল প্রতিবেশ প্রভাব জয় করিয়া, দেশ ও কালের সকল অনিত্য প্ররোচনা অস্বীকার করিয়া, তিনি এক নিরুদ্দেশ সাধনাতীর্থের অভিমুখে চলিয়াছিলেন বটে—পথের পথ-সংকট অপেক্ষা দূর দিগন্ত-বলয়ের রহস্য-সীমা তাঁহাকে অধিকতর আকুল করিত বটে, কিন্তু তিনি যে-দেশে যে-সমাজে জন্মিয়াছিলেন তাহার অশুচি অবস্থা তাঁহার আত্মমর্যাদাবোধ আঘাত করিত, তাঁহার সেই অতিশয় দৃপ্ত ও স্বতন্ত্র আত্মিক সাধনায় বিঘ্ন ঘটাইত ; বাংলার সেই নবজাগরণের যেক্ষণে এবং যে-পরিবারে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল তাহাতে তাঁহার ভাব-জীবনের স্বাতন্ত্র্যবোধ যতই প্রখর হোক, এ অস্বস্তি হইতে তাঁহার অব্যাহতি ছিল না।
>
> [রবীন্দ্রকাব্যের কবি-পুরুষ, সাহিত্য-বিতান : মো. ম.]

রবীন্দ্রনাথের গদ্যের মতো এখানে উপমা-উৎপ্রেক্ষার ছড়াছড়ি থাকে না—যেখানে আছে, সেখানে তা জীবনানন্দের মুদ্রা-চিহ্নিত, তাঁর কবিতার মতোই নির্বস্তুক উপমা, নির্বস্তুক উৎপ্রেক্ষা :

১. জীবনের সমস্যা ঘোলা জলের মূষিকাঞ্জলির ভিতর শালিকের মত স্নান না করে বরং যেন করে আসন্ন নদীর ভিতর বিকেলের শাদা রৌদ্রের মতো ;

২. আমার জীবনের ভিতর তা আরো খানিকটা জ্ঞান বীজের মতো ছড়াতে পারে, আমার অনুভূতির পরিধি বাড়িয়ে দিতে পারে, আমার দৃষ্টি-স্থূলতাকে উঁচু মঠের মতো যেন একটা মৌন সূক্ষ্মশীর্ষ আমোদের আস্বাদ দিতে পারে ;

৩. ...তথাকথিত সভ্যতা কোনো এক দারুণ হস্তীজননীর মতো যেন বুদ্ধিস্খলিত দাঁতাল সন্তানদের প্রসবে-প্রসবে পৃথিবীর ফুটপাত ও ময়দান ভরে ফেলেছে...

১৩৪৫ সালের এই লেখায় কিছু উপমা-উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার থাকলেও, উত্তর-কালে তাঁর গদ্যলেখায় উপমা-উৎপ্রেক্ষা ক'মে এসেছে। কিন্তু বাক্যগড়নের জটিলতা, গ্রন্থিময়তা কোনো সময়ই কমেনি। জীবনানন্দের কাব্যভাষাতেও এই জটিল গ্রন্থিলতা :

মৃত্তিকার ওই দিক আকাশের মুখোমুখি যেন শাদা মেঘের প্রতিভা ;
এই দিকে ঋণ, রক্ত, লোকসান, ইতর, খাতক ;
কিছু নেই—তবুও অপেক্ষাতুর ;
হৃদয়স্পন্দন আছে—তাই অহরহ
বিপদের দিকে অগ্রসর ;
পাতালের মতো দেশ পিছে ফেলে রেখে
নরকের মতন শহরে
কিছু চায় ;
কী যে চায়।

[নাবিকী, সাতটি তারার তিমির]

৪

পনেরোটি সন্দর্ভের এই একটিমাত্র সংগ্রহ থেকেই এ তথ্য পরিষ্কার নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে আসে, যে, জীবনানন্দ দাশ রবীন্দ্রোত্তর কবিতায় শুধু নয়—প্রবন্ধ-ধারারও এক বিশিষ্ট মননবিদ, অন্যতম প্রধান কারুশিল্পী। তাঁর কাব্য-

বিবেচনা তাঁর একান্ত নিজস্ব : সৎ ও জটিল ও সাহসী। তাঁর নিজস্ব কবিতার বিচারে অতিমূল্যবান তো বটেই—কেননা এর দ্বারা আমরা কবি জীবনানন্দকেও শনাক্ত ক'রে নিতে পারি তাঁর আপন আয়তনে, মিলিয়ে নিতে পারি তাঁর কবিতার অনেকরকম কূটকুশলতা, ভিতরকার অনেক গেরো খুলে যেতে পারে, অনেক জট রূপান্তরিত হ'তে পারে উন্মোচিত জ্যোৎস্নায়। এসব লেখা একই সঙ্গে দামি সাধারণ কাব্যভাবনাশীল প্রবন্ধ হিশেবেই : এর মধ্যে অনেক বীজবন্ত বিশ্বাস ডানা মেলেছে, অনেক তরু ডালপালা, অনেক বিবেচনা কুঁড়ি ফুল ও মঞ্জরী হিশেবে উজ্জ্বলন্ত। এই প্রবন্ধগুচ্ছে আধুনিক বাংলা কবিতার এক অক্ষর চিন্তাংশ— এক অমর ভূমি ও ভিত্তির স্থাপনা। আকাডেমিক বা অধ্যাপকি ধরনের প্রবন্ধ লেখেননি কবি—এই প্রবধগুচ্ছে ফুটে বেরোচ্ছে তাঁর চিন্তার আভা, তেজ, জোশ—তাঁর ভাবনার বিশিষ্ট প্রণালী। তিরিশের প্রধান কবিবৃন্দ যে মনীষার ও উপলব্ধির দিক থেকেও ছিলেন সেকালের প্রধান পুরুষ, জীবনানন্দ দাশের "কবিতার কথা" প্রবন্ধগ্রন্থটি তার এক চিরোজ্জ্বল প্রমাণপত্র ॥

[১৯৭৩]

ছোটো গল্প

জীবনানন্দ দাশের কবিতাকে যদি দুই স্থূল অংশে বিভক্ত ক'রে নেওয়া যায়, তাহ'লে দেখা যাবে তার একাংশ নিসর্গপ্রধান, অপরাংশ মানবমুখ্য। জীবনের প্রথমাংশে নিসর্গই ছিলো প্রধান হ'য়ে, শেষাংশে এসেছে মানুষ। প্রথমাংশের প্রতিনিধি যদি হয় "রূপসী বাংলা"—যেখানে মানুষ প্রায় নেই, তবে দ্বিতীয়াংশের অনুকল্প "মহাপৃথিবী"—যেখানে মানবমনস্কতাই মুখ্য স্থান দখল ক'রে রেখেছে। তাহ'লেও এই দুই অংশের কোনোটিই সম্পূর্ণত নিসর্গহীন বা অমানবিক নয় ; বরং মানুষকে তিনি বরাবর নিসর্গের পটে স্থাপন ক'রে কিংবা নিসর্গের অংশে নিযুক্ত ক'রে দেখেছেন। বস্তুত, নিসর্গ ও নারী : কবিতার এই দুই শাশ্বতীর কাছে জীবনানন্দ প্রথম থেকেই সম্পূর্ণ সমর্পণ করেছিলেন নিজেকে। কিন্তু নিসর্গ ও নিসর্গখচিত অপরাপর জিনিশ যেমন তাঁর কাছে অবিকল এক থাকেনি, তেমনি তাঁর নারী-ধারণাও বদলেছে। তাঁর নিসর্গ একাধারে মোহিনী ও ভয়াল ; যেমন তাঁর মানুষ একাধারে চারু ও খারাপ। তাঁর হাঁস-বক-হরিণেরা ক্রমাগত শিকারে পরিণত হয় ;—এদের মধ্যে ক্রমাগত মানবাত্মা সঞ্চার করেন তিনি। কিন্তু মধ্যপর্যায় থেকে যেন মানুষকে তিনি সরাসরি দেখতে চাইলেন—তাকে, তার ধুলো-মাখা পটভূমি সমেত। ততো দিনে তাঁর কবিতার কেন্দ্রও গ্রাম থেকে শহরে স'রে এসেছে।

জীবনানন্দের গল্পগুচ্ছ এই দ্বিতীয় পর্যায়েই রচিত—যখন মানুষকে তিনি সামনা-সামনি মোকাবিলা করতে চাইলেন, অবতীর্ণ হ'লেন শহরের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে, সময়ের সঙ্গে ঝগড়ায়। কিন্তু আমরা-যে এক অবশ্যম্ভাবীর খাদ্য, মরণের অপ্রতিকার্য শিকার—নিয়তিময় এই বোধ ও চৈতন্য জীবনানন্দে আপ্রথমঅন্তিমা প্রবহমান। তাঁর গল্প আলোচনাসূত্রে সেইসব কবিতার প্রসঙ্গ অনিবার্যপ্রায়—যা কাহিনী-আভাসিত ও নিয়তিচৈতন্যময় ; —কেননা তাঁর গল্পগুচ্ছ তারই পরবর্তী পদচারণ। মনে প'ড়ে যায় 'ক্যাম্পে' (ধূ. পা.) কবিতাটি, ভয়নীয় উপসংহার যার সংরচন করে, 'বসন্তের

জ্যোৎস্নায় ওই মৃত মৃগদের মতো/আমরা সবাই।' মনে প'ড়ে যায় রেখায়-রেখায় তৈরি একটি কবিতা, 'শিকার' (ব. সে.) : 'একটা অদ্ভুত শব্দ।/নদীর জল মচকাফুলের পাপড়ির মতো লাল।/আগুন জ্বললো আবার—উষ্ণ লাল হরিণের মাংস তৈরি হ'য়ে এলো।' মনে প'ড়ে যায় 'বলিল অশ্বত্থ সেই' (মহা.) কবিতার অশ্বত্থের মারাত্মক উক্তি, 'যেখানেই যাও চ'লে, হয় নাকো জীবনের কোনো রূপান্তর ;/এক ক্ষুধা এক স্বপ্ন ব্যথা বিচ্ছেদের কাহিনী ধূসর/ম্লান চুলে দেখা দেবে যেখানেই বাঁধো গিয়ে আকাঙ্ক্ষার ঘর।' কিংবা সেই বহুখ্যাত 'আট বছর আগের একদিন' (মহা.) কবিতার 'কোনো-এক বিপন্ন বিস্ময়'-এর দারুণ অন্তঃতাড়না। কাহিনী-আভাসিত এইসব কবিতারই পরবর্তী ধাপ তাঁর গল্পগুচ্ছ—গল্প-মাধ্যমে যেতে গিয়ে তাঁকে আরো বাস্তবতাঘনিষ্ঠ হ'তে হয়েছে অবশ্য।

তাঁর এ পর্যন্ত প্রাপ্ত বা প্রকাশিত গল্পের সংখ্যা তিন : 'ছায়ানট', 'গ্রাম ও শহরের গল্প', ও 'বিলাস'।[১] সম্ভবত আরো-কিছু গল্প-উপন্যাস তিনি রচনা করেছিলেন। 'গ্রাম ও শহরের গল্প' ১৯৩৬ সালে রচিত ; অন্য দুটি গল্পও এরই কাছাকাছি সময়পরিসরে লেখা ব'লে মনে হয়।

'ছায়ানট' নিবিড় ছোটোগল্প। চরিত্রগুলি—রেবা, নায়ক (যার নাম জানতে পারি না আমরা), মাসি, কবি, ডাক্তার কএকটি রেখার সমষ্টি। 'ছায়া-নট' বিশ্বাসভঙ্গের গল্প। নায়ক ভালোবাসায় উন্মুখ, ভালোবাসার যন্ত্রণায় —ভালোবাসা-ঘৃণার মিশোল যন্ত্রণায়। নায়ক ও রেবার একত্রবাস হয়তো অবৈধ, কিন্তু তাদের ভালোবাসায় চিড় ধরবার ঘটনা দিয়েই কাহিনী শুরু : খুব সূক্ষ্ম ঘৃণার বিদারণরেখায় যার সূচনা, ক' পৃষ্ঠার পরেই তা পৌঁছে যায় রেবা ও ডাক্তারের প্রণয় তথা রেবা ও নায়কের বিশাল বিচ্ছেদে। দম-বন্ধ সেই খাঁচা—যা নায়কের হৃৎপিঞ্জরে নির্মিত—ভেঙে ফেলে বেরিয়ে গিয়ে রেবা খুশি ; নায়কও দম-বন্ধ সম্পর্ক থেকে বৃহৎ আকাশী আলোয় ফিরে গিয়ে খুশি—নায়কের হর্ষ খুব সরু (মনস্তত্ত্বের এক আশ্চর্য নিয়মে সিদ্ধ)—এক বৃহৎ বেদনার পটভূমিদেশে। এই গল্প গভীরভাবে মনস্তত্ত্বসম্মত, মনস্তত্ত্বের খুব সূক্ষ্ম ও নিপুণ রেখায় অঙ্কিত, মানসের গলিঘুঁজি থেকে আকাশ অবধি আস্তৃত। লেখক-যে প্রেমেন্দ্র মিত্র-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমকালীন, এই গল্প প'ড়ে তা বোঝা যায়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের চোখে এই মিথুন-সমীক্ষিত গল্প কএকটি 'সংকেত-বিন্দু'র যোগফল।[২] চিত্রশিল্পে

[১] "জীবনানন্দ দাশের গল্প"। প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৭৯। ভাবনা, কলকাতা।
[২] প্রেমেন্দ্র মিত্র স্বয়ং সংকেতবিন্দুময় গল্প লিখতে অভ্যস্ত। যখন তিনি মারাত্মক

যেমন পয়েণ্টালিজম, কএকটি বিন্দুর সমাহারে ছবি আঁকা, তেমনি 'ছায়ানট' কএকটি রেখায়-রেখায় আঁকা। বাক্যগুলো জীবনানন্দ-শোভন বৃহৎ, জটিল বা দূরান্বিত নয়—ছোটো-ছোটো, কাটা-কাটা। এই গল্প থেকে জীবনানন্দের কবিতার একটি কুশলতা খুলে যায় ; তাঁর সব কবিতাই বিশ্লেষণাত্মক নয়—কোনো-কোনো কবিতা রেখায়-রেখায় আঁকা : দ্রুত, অস্থির, উত্তেজিত রেখায় আঁকা। কএকটি লাইন :

রেবা বললে, 'ঘুমিয়ে পড়েছে।'
মিনিটখানেক সব চুপচাপ।
তারপর চুমোর শব্দ...
দু'জনে উসখুস করছে।
শেষে সব চুপ।
অন্ধকারে একা ঘরটা ঠাণ্ডা মেরে গেছে।
এ বীভৎস না সুন্দর!
বুঝে উঠতে পারছি না।
রেবাকে ডেকে এনে তার মুখের দিকে তাকাচ্ছি।
পেয়েছি, পেয়েছি, ভরসা পেয়েছি।

[ছায়ানট]

তুলনীয় :

একটা অদ্ভুত শব্দ।
নদীর জল মচকাফুলের পাপড়ির মতো লাল।
আগুন জ্বললো আবার—উষ্ণ লাল হরিণের মাংস তৈরি হয়ে এলো।
নক্ষত্রের নিচে ঘাসের বিছানায় ব'সে অনেক পুরোনো শিশির-ভেজা গল্প।

সিগারেটের ধোঁয়া ;
টেরিকাটা কয়েকটা মানুষের মাথা :
এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক—হিম—নিস্পন্দ নিরপরাধ ঘুম।

[শিকার, ব. সে.]

উপর্যুক্ত দুটি অংশই রেখাঙ্কিত, অনেক অব্যক্তে ভরা ; কেবল প্রথমটি

যৌনতার গল্পও লেখেন, তখনও তাকে 'ক'টি সংকেত-বিন্দুর বাইরে ছড়াতে' দেন না। যেমন : তাঁর 'সাপ' গল্পটি।

গদ্যভাষা, দ্বিতীয়টি কাব্যভাষা। জীবনানন্দের কবিতার সঙ্গে এই গল্পের বিষয়ের সম্বন্ধও অব্যবহিত নয়। আমাদের কি মনে প'ড়ে যায় না জীবনানন্দের সেই ভয়াবহ সত্য-উক্তি 'অবৈধ সঙ্গম ছাড়া সুখ/...নেই' (এইসব দিন রাত্রি, শ্রে. ক.)। উনবিংশ শতাব্দীর শান্তিকল্যাণের শোভাসীমা থেকে জীবনানন্দরা-যে চ'লে এসেছিলেন অন্য এক গ্রহবলয়ে, এখানে রয়েছে তার দারুণ পাঞ্জার ছাপ। যে-ঘৃণা ও অবিশ্বাস মধ্যপর্যায়ী জীবনানন্দকে দখল করেছিলো, এই গল্পটি তারই পরিচায়ক। এই ঘৃণা ও অবিশ্বাসের গায়ে এক-ফোঁটা হৃদয়রক্তও লেগে আছে যেন—একটি দীর্ঘশ্বাস এর ভিতরে কোথাও থমকে আছে যেন।

'গ্রাম ও শহরের গল্পে'র নায়িকা শচীও অবিশ্বাসিনী। সোমেনকে সে তার শরীর ব্যবহার করতে দিয়েছিলো; আরো অনেক পুরুষ-বন্ধুকেও দিয়েছিলো হয়তো: যাদের মধ্যে আছে সুবিমল, অরুণ, বিজয় ও শংকর। প্রকাশ, শচীর স্বামী, স্ত্রীর এ-সব বিষয় জানে না, তা নয়। এই শচী তার বান্ধবী নির্মলাকে চিঠি লিখতে গিয়ে এমনকি নিজেই লেখে, 'বাস্তবিক, পৃথিবীতে বোধসম্পন্ন মেয়েমানুষ এত কম—'। সোমেন, আর্টিস্ট, খেয়ালি ও বেপরোয়া, শচীর এক-কালের প্রেমিক; বোঝা যায়: কবির সহানুভূতি তার প্রতি ধাবিত। প্রকাশ, জীবন-ব্যবসায়ে অক্লান্ত, জীবনের বাজারের পথে যে সর্বজয়ী সর্বজনপ্রিয় বাজনা বাজিয়ে চলেছে, তার মধ্যেও কাজ ক'রে গেছে এক-ধরনের ঘৃণা, স্ত্রী ও সোমেনের প্রতি ঈর্ষা সন্দেহের বীজ রুয়ে পার হ'য়ে গেছে ফের। সোমেন ও প্রকাশ: উভয়েই লেখকের দিকে থেকে যথেষ্ট নিরাসক্তভাবে দৃষ্ট। 'ছায়ানট' গল্পের রেবার মতোই এ গল্পের শচী; শচীকে হয়তো রেবার চেয়ে আর-একটু স্পষ্টভাবে দেখা যায়। শচীর শঠতা বোধ হয় আরো মারাত্মক—স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসা যতো দূর প্রসারিত, তার চেয়ে সে তাকে প্রয়োজনীয় নির্ভর মনে করে অনেক বেশি। ফেলে-আসা গ্রামের স্মৃতি সোমেন ও শচী দুজনের মনেই দুর্মর। কিন্তু শচী যখন গ্রাম-ভ্রমণের প্রস্তাব করলে, সেই কোন দূর বকমোহানায় ফিরে-যাওয়ার প্রস্তাব, সোমেন মুহূর্তে বুঝে নিলে এই আক্ষরিক হঠাৎ-আবেগী ভিতর-হিশেবী মেয়েমানুষটিকে। বুঝে নিলে: শচীকে এখন ব্যবহার করা যায় ট্রিপের ফূর্তির জন্যে বিস্তীর্ণ বালির উপর কিংবা ড্রয়িংরুমের তাৎক্ষণিক সোফার উপর। কিন্তু পূর্বোক্ত জ্ঞান তাকে যেন জোর ক'রে ঘর থেকে বের ক'রে আনলো রাস্তার মুক্তিতে। এই অপরূপ উপসংহার মনস্তত্ত্বের দিক থেকেও গ্রাহ্য ও যোগ্য। 'ছায়ানট' গল্পে

চশমা নিয়ে যেমন, তেমনি এ গল্পে মুরগির রোস্ট নিয়ে চমৎকার মানস-সমীক্ষা প্রায় প্রতীক-মাধ্যমে প্রস্ফুটিত।[৩] মানসমুহূর্ত ফোটাবার জন্যে দৈনন্দিনকে ব্যবহার করবার খুব সফল দৃষ্টান্ত আছে এ-সব গল্পে—গল্প লেখবার জন্যে এই প্রয়োগ প্রয়োজনীয় ছিলো। স্মরণীয় : জীবনানন্দের কবিতা একদিক থেকে যেমন দৈনন্দিন থেকে দূরব্যবহিত, অন্যদিক থেকে তেমনি বস্তুর অতি-ঘনিষ্ঠ ও -চেনা। মুরগির রোস্ট বা শেলাই-কল, তাই, মনোসমীক্ষার চমৎকার উপাদান-রূপে কাজ ক'রে গেছে আলোচ্য গল্প-পরিসরে। চরিত্রপাত্রের আভ্যন্তরীণ সারশূন্যতারও সুন্দর নমুনা আছে সোমেনে—যখন নিজেকে শচীর কাছে চমৎকার জাহির করবার পর নিজেকে তার ফাঁপা, ফাঁকা, জোশরিক্ত ব'লে মনে হয়। যে-দুর্মর গ্রামবাংলার জয়-গাথা রচনা করেছেন জীবনানন্দ তাঁর অজস্র কবিতায়, এই গল্পে বর্তমান তারই চলৎ গদ্যভাষা। শাহরিক সভ্যতাকে জীবনানন্দ যেন কিছুতেই ক্ষমা করতে পারেননি। তাই ট্রাম ও ট্রাম-লাইন বর্ণিত হয় এভাবে 'ট্রাম-

[৩] জীবনানন্দের তীক্ষ্ম সংবেদনশীলিত মনের প্রকাশ অনেকবার রূপ পেয়েছে কএকটি প্রাণীর মৃত্যুর ভিতর দিয়ে। হরিণের মৃত্যু-সংবাদ কবিচিত্তে যে-প্রতিক্রিয়ার তরঙ্গ তুলেছে তার দুটি ছবি লভ্য 'ক্যাম্পে' (ধূ. পা.) ও 'শিকার' (ব. সে.) কবিতায় ; 'মুহূর্তে' (মহা.) কবিতায় হৃৎহরিণের আর এক ছবি। (বক, বনহংস বা অন্য বিহঙ্গের মৃত্যুর প্রসঙ্গ এসেছে বহু কবিতায়। প্রথম গ্রন্থের নাম "ঝরা পালক" এই সূত্রে স্মর্তব্য। "ঝরা পালক"-এর কএকটি কবিতায় ('আমি কবি—সেই কবি' 'সিন্ধু', 'চাঁদিনীতে') এই বিষয় বর্তমান ; "ধূসর পাণ্ডুলিপি"তে 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় জীবন-সন্ধানী কবি দেখেছেন : বুনোহাঁস শিকারীর গুলির আঘাত/এড়ায়ে উড়িয়ে যায়…'; "বনলতা সেন" এর 'আমি যদি হতাম' কবিতায় 'হয়তো গুলির শব্দ আবার :/আমাদের স্তব্ধতা/আমাদের শান্তি।' "মহাপৃথিবী"-র মৃত্যুত্তর যোজিত অংশের দুটি কবিতা ('মৃত মাংস', ও 'হঠাৎ মৃত্যু') এবং অসংকলিত দুটি কবিতা ('পড়ে গেল একেবারে আমার পায়ের কাছে ঘাসে' ও 'বরং নতুন এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনে') এই পর্যায়ী। এই সব কবিতার পাশে বক্ষ্যমাণ গল্পের একটি অংশ :

> অত্যন্ত বিজয় গৌরবেই তো স্বামী নিরপরাধ পাখিটিকে সহজ মৃত্যুর থেকে বঞ্চিত ক'রে-অপমৃত্যু ঘটিয়েও তারপরেও নিরস্ত রইলো না ; নোংরামীর শবটাকে কিম্ভূতকিমাকার একটি কার্টুনে পরিণত ক'রে চূড়ান্ত ঠাট্টা শেষ হ'ল না তবু ; বাবুর্চির হাতেও এতক্ষণ ব'সে পাখিটির সমস্ত লাঞ্ছনা শেষ হয়নি ; ডিনারটেবিলে এই পুরুষটির ছুরি-কাঁটা প্রতি মুহূর্তেই ঘুরে-ফিরে কত যে উপহাস ও শ্লেষ ক'রে চলেছে এই সিদ্ধ দগ্ধ অপমৃত্যুনিষ্ফল নির্বাক শবটাকে—ভাবছিল শচী।

লাইনগুলো খালি প'ড়ে আছে—রাস্তার সেই বিরাট হাঙরদের এখন ঘুমোবার সময়।' এরই কাছাকাছি এই কবিতাংশ 'কয়েকটি আদিম সর্পিনী সহোদরার মতো এই যে ট্রামের লাইন ছড়িয়ে আছে'[৪]। তাঁর গল্পের সঙ্গে তাঁর কবিতার সম্বন্ধ সূচক একটি যুগ্মোদ্ধার :

> ট্রাম লাইনগুলো খালি প'ড়ে আছে—রাস্তার সেই বিরাট হাঙরদের এখন ঘুমোবার সময় ; আওয়াজ তাই ঢের কম ; বাতিও অনেক নিবে গেছে—রাস্তার ওপর অন্ধকার এই বেলা খানিকটা জ'মে এসেছে ; নক্ষত্রগুলোর মানে আছে এখন—কোথাও নদীর জলে এই তারাগুলোর ছবি : তার মানে ?...হু-হু ক'রে দু'টো ট্যাক্সি পাল্লা দিয়ে ছুটে চলছে—তাদের কাছে মহিষের গাড়ীগুলোর অবসর অসীম ; কোন্ বাড়ীর আকাশপ্রদীপ এখনও জ্বলছে ; হঠাৎ পাড়াগাঁর কুয়াশা, ধানের ক্ষেত, পালংশাক, কপি বীট গাজর শিউলি, বেঁটে খেজুর গাছ, শুঁয়োপোকা প্রজাপতি কাঁচপোকা জোনাকী—আট-দশ বছর আরে কত কী মনে প'ড়ে যাচ্ছে ; পাড়াগাঁর রাত এমন নিস্তব্ধ হ'য়ে যায় যে শুপুরীর কুঁড়ি ঝরবার শব্দ অব্দি শোনা যায় ;
>
> [গ্রাম ও শহরের গল্প]

অনেক রাত হয়েছে—অনেক গভীর রাত হয়েছে ;
কলকাতার ফুটপাথ থেকে ফুটপাথ—ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে—
কয়েকটি আদিম সর্পিনী সহোদরার মতো
          এই-যে ট্রামের লাইন ছড়িয়ে আছে
পায়ের তলে, সমস্ত শরীরের রক্তে এদের বিষাক্ত বিস্বাদ স্পর্শ
          অনুভব ক'রে হাঁটছি আমি।
গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে—কেমন যেন ঠাণ্ডা বাতাস ;

[৪] জীবনানন্দ জীবজগতের বর্ণনা দ্যান শিশুর বিস্ময়ে ও একেবারে সাধারণ মানুষ-শোভন সারল্যে। তাঁর হরিণ ও বক, হাঁস, বুনোহাঁস, রাজহাঁস, কাক, দাঁড়কাক, পায়রা, শালিক প্রভৃতি পাখি অজস্রবার উড্ডীন সরলতা, পবিত্রতা, কল্যাণ প্রভৃতির প্রতীকে ; অপর পক্ষে সাপ, বাঘ, সিংহ, প্যাঁচা, হাঙর প্রভৃতি হিংসা, ধ্বংস, অমঙ্গল, ক্ষুধিত সময় প্রভৃতির প্রতীকে প্রযুক্ত। "ঝরা পালক"-এর 'চাঁদিনীতে' কবিতার দুটি পঙক্তি এই দুই এলাকার স্মারক : ১. 'মনের হরিণী হেরেছে তোমারে বনের পারের ডাগর শশী' ; ২. 'তরুণীর দুধ-ধবধবে বুকে সাপিনীর দাঁত উঠেছে রেঙে।' পরবর্তী অজস্র কবিতায় এই দু ধরনের প্রয়োগ দ্রষ্টব্য।

কোন্ দূর সবুজ ঘাসের দেশ নদী জোনাকির কথা মনে পড়ে আমার ;
তারা কোথায় ?
তারা কি হারিয়ে গেছে ?
পায়ের তলে লিকলিকে ট্রামের লাইন,—মাথার ওপর
অসংখ্য জটিল তারের জাল
শাসন করছে আমাকে।

[ফুটপাথে, মহা.]

'বিলাস' গল্পে ব্যঙ্গ আর কবিত্ব অর্কেস্ট্রায়িত। 'অফিসের কাজ সেরে শান্তিশেখর বাড়ি ফিরল ; কিন্তু সেই রাতেই নিজের বিছানায়—শীতের গভীরতার ভিতর কী ক'রে যে তার মৃত্যু হ'ল ডাক্তার কোনো পরিষ্কার হিসেব দিতে পারল না, তিন ফ্ল্যাটের ভাড়াটেরা কেউই কোনো অনির্বচনীয় কারণ খুঁজে পেল না।' এই কারণহীন মৃত্যু জীবনানন্দের কবিতার সঙ্গেই তুল্য হ'তে পারে, 'আট বছর আগের একদিন' (মহা.) কবিতার নায়ক এই কারণহীন মৃত্যুর শিকার হয়েছিলো। যে-মনোগত আদর্শ নারী-কল্পনা ছিলো শান্তিশেখরের—শেষ ঘুমের আগে তার মনে জেগে উঠলো 'চেনা, অচেনা, আধোচেনা' মেয়েদের মুখ—কিন্তু তার ভিতরে সেই আদর্শ আনন নেই। জগতে কোথাও আছে কি ? কিন্তু শান্তিশেখর নিজেই তো মৃত্যুকে চেয়েছিলো : 'শান্তিশেখরের মনে হ'লো এই রাত সব সময়েই দিনকে খণ্ডন ক'রে রাত্রি হ'য়ে থাক—এই ঘুম মৃত্যু হোক।' আমাদের মনে প'ড়ে জীবনানন্দের অনেক মৃত্যুইচ্ছাময় কবিতা ; তার একটি 'স্বপ্নের ধ্বনিরা এসে বলে যায় : স্থবিরতা সব চেয়ে ভালো' ও 'স্থবিরতা, কবে তুমি আসিবে বলো তো।' (স্বপ্নের ধ্বনিরা, ব. সে.) তাঁর শেষ বিপজ্জনক দিনগুলোতে এই মৃত্যু-ইচ্ছা কি জীবনানন্দকে ভিতর থেকে চালিয়ে নিয়েছিলো ? অন্যমনস্ক শরীরটিকে নিয়ে গিয়েছিলো 'আদিম সর্পিনী সহোদরা'-র নিকটে—'রাস্তার সেই বিরাট হাঙর'-দের হাঁয়ের ভিতরে ? 'বিলাস' গল্পে গল্পাংশের চেয়ে চরিত্রপাত্রের রূপায়নই কবির মুখ্য প্রতিপাদ্য ব'লে মনে হয়। তিনটি চরিত্র : শান্তিশেখর, সর্বেন ঘোষ ও সুস্মিতা চক্রবর্তী। পরোক্ষ চরিত্র অপরেশবাবু বিলাস-কথাটি ব্যবহার করতেন। তাঁর বিবেচনায়, 'বিলাস মানে খুব সম্ভব বিষয়-আশয়ের মায়া কাটিয়ে ন্যালা-ভোলা জিনিস নিয়ে ভোম হয়ে থাকা।' সর্বেন ঘোষের জ্যেঠামশাই এই অপরেশবাবু, শান্তিশেখরের হেডমাস্টার মশাই। সর্বেন ঘোষকে তিনি বলতেন, 'তুমি সারাদিন ফুলবাবুর মতো সেজে বেড়ালে

হবে কী, তোমার মনে কোনো বিলাস নেই সর্বেন।' শান্তিশেখরকে তিনি বলেন, 'কেমন উদ্বায়ী তোমার আত্মা—', পরে শোধন ক'রে 'বিলাসী' এবং অনন্তর, 'বিলাস তো খুব ভালো জিনিস, শান্তিশেখর।' শান্তিশেখর বই কেনে, প'ড়ে উঠতে পারে না ; তার আদর্শ নারীর তল্লাশে ফেরে, খুঁজে পায় না : এই বিলাস মনোবিলাস ; খুব সম্ভব এই মনোবিলাসকেই অপরেশবাবু শনাক্ত করেছিলেন। সর্বেন ঘোষ-সুস্মিতারা সে-রকম নয়—তারা মনোবিলাসী নয়—ভিতরক্ষুধিত নয়—বিষয়নিমজ্জিত।[৫] 'বিলাস' ও "মহাপৃথিবী" বা "সাতটি তারার তিমির"-এর ব্যঙ্গাক্ত কবিতাগুলোর হয়তো এক-সমতলে অবস্থান। এই গল্পের রচনারীতির মধ্যে এমন একটি সপ্রতিভ নাগরিক ঈষৎ-ব্যঙ্গাক্ত তীক্ষ্ণতা আছে, যার তুলনা প্রাপ্তব্য তাঁর উপান্ত্যপর্যায়ী কবিতার আত্মায়। যে-দুই জীবনানন্দের সাক্ষাৎ পাই আমরা তাঁর অন্ত্যকালীন কোনো-কোনো কবিতাপরিসরে, এখানে পাই তার যুগল ছবি—স্বপ্নসঞ্চারী আর বস্তুপ্রহত যুগল ছবি। সেই দুই জীবনানন্দ :

১. নারীকে না-ভালোবেসেই চ'লে যেতে হবে। কোথায়ই বা সেই নারী? তাকে শান্তিশেখর যে একেবারেই দেখেনি, তা নয়। ফুটপাথে লোকের ভিড়ে ট্রামে-বাসে উৎসব-বাড়ীতে বা মেঘে... রোদে...মোটরের পা-দানি গলির সিঁড়ি সময়ের স্তর বেয়ে উঠছে—নামছে,—আবছায়ার ভিতর হারিয়ে যাচ্ছে ; —তাকে দেখেছে শান্তিশেখর। সে বহু নারী ; তার ও তার যাচকের মাঝখানে কেমন একটা বিশদ পাথর রেখে দিয়েছে সময় ; খুব দামী পাথর, খুব সম্ভব বজ্রমণি ; মণির সূচিমুখে ঠেকে বর্ণালীর মতো পুরুষের চোখে মুখে অন্তরাত্মার ভিতর ভেঙে-ভেঙে পড়েছে সে তাই—দূর নীলিমায় গিয়ে শ্বেত সূর্যের মতো একাকী হয়েছে তবুও।

[বিলাস]

২. ছ্যাকড়া-গাড়ির পক্ষীরাজের জীবন তো আমাদের—ধর্মের ষাঁড়ের জীবন তো নয় ; নানা মেয়ের মুখ চেয়ে চলতে হ'লে ষাঁড়ের মতো শরীর চাই, ধর্মের ট্যাঁকের মতো টাকা ; সে-সব নেই

[৫] জীবনানন্দে এই ছবি—কোনো-কোনো বিলাসীর এই ছবি যেমন আমাদের বিশ্বাস্যতার ভিতরদেশে অবস্থিত, তেমনি এর বিপরীত বিহার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নেশা' গল্পটি—যেখানে বাড়ি-সুদ্ধু সবাই কোনো-না-কোনো মত্ততায় আচ্ছন্ন—মানুষের মনোপ্রকৃতির স্বাভাবিক চিত্র ব'লে বোধ হয়।

আমাদের ; ঘানিগাছে ঘুরে আমাদের শরীর গেছে—টাকা মনিবরা খাচ্ছে। গৃহিনীর খোঁজ পাই প্রেমে নয়—যৌনের পথে মিলনে-টিলনে—কালে-ভদ্রে।

[বিলাস]

যে-এডগর এ্যালান পো-র প্রভাবচ্ছায়া জীবনানন্দের উপর একাধিকভাবে নিপতিত, তিনি তো বস্তুজগতের হাতে মার খেয়েই স্বপ্নের ভিতরে পালিয়ে গিয়েছিলেন ; জীবনানন্দও অনেকবার বাস্তবপ্রহত হৃদয়ের জরা কাটিয়ে স্বপ্নের হাতে ধরা দেবার প্রস্তাব করেছেন ; জনমানবহীন প্রকৃতির ভিতরে প্রস্থান করেছেন। এইসব গদ্যাংশের মর্মের ভিতরে আছে সেইসব নিহিত লেখন।

এইসব গল্পগুলি জীবনানন্দ যখন তাঁর মধ্যবয়সে লিখেছেন, তখন তাঁর 'ধানের খেতের গন্ধ মুছে গেছে/ জীবনের থেকে যেন' ('নিরালোক', মহা.)। তখন তাঁর জীবনে ও বহিঃপৃথিবীতে 'গ্রামপতনের শব্দ হয়' ('পৃথিবীলোক', মহা.)। তাঁর কবিতায় তখন বারংবার জেগে উঠছে নগর-প্রসঙ্গ :

১. হৃদয়, অনেক বড়ো-বড়ো শহর দেখেছ তুমি,
সেইসব শহরের ইটপাথর,
কথা, কাজ, আশা, নিরাশার ভয়াবহ হৃত চক্ষু
আমার মনের বিস্বাদের ভিতর পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে।

[শহর, মহা.]

২. গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে, কেমন যেন ঠাণ্ডা বাতাস ;
এই ঠাণ্ডা বাতাসের মুখে এই কলকাতার শহরে এই গভীর রাতে
কোনো নীল শিরার বাসাকে কাঁপতে দেখবে না তুমি ;
জলপাইয়ের পল্লবে ঘুম ভেঙে গেলো ব'লে কোনো ঘুঘু তার
কোমল নীলাভ ভাঙা ঘুমের আস্বাদ তোমাকে জানাতে
আসবে না।

[ফুটপাথে, মহা.]

৩. সহস্র চোখ না যোনি এতদিন পরে আজ কলকাতার ইন্দ্রের
শরীরে।

[এইখানে সূর্যের, শ্রে. ক.]

৪. চারিদিকে ভোরের কি বিকেলের কাকজ্যোৎস্না ছায়ার ভিতরে

আহত নগরীগুলো কোন এক মৃত পৃথিবীর
ভিতরের চিহ্ন ব'লে মনে হয় ;

[ঐ. ঐ.]

গল্পগুলির পটভূমি শহর—কলকাতা শহর। 'গ্রাম ও শহরের গল্পে'র হৃদয়ে অবশ্য গ্রামেরই অবস্থান এবং দুর্মর গ্রামেরই জয়। এই মনোভাবনা জীবনানন্দে বারংবার বিভাসিত : শহরের আকাশের নক্ষত্রেরা, তাই গ্যাশ লাইট ও উঁচু গম্বুজের উপর দিয়ে সমুদ্রের দিকে উড্ডীন (শহর, মহা.), বর্ষণাসক্ত কলকাতার রাত্রিগভীরে তাঁর মনে জেগে ওঠে নিসর্গের এক-একটি জিনিশের অভাব—তাঁর পা মাড়িয়ে চলেছে ট্রাম-লাইন আর মাথার উপর অসংখ্য তারের জটাজাল (ফুটপাতে, মহা.)। সদর্থে শহরে সদ্যাগত কৃষকের মতো তাঁর মনের অবস্থা ; কএকটি অসংকলিত কবিতার অংশ উদ্ধার ক'রে দিই :

১. খঞ্জনারা কেন নাচে? বুলবুলি দুর্গাটুনটুনি কেন ওড়াউড়ি
করে বনে বনে ?
আমরা যে কমিশন নিয়ে ব্যস্ত—ঘাটি বাঁধি—ভালোবাসি নগর ও
বন্দরের শ্বাস
ঘাস সে বুটের নীচে ঘাস শুধু—আর কিছু নয় আহা—
মোটর যে সবচেয়ে বড় এই মানবজীবনে
খঞ্জনারা নাচে কেন তবে আর—ফিঙা বুলবুলি কেন ওড়াউড়ি
করে বনে বনে ?

[কেন মিছে নক্ষত্রেরা]

২. একটা মোটরকারের পথ—মোটরকার
সব-সময়েই আমার কাছে খটকার মতো মনে হয়েছে,
অন্ধকারের মতো।

[উনিশ শো চৌত্রিশের]

৩. সারা দুপুর পাখিগুলো দূরের থেকে আরো দূরে কোথায় চ'লে
যায়।

শহর দরিদ্র হয়ে পড়ে।
শহর নির্জন হয়ে পড়ে।

[এইসব পাখি]

জীবনানন্দের চেতনার কম্পাশের কাঁটা সর্বদাই গ্রাম ও নিসর্গের দিকে নির্দেশিত। কবির সবগুলি গল্পের পটভূমি আবার রাত্রির কলকাতা,—তাঁর অজস্র কবিতায় যে-নিশীথকলকাতা চিত্রিত ('রাত্রি', 'পথ হাঁটা',

'শহর', 'শীতরাত', 'ফুটপাথ' প্রভৃতি), ব্যক্তি-জীবনেও কলকাতার যে-রাত্রিগুলো ভালোবেসেছেন কবি :

১. জানলা খুলে দিতেই রাস্তার গ্যাসলাইটের এক ঝলক আলো এসে চোখ ঝাঁটিয়ে দিল।

[ছায়ানট]

২. শচী দরজাজানালাগুলো সব খুলে দিল। বড় রাস্তার দিকের জানালার পাশে এসে রাতের কলকাতার দিকে একবার তাকাল সে—

[গ্রাম ও শহরের গল্প]

৩. পৌষের রাত প্রায় তিনটে হবে। কলকাতায় এবার শীত পড়েছে খুব ;

[বিলাস]

শুধু কলকাতা শহর নয়, মানুষও এইসময় জীবনানন্দের কবিতায় নূতনভাবে প্রবেশ করেছে। যে-মানুষের মুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন তিনি, তা আরো পরের জিনিশ ; এক ধরনের ঘৃণা ও বিবমিষা কবিকে আজ আপাদ-মাথা দখল ক'রে রেখেছে—গল্পে আছে তার স্বাক্ষর, দু'একটি কবিতাতেও সেই মনোস্বভাবের পরিচয় মুদ্রিত ('অন্ধকার' ও 'আদিম দেবতারা')। জীবনানন্দের একসময়কার কবিতায় মানুষই ছিলো প্রধান চরিত্র : "রূপসী বাংলা"-র বড়ো পরিসরে মানুষ প্রায় লুপ্ত যেন, কিংবা আছে নিসর্গেরই সংলগ্ন হ'য়ে। ক্রমশ তাঁর মধ্য- বা অন্ত্য-পর্যায়ে মানুষ এসে প্রবেশ করলো তাঁর কাব্যবলয়ে—যে-মানুষ বিভিন্ন জটিলতায় ছিন্নভিন্ন আধুনিক মানুষ। 'ছায়ানট' গল্পের নায়ক, বা 'গ্রাম ও শহরের গল্পে'র সোমেন ও প্রকাশ, বা 'বিলাস'-এর শান্তিশেখর এরকম দ্বন্দ্বারক্ত আধুনিক মানুষ। খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশ বা সর্বেন ঘোষের প্রতি কবির সহানুভূতি ধাবিত হয় না ; 'ফিকিরের সুড়ঙ্গে কাছিমের মতো' এইসব মানুষ আমাদের যে অপরিচিত তা নয় : বস্তুত আমাদের চতুষ্পার্শ্বে এদেরই-তো ভিড়। এদের প্রতি কবির ব্যঙ্গ ও ঘৃণা তাঁর মধ্যপর্যায়ে তীব্র ও জ্বলমান। তিন ধরনের চরিত্র অংকিত তাঁর গল্পগুচ্ছে : এক. সোমেন-শান্তিশেখরের মতো বিলাসী-খেয়ালি-আত্মভাবুক-জীবনপরাজিত চরিত্র ; দুই. প্রকাশ-সর্বেন ঘোষের মতো বিষয়বুদ্ধিউদ্বুদ্ধ 'ফিকিরের সুড়ঙ্গে কাছিমের মতো' জীবন-ব্যবসায়ে জয়ী ও অক্লান্ত পুরুষ ; তিন. রেবা-শচী-সুস্মিতার মতো অবিশ্বাসিনী অগভীর ছিনালিপনায় অভ্যস্তা 'রঙিন বলের মতো' মেয়েমানুষ। সর্বেন ঘোষের মোটর চালনার বর্ণনা 'মোটর সটকে চলছিল একপাল ঘূর্ণি উড়িয়ে, হাঁস তাড়িয়ে, একটা কুকুরের বাচ্চাকে চেপ্টে দিয়ে,

গুরু ঘোষের একটা বিরাট দঙ্গলের ভিতর দিয়ে হেসে-খেলে হাত-সাফাইয়ের প্রাঞ্জল অব্যর্থতায়' আসলে তার চরিত্রের জীবনজয়ী ভূমিকারই ইশারা-জ্ঞাপক। প্রকাশের মতো সে-ও জীবনের বাজারের পথে সর্বজনপ্রিয় সর্ব-জয়ী বাজনার চলিষ্ণু বাদক। বর্তমান গল্পগুচ্ছের নায়িকারা জীবনানন্দের পূর্বতন কবিতাগ্রন্থ "ঝরা পালক"-"ধূসর পাণ্ডুলিপি"-"রূপসী বাংলা"-"বনলতা সেন"-এর নায়িকা নয় কিছুতেই ; এরা স্বপ্নজগতের মানসরূপী নয়—কবিতালোকের অধিবাসী নয় ; এরা বাস্তব বিশ্বের বাশিন্দা মানুষী ; চিরন্তনী নয়—সামান্যা ; এরা জীবনানন্দের মধ্যপর্যায়ী বিশ্বাসহন্ত্রী নায়িকা। রেবা-শচী-সুস্মিতা এইসব নারী : 'সুন্দর জন্তুর মতো'। রেবা-শচী-সুস্মিতার উদ্দেশেই কি মনে হয় না এই কবিতা লেখা হয়েছিলো ? সোমেন-শান্তিশেখররাই কি এই কবিতার সত্য ধারণ করেনি ?—

একবার নক্ষত্রের পানে চেয়ে—একবার বেদনার পানে।
অনেক কবিতা লিখে চ'লে গেলো যুবকের দল ;
পৃথিবীর পথে-পথে সুন্দরীরা মূর্খ সসম্মানে
শুনিল আধেক কথা ;—এইসব বধির নিশ্চল
সোনার পিত্তলমূর্তি ; তবু, আহা, ইহাদেরি কানে
অনেক ঐশ্বর্য ঢেলে চ'লে গেলো যুবকের দল ;
একবার নক্ষত্রের পানে চেয়ে—একবার বেদনার পানে।

[ইহাদেরি কানে, মহা.]

বনলতা সেন-শেফালিকা বোস-অরুণিমা সান্ন্যালেরা ততোদিনে কবিহৃদয় থেকে লুপ্ত হ'য়ে গেছে ; তখনো আসেনি সেই নারী যাকে ভালোবেসে নিখিল গরল মধুময়তায় রূপান্তরিত হ'তে পারে ; মধ্যবর্তিনী এইসব বিশ্বাসহন্ত্রী পাশবিক নারী—রেবা-শচী-সুস্মিতারা—জুড়ে রইলো রক্তাক্ত অলিন্দ। নরনারীর সম্পর্ক জীবনানন্দের বহু কবিতার আশ্রয়আধার ; এইসব গল্পে বিশ্লেষিত নরনারীর সম্পর্কের জটিল টানাপোড়েন।

আশিখরগহ্বর কবিত্বের স্বাদ নিয়েও এসব গল্প, তাই, পুরোপুরি গল্প। নরনারীর সম্পর্কের জটিলতা বস্তুসম্ভব আকারেই রূপায়িত। যে-পলায়নপরতার অপবাদ জীবনানন্দের নামে উচ্চারিত হয়, এই সংরক্ত জটিল গল্পগুলি তারই প্রতিবাদ। 'গ্রাম ও শহরের গল্পে'র উপসংহার হয়তো কবিতার উপসংহার—কিন্তু জীবনেরও। আমরা-যে আমাদের একদিনকার মন হারিয়ে ফেলি, তার সাক্ষাৎ আমরা প্রাক্তন সাহিত্যে পাবো না ; সেখানকার চরিত্রপাত্রেরা একাভিমুখী। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

"পুতুল নাচের ইতিকথা"-র শশীর বহুবিলম্বিত আত্মনিবেদনের পর কুসুমের মন ম'রে যাওয়ার উক্তির বিশাল বিস্ময় শশীর মতো আমাদেরও বিমূঢ় ক'রে দ্যায়। তেম্নি আর-এক সত্য উদ্‌ঘাটিত হ'লো জীবনানন্দের 'গ্রাম ও শহরের গল্পে' : শচীকে যে-গ্রামকেন্দ্রের ভিতরে পেয়েছিলো সোমেন একদিন, শহরের ড্রয়িংরুমের সোফার উপর তার পুনরভিনয় করতে পারলো না সে ; আমাদের জানিয়ে দিলে কামের শিকড় শরীরে নয়—মনোমৃত্তিকার গভীরদেশে প্রোথিত। সংরক্ত দ্বন্দ্বের এইসব গল্প কবিতা-দ্বারা আক্রান্ত হ'তে পারে—কিন্তু কবিতানিবাসী নয়। গল্প রচনায় জীবনানন্দের এই কৃতিত্বও উপযোগী, যে, তিনি ঘটনার মধ্য দিয়েই চরিত্রকে উন্মোচিত ক'রে তুলেছেন : 'ছায়ানট' গল্পের রেবার দ্বারা নায়কের মাথা টেপানোর কিংবা ভিখিরির প্রতি রেবার দাক্ষিণ্যের সঙ্গে প্রতিতুলনা, 'গ্রাম ও শহরের গল্পে' শচী সোমেনের পারস্পরিক আঘাত ও আকর্ষণের দোটানা ; 'বিলাস' গল্পে সর্বেন ঘোষের প্রতি শান্তিশেখরের ব্যবহারের সূক্ষ্ম কারুকাজ (সর্বেনের সিগারেটের টিন নিয়ে শান্তিশেখরের চ'লে আসা) ইত্যাদি অনেক মনোমন্ডলের বহিঃপ্রকাশী ঘটনাবলি স্মরণীয়। কিংবা যখন কবি সরাসরি চরিত্রপাত্রের বর্ণনা দিয়েছেন, তখন একটি-দুটি কাব্যিক প্রকাশে তা সিদ্ধার্থ ও লক্ষ্যভেদী হ'য়ে ওঠে। 'গ্রাম ও শহরের গল্পে'র তিনটি চরিত্র সম্পর্কে তিনটি চরিত্রোদ্‌ঘাটী আশ্চর্য বর্ণনা উদ্ধার করা যাক :

শচী ॥ এরকম মেয়েমানুষ জীবনের থেকে ঢের গন্ধ-আস্বাদ কুড়িয়ে নিতে পারে : জীবনের হাতে আছাড় খেলেও এরা টকটকে রঙিন রবারের বলের মতন লাফিয়ে ওঠে।

সোমেন ॥ জীবন-ব্যবসায়ের প্রতি অবিশ্বাসী—জীবনকে চায় শুধু ; খড়্গের মতন কঠিন—চোখা বিচারবোধটাকে কল্পনার রেশমী মাকড়ের জালে জড়িয়ে নিষ্ক্রিয় রাখতে ভালোবাসল সে ; ভাবপ্রবণতায়-আবেগে-ব্যঙ্গে নিষ্ক্রিয়তায় নিরর্থক হ'য়ে রইলো, অনাবিষ্কৃত খনির সোনার মতো কোথাও প'ড়ে আছে সে—

প্রকাশ ॥ রুপোর টাকার মতো জীবনের বাজারের পথে প্রকাশ তার সর্বজনপ্রিয় সর্বজয়ী বাজনা বাজিয়ে চলেছে।

বিশ্বাসভূমি ধ্ব'সে খ'শে যাওয়ার এইসব গল্পে বিশিষ্ট জীবনানন্দীয় প্রকাশরীতি এক সম্পদ। আছে বিশেষণ ব্যবহারের অসামান্য কুশলতা : 'লবেজান অন্ধকার', 'তিব্বতী পবিত্রতা' ('বিলাস')। দেশজ শব্দ বা বাক্

রীতি প্রয়োগের নিষ্ণাত দক্ষতা : ১. 'মাগী-মিনসে এক খোপ্‌রে,—অথচ পুরুত এসে মন্ত্র পড়বে না।' ('ছায়ানট')। ২. 'উত্তেজনা সে ভালোবাসে না, কিন্তু তবুও যে-জিনিস কয়েক ঘণ্টা কেটে গেলে বাসি মনে হয়, সে-সব খবর ও খবরানাগুলো ডিম ভেঙে তাজা বাচ্চার মতো মুখিয়ে এসে ভারি বে-কায়দায় ফেলে শান্তিশেখরকে সকালবেলায় চায়ের পাটের সময়।' ('বিলাস')। ক্রিয়াপদের নূতন ব্যবহারের দৃষ্টান্ত : ১. 'জানলা খুলে দিতেই রাস্তার গ্যাসলাইটের এক ঝলক আলো এসে চোখ টাটিয়ে দিল।' ('ছায়ানট') ২. 'আজ তার মুখের ওপর দরজা পিটিয়ে দেবার একটা দুর্দমনীয় স্পৃহা শচীকে পেয়ে বসল—দরজা পিটিয়ে চাবি বন্ধ ক'রে দেবার।' ('বিলাস')। বিশিষ্ট জীবনানন্দীয় প্রকাশভঙ্গির উদাহরণ দিতে গেলে পাতার পর পাতা উধৃত করতে হয়। শব্দ বা বাক্যবন্ধের যে-পুনরাবৃত্তি জীবনানন্দের কবিতায়-কবিতায় সুপ্রচুর ফ'লে-ফুটে আছে,[৬] তাঁর গদ্যরচনা থেকেও তার সাক্ষ্য আহরণ করা সম্ভব :

> শীতের রাত—শীতের গভীর রাত—বাংলার শীতের গভীর রাত, প্রকাশ তাকে নিয়ে যেন কোনো বাংলার মাঠে আমনের ক্ষেতের পাশে টুপুর-টাপুর শিশিরের ভিতর কোনো মধুমতী কর্ণফুলী আড়িয়ল খাঁ নদীর কিনারে প্রোথিত করে রাখে—হা ভগবান, প্রোথিত করে রাখে যেন।[৭]
>
> [গ্রাম ও শহরের গল্প]

[১৯৭৩]

---

[৬] বিশেষত "ঝরা পালক"-"ধূসর পাণ্ডুলিপি"-"বনলতা সেন"-এর অনেকগুলি কবিতায় এই কুশলতা বারংবার বেজেছে।

[৭] উনিশ শতকের বাংলা গদ্যরীতির মধ্যেও এই পুনরাবৃত্তির প্রয়োগ দ্রষ্টব্য :

ক. বিদায় হইলাম, আর লিখিব না। বনিল না। আপনার সঙ্গে বনিল না, পাঠকের সঙ্গে বনিল না, এ সংসারের সঙ্গে বনিল না। আমার আপনার সঙ্গে আর আমার বনিল না। আর কি লেখা হয়? বেসুরে কি বাঁশী বাজে? বাঁশী বাজি বাজি করে তবু বাজে না—বাঁশী ফাটিয়াছে।
[কমলাকান্ত, বঙ্কিম রচনাবলী (দুই) : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

খ. রে পথিক! রে পাষাণ-হৃদয় পথিক! কি লোভে এত এস্তে দৌড়িতেছ? কি আশায় খণ্ডিত শির বর্শার অগ্রভাগে বিদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতেছ? এ শিরে হায়—! এ খণ্ডিত শিরে তোমার প্রয়োজন কি? সীমার! এ শিরে তোমার আবশ্যক কি?
[উদ্ধার পর্ব/দ্বিতীয় প্রবাহ, বিষাদসিন্ধু : মীর মশররফ হোসেন]

উ প ন্যা স

এখন, ক্রমশ, জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর বছর বিশেক পরে বোঝা যাচ্ছে, যে, তিনি শুধু কবি নন, কবিতা ও কবিতাকেন্দ্রিক গদ্যরচনা ছাড়াও সাহিত্যের অন্য দু-একটি মাধ্যমও তাঁকে মজিয়েছিলো ; যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও জীবনানন্দকে যে-একক কবি-চারিত্রিক উপাধিতে শনাক্ত করে-ছিলাম আমি কএক বছর আগে[১], এখন সে-উক্তি ফিরিয়ে নিতে হয় : বাংলার বড়ো কবিদের মধ্যে একা যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত র'য়ে গেলেন কেবল কবিতা ও কবিতার ভাবনাকেন্দ্রিক গদ্যরচনায় আত্মসমর্পিত একক-চারিত্রিক কবি-প্রতিভূ। জীবদ্দশায় ছিলেন যিনি কেবল কবি, আপাদমাথা কবি, তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হ'লো তাঁর কবিতাকেন্দ্রিক গদ্যনিবন্ধ ; নিজ-জীবনীর টুকরো ; ছোটোগল্প ; উপন্যাস। সন্দেহ নেই : পরিপূর্ণ কবি তিনি, জীবনানন্দ দাশ, পরিপূর্ণ কবি : তাঁর গদ্যনিবন্ধ, গল্প, উপন্যাস— সমস্ত থেকেই বিকীরিত হচ্ছে কবিতার লাবণ্য, কবিতার নির্যাস, কবিতার সারাৎসার। মনে পড়বে : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে—তিনিও দীর্ঘল উপন্যাসপাশে জড়িয়েছিলেন ; মনে পড়বে : তাঁরই সমসাময়িক বুদ্ধদেব বসুকে—তিনিও অজস্রধারে প্রণয়ন করেছেন নভেলমালা ; নজরুল ইসলামের মতো আবেগ-প্রধান কবিও ফেঁদেছিলেন দীর্ঘ কাহিনীমঞ্জরী। এঁদেরও রচনায় তাঁদের প্রধান সত্তা, সত্তার মূলীভূত জিনিশ, অপ্রকাশ্য থাকেনি ; কিন্তু তবু তাঁরা বোধ ও অনুভব করেছিলেন এমন-কিছু, যাকে কাহিনীর আধার ছাড়া ধারণ করা যায় না। এ-কথা আজ আমরা মেনে নিই (অল্প বয়সে মানতুম না), যে, বুদ্ধদেবের উপন্যাসগুলির প্রধান দ্রষ্টব্য ভাষার শানশওকত ; নজরুলের উপন্যাসগুলি আবেগের জল-প্রপাত ; এমনকি যে-রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বাসের মুখে পাথর চাপা দিয়ে রেখে-

[১] 'যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : রুদ্র নৃত্যের ঝংকার' : আবদুল মান্নান সৈয়দ। 'সমকাল', বর্ষ ১৩, সংখ্যা ৩-১২. ১৩৭৭।

ছিলেন, তাঁর উপান্ত্য উপন্যাসগুচ্ছে হঠাৎ সে-ভার স'রে গিয়ে ছুটলো প্রবল পানির তোড়। যিনি যা, তাঁকে তা থেকে ঠেকিয়ে রাখা মুশকিল—শেষ পর্যন্ত, অসম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ, নজরুল বা বুদ্ধদেব বসু—বাংলা সাহিত্যের এইসব বড়ো কবিদের হাত থেকে নিষ্ক্রান্ত উপন্যাসগুলোকে আমরা স্বীকার ক'রে নিয়েছি, সে-সব ছিলো তাঁদের জীবিতকালেরই উচ্চারিত ফল-ফসল। কিন্তু, জীবনানন্দ? যাঁকে আমরা, আমাদের সমকালীনেরা ও পূর্বজেরা, অনুভব করেছি আদ্যোপান্ত কবিতায় নিষিক্ত হিশেবে, রবীন্দ্রনাথ থেকেও আলাদা ক'রে দেখেছি, রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বেশি কবি ভেবেছি অনেকসময় (কেননা কবিতা বাদে রবীন্দ্রনাথের ছিলো আরো অনেক দায়িতা), হঠাৎ তাঁর মৃত্যুর বছর বিশেক পরে, তাঁর স্বাক্ষরিত একটি আস্ত-সমস্ত উপন্যাস পেয়ে আমরা বিহ্বল হ'য়ে যাই।

কিন্তু কবিতা ও গদ্য—জীবন কি এ-রকম কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার? তা তো নয়। গদ্যের ধুলোমাটি পেরিয়েই-তো কবিতার বালাখানায় প্রবেশ করতে হয়। আর কবি, যে-স্বপ্নমহলেই তাঁর অধিবাস হোক-না, তাঁকেও তো বাস্তব জীবন যাপন করতে হয়: জীবিকার ধান্দায় ঘুরতে হয়, হ'তে হয় কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্যের ক্রীতদাস, জীবিকার জোয়ালে ঘুরতে হয়, স্যাণ্ডেল ধুলোয় ভ'রে যায়, জীবিকার মার সইতে হয়, পাজামায় লাগে কাদার ছিটে। কিন্তু আরো: স্বপ্নমহল ও বস্তুমহল—এদের মধ্যে কি যোজন ফারাক? তা-ও-তো নয়: বাস্-এর পা-রাখা-যায় না ভিড়ের মধ্যেও মাথার ভিতরে কবিতার পঙক্তি চলাফেরা করে, বাজারের দরাদরির ফাঁকে হঠাৎ মনটা কোথায় উদাস হ'য়ে চ'লে যায় কতো মাইল দূরে, তারা-ভরা আকাশ গাটিধসন্তের মতো মনে হয়। এই-যে দুই মহল পরস্পরের ভিতর ঢুকে আছে—এই-তো জীবন। গদ্যে আর কবিতায় এদের আলাদা ক'রে রাখবো কি ক'রে? তাই গদ্যের ভিতরেও স্বপ্নের সংক্রাম, তাই কবিতার মধ্যেও বস্তুর দংশন। কবিতা আর গদ্য—এর মধ্যেও, তাই, দুই মহল। জীবনানন্দকে যদি বলি স্বপ্নমহলের কবি, তাহ'লে ঈশ্বর গুপ্তকে বলবো বস্তুমহলের কবি। কিন্তু স্বপ্নমহলের কবিও কি অন্তত কখনো-কখনো বস্তুমহলে পদার্পণ করেননি? সেই পদচিহ্ন ধ'রে রেখেছে জীবনানন্দের উত্তরকালিক কবিতা, জীবনানন্দের গল্প, জীবনানন্দের উপন্যাস।

অথবা কবির মধ্যেই থাকে দুই ডানা: কল্প-ডানা আর বস্তু-ডানা। ছিলো রবীন্দ্রনাথেরও: একাধারে ছিলেন তিনি "বলাকা"-র কবি আর

"পুনশ্চ"-র কবি ; নজরুলের : "জিঞ্জীর" আর "বুলবুল" ; অজিত দত্ত বা ফররুখ আহমদ-এর একদিকে রোমান্টিক সুদূরকল্পনা, অন্যদিকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-রগড় আর তামাশার কবিতা ; বিষ্ণু দে-তে সারাক্ষণ উভয়ের দাম্পত্য-কলহ ; "ধূসর পাণ্ডুলিপি"-র কবিও "সাতটি তারার তিমির"-এর কবি। তবু গদ্যে হয়তো বস্তু-ডানা আর-একটু ভালো ক'রে পাখা মেলতে পারে। তাই উপান্ত্য-জীবনানন্দ কবিতায় যেমন বাস্তব জীবনকে মূল্য দিতে থাকেন, তেমনি ধরেন কথকতারও পথ : লেখেন কএকটি গল্প ও উপন্যাস। "ঝরা পালক" বা "ধূসর পাণ্ডুলিপি"-র কবির কল্পবেহেশত ধুলো-মাটির এই দারুণ দোজখের দিকে নেমে আসতে থাকে। আমরা সকলেই কি আমাদের স্বরচিত মনো-বেহেশত থেকে একদিন এই বস্তু-নামা ধরার ধুলোর দোজখের আগুনে এসে পড়ি না ?

জীবনানন্দের উপান্ত্য কবিতাগুচ্ছে বস্তুর সেই ক্রমাগত দখল আমরা বোধ করি না কি, উঠে আসে না কি সেই স্বর্গপতনের পঙক্তিনিচয় ?—

১. জীবনকে সকলের তরে ভালো ক'রে
পেতে হ'লে অবসন্ন ম্লান পৃথিবীর মতো
অম্লান অক্লান্ত হ'য়ে বেঁচে থাকা চাই।
একদিন স্বর্গে যেতে হতো।

[পৃথিবীতে, শ্রেষ্ঠ কবিতা]

২. মনে হয় এর চেয়ে অন্ধকারে ডুবে যাওয়া ভালো।
এইখানে
পৃথিবীর এই ক্লান্ত এ অশান্ত কিনারার দেশে
এখানে আশ্চর্য সব মানুষ রয়েছে।
তাদের সম্রাট নেই, সেনাপতি নেই ;
তাদের হৃদয়ে কোনো সভাপতি নেই ;

[এইসব দিনরাত্রি, শ্রেষ্ঠ কবিতা]

৩. মানুষের সকল ঘটনা গল্প নিষ্ফলতা সফলতা যদি হাইড্রোজেনে
পুড়ে ছাই হ'য়ে যায় তবে হ'য়ে যাক :
এ-রকম অপূর্ব অপ্রীতি চারিদিকে
আমাদের রক্তের ভেতরে অনুরণিত হচ্ছে।

[এইখানে সূর্যের, ঐ]

৪. দিনের আলোয় ওই চারিদিকে মানুষের অস্পষ্ট ব্যস্ততা :
পথে-ঘাটে ট্রাক ট্রামলাইনে ফুটপাতে ;

কোথাও পরের বাড়ি এখুনি নিলেম হবে—মনে হয়,
জলের মতন দামে।
সকলকে ফাঁকি দিয়ে স্বর্গে পৌঁছুবে
সকলের আগে সকলেই তাই।

[১৯৪৬-৪৭, ঐ]

৫. মৃত্যু আজ নারীনর্দমার ক্বাথে ;
অন্তহীন শিশুফুটপাতে ;
আর সেই শিশুদের জনিতার কিউক্লীবতায়।

[মানুষের মৃত্যু হ'লে, ঐ]

বারংবার এইসব উচ্চারণ উৎকীর্ণ হ'লো বস্তুপ্রেক্ষিতের অমসৃণ গাত্রে ; স্বপ্নকল্পনার দেশ-থেকে-আসা কবির চোখে সমস্ত ধ্বংস-ভ্রংশ হ'য়ে যেতে লাগলো। তাঁর গল্পগুলো এই সময়ে লেখা। আমাদের আলোচ্য কবির "মাল্যবান" উপন্যাসটিও ১৯৪৮ সালে রচিত।

কবির মধ্যপর্যায়ী কবিতাগ্রন্থ "মহাপৃথিবী" (১৯৪৪) থেকে শহর হ'য়ে উঠেছিলো কবির কবিতার এক প্রধান পটভূমি—আরো স্পষ্ট বললে : কলকাতা মহানগরী। স্মরণীয় : কবি নিজেও ততোদিনে বরিশালের নিসর্গপ্রকৃতি থেকে কলকাতার ইট-কাঠ-পাথরের কৃত্রিম স্বর্গে গিয়ে উঠেছেন। বস্তুত "মহাপৃথিবী"র প্রধান লক্ষণগুলোর বেশ কএকটিই কবির গল্পউপন্যাসের প্রধান লক্ষণ হ'য়ে ওঠে : (ক) শহরমনস্কতা ; (খ) শেলষে-রগড়ে-তামাশায় মিশোল বাক্‌পদ্ধতি ; (গ) হেমন্ত নয়—শীত এখন হ'য়ে ওঠে কবির ঋতু ; (ঘ) শুধু শীত নয়—শীতরাত্রি ; (ঙ) এক ধরনের বস্তুময়তা—বিষয়ে ও বাক্যে, স্বপ্নকল্পনাও তার ভিতরে জড়িত-মিশ্রিত ; (চ) ফেলে-আসা নিসর্গপ্রকৃতির জন্যে মায়া ও পিছন-টান ; (ছ) মৃত্যুভাবনা ; (জ) নারীর প্রতি বিতৃষ্ণা, বিদ্রূপ ও ঘৃণা : (ঝ) জীবনকে নিরাশাতুর জেনেও এক ধরনের সহিষ্ণুতা, স্রোতের প্রতীপে অগ্রসরমান গহন ইলিশ : জীবনপিয়াসা।

অতঃপর, সংক্ষেপে উপন্যাসটির আখ্যানের পরিলেখ তৈরি করা যাক। কাহিনী শুরু হয়েছে উপন্যাসের নায়ক মাল্যবানের বিয়াল্লিশতম জন্মদিনের নির্ঘুম শীত-যামিনীর বর্ণনায়। আমরা জানতে পারি কলকাতায় তার দোতলা ভাড়াটে বাড়ি, তার স্ত্রী উৎপলা, তার ফেলে-আসা গ্রামজীবনের জন্যে মায়া ও পিছুন-টান। সমস্ত উপন্যাসটির কেন্দ্রভূমি দোতলা এই ভাড়াটে বাড়িখানি ; এবং মাল্যবান ও উৎপলা এই অসমমানসিক স্বামী-

স্ত্রীর দাম্পত্য যাপন : সারা উপন্যাসটি স্ত্রী-কর্তৃক স্বামীনির্যাতনের—গালিগালাজে ও কাজে—এক অসম্ভব শ্বাসরোধ-করা বুক-চাপা গলা-টেপা আলেখ্য : উৎপলা তার স্বামীকে পাত্তা তো দ্যায়ই না, ঘৃণা—না, তারো বেশি, করুণা করে। উৎপলা থাকে দোতলায়, ওদের মেয়ে মনুকে নিয়ে ; এক-তলায় মাল্যবান, একা ও আলাদা। কন্যার টানে কি উৎপলার আকর্ষণে রাত-বিরেতে যদি দোতলায় উত্তীর্ণ হয় মাল্যবান তাহ'লে আর রক্ষা নেই : উৎপলা তাকে রীতিমতো নাজেহাল ক'রে ছাড়ে। দোতলার বাথরুমে স্নানের অধিকারও নেই মাল্যবানের, তাকে সেই মালিন্যমুক্তি মেটাতে হয় নিচের তলার চৌবাচ্চার ঠাণ্ডা ও বাসি পানিতে। চিড়িয়াখানায়, সিনেমায় বা পাশের বাড়ির শিশু শেলাইকল চাইতে এলে উৎপলা যে-দৃশ্যের অবতারণা করে, তাতে তাকে এক দজ্জাল, অদ্ভুত, হাড়-জ্বালানো, তিতোবিরক্ত মেয়েমানুষ ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। তারপর উৎপলার আত্মীয়রা এলে স্থানাভাবে মাল্যবানের এমনকি এক-তলার অবস্থানটিও খ'শে যায়, নিজের বাড়ি ছেড়ে তাকে চ'লে যেতে হয় মেস্-এর আশ্রয়ে। উৎপলার কাছে কথায়-কথায় গাল খায় মাল্যবান, পদে-পদে অপমানিত হয়, বোঝে 'তার জীবনের সারাৎসার মুহূর্তে তার স্ত্রী কোনো কাজে লাগে না'—তবু, সব সত্ত্বেও উৎপলাকে ছেড়ে যেতে পারে না সে, তাকে এক-রকম ভালোই বাসে, মেস-এ থাকতে তার ও মেয়ের তত্ত্বতালাশ নিয়ে যায় নিয়মিত, মেয়ে রোগা হ'য়ে যাচ্ছে সেই উদ্বেগে ভোগে, স্ত্রীহীন জীবন—সব সত্ত্বেও—কল্পনা করতে পারে না। উপন্যাস শেষ হয় এই মর্মে, যে, উৎপলাকে সহ্য ক'রে উৎপলাকে অচ্ছেদ্য জড়িয়ে ভিতরে-ভিতরে অনবরত জখম হ'তে-হ'তে মাল্যবানকে চালিয়ে যেতে হবে জীবন।

এই-তো কাহিনী : এক হিশেবে অতিসাধারণ : এক দজ্জাল ও জাঁহাবাজ মেয়েমানুষের স্বামী-নির্যাতনের গল্প। অতিসাধারণ ব'লেই হয়তো এ নিয়ে একখানি দুশো পৃষ্ঠার উপন্যাস বানিয়ে তোলা যায়, এটা ভেবে ওঠা যায় না। কিন্তু ঠিক এ ধরনের উপন্যাস আমরা পড়েছি কি? এই নেহাৎপ্রাকৃত কাহিনীর মধ্যেই কি জীবনানন্দ পুরে দ্যাননি অসামান্যের অন্তঃসারাংশ? স্থানে-স্থানে এর মধ্যে খচিত হ'য়ে যায়নি কি মানবপ্রাকৃতিক বিদ্যুচ্চমক? আর সমস্ত মিলে কবি জীবনানন্দ দাশের জীবনাদর্শ আর কবিতাভিজ্ঞান?

কাহিনীর প্রধান কুশীলব মাল্যবান আর উৎপলা, শেষ পর্যন্ত উৎপলাও নয়—মাল্যবান। উৎপলা, যার বাক্যে-ব্যবহারে বিরামহীন বিষ ঝরছে, তাকে

কবি এঁকেছেন একেবারে কৃষ্ণ বর্ণে : এতোটুকু ভালো নেই তার : স্বামীকে তো উঠতে-বসতে গালাগাল দিচ্ছেই, বিদ্রূপ করছেই, তার জীবন মাল্যবানের হাতে প'ড়ে বরবাদ হ'য়ে গেলো ব'লে দুঃখ করছেই ; মেয়েও তার অযত্নে অবহেলায় রোগা হ'য়ে যাচ্ছে দিন-দিন ; সিনেমায় কি চিড়িয়াখানায় বেড়াতে গেলে অন্য আগন্তুকদের উপর দারুণ বিরূপ হ'য়ে ওঠে সে ; প্রতিবেশীর ছোটো মেয়েটিকেও সে নাস্তানাবুদ না-ক'রে ছাড়ে না ; আর তার স্বভাব-চরিত্রও আদর্শিক নয় মোটেই—তার একমাত্র দরদ ও সহানুভূতি তার বাপের-বাড়ির লোকজনের প্রতি। উৎপলার চরিত্র কালো রঙের অংকনের জন্যে একটির পর একটি উপকরণ জড়ো করেছেন কবি, একের পর এক সমাবেশ ঘটিয়েছেন তার হৃদয়হীনতা তার স্থূলতা তার দুশ্চরিত্রতা প্রকাশের জন্যে। সন্দেহ নেই : যে-কোনো কারণেই হোক শিল্পের সংযম সাহিত্যের আরাধ্য বাচংযম রক্ষা করেননি কবি, আমাদের বুঝতে দেরি হয় না, যে, উৎপলার উপর কবি নিজেও হাড়ে-চটা। তবু, শিল্পনিয়ম লাফিয়ে পার হ'য়ে গিয়েও, কবি যে-বক্তব্য তুলে ধরতে চাচ্ছেন যে-জীবনযাপনের ছবি ফলাতে চাচ্ছেন তার জন্যে এরকম চিত্রণকেই স্বাভাবিক ব'লে মানতে বাধ্য হই আমরা। (প্রসঙ্গত, এই অতিকালোয়-রঞ্জিত চরিত্র অংকনের ত্রুটির সঙ্গে কবি-র আর একটি দোষ নির্দেশ করা যায়, যে, উপন্যাসটি যেন খানিকটা ছকে-বসানো এবং ঘটনা উদ্ভাবনে গরিব : যেমন, স্ত্রীর মৃত্যুকল্পনা করতে-করতে এক প্রতিবেশীর পত্নী লোকান্তরিত হন এবং মাল্যবানের উপর তার প্রতিক্রিয়া পড়ে।)

বইএর নামকরণে এবং কথিত বর্ণনাচরণে মাল্যবানই এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্রপাত্র—অপরাপর চরিত্রেরা মাল্যবানের জীবন-জগৎ উপলব্ধির মাধ্যম মাত্র, মাল্যবানকে ঘিরে যেন কএকটি জীবিত পুতুল। এদিকে, মাল্যবান চরিত্রটি অদ্ভুত, বিচিত্র, অস্বভাবী : ঠিক এ-রকম চরিত্র বাংলা সাহিত্যে এর আগে দেখিনি। বইএর শুরুসূচনাতেই তার সম্বন্ধে ব'লে নিয়েছেন কবি : 'মাল্যবানের স্বভাব ফটফটে ফিটকিরির মতন, অযথা হৈ-চৈ হিংসার ছোব ভালো লাগে না তার। শান্তি ভালোবাসে : নিজের সুখ-সুবিধে অনেকখানি ছেড়ে দিয়েও।' (পৃ ১০) তার মধ্যে মাঝে-মাঝে উথলে ওঠে নষ্টালজিয়া যে-দূর কবেকার পাড়াগাঁ ফেলে এসেছে কোন অতীতে, তার জন্যে ; বর্তমানের দু-একজনকে নিয়ে, নিজেকে নিয়ে, বৌকে নিয়ে একটু-আধটু রঙ্গব্যঙ্গও করে ; অফিসে কাজ ক'রেও অন্য কর্মচারিদের সম্বন্ধে তার মধ্যে প্রায় ঘৃণা ও করুণাই কর্মশীল, অন্যদের

চেয়ে সে আলাদা এবং এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন; সর্বোপরি তার আছে এক অতিসংবেদনশীল মনোচেতনা—যার তারে ক্ষীণ আঘাত লাগলেও দীর্ঘক্ষণ বাজতে থাকে,—যার ফলে তার আত্মায় লেগেছে গেরুয়া-রঙ : 'মনটা তার অনেক সময়ই একটা মুনিয়ার বা মেঠো ইঁদুরের মতো আকাশে-আকাশে ফসলে-ফসলে ভেসে যেতে চায়।' (পৃ ২৯) মাল্যবানের চরিত্র উজ্জ্বল প্রকাশিত হয়েছে স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহারে : উৎপলা তার সঙ্গে যতো কটু ব্যবহারই করুক, যতো দুর্বাক্যই শোনাক মাল্যবানের মুখে জবাব জোগায় না, উৎপলার কাছে হৃদয় খুলে দিলেও সে কেবল প্রতিহতই হয়, বরং উল্টো কঠিন বিদ্রূপে বেঁধে—তবু, তাহ'লেও, উৎপলাকে সে ভালোবাসে, সহ্য করে, অনুভব করে উৎপলার সঙ্গে জীবন অবিচ্ছেদ্য জড়িয়ে গেছে তার : 'উৎপলাকে নিয়ে তার চলবে না কিছুতেই, তবুও চালাতে হবে মৃত্যু পর্যন্তই।' (পৃ ২৫) বিবাহিত মাল্যবান ভেবেছে ভালো ছিলো তার একা-একাই কাটিয়ে দেওয়া; আত্মহননের চিন্তাও জ্ব'লে উঠেছে একবার, উৎপলারই কারণে, কিন্তু শেষপর্যন্ত ও-পথে এগোয়নি; হ'য়ে উঠেছে ক্রমশ সহিষ্ণু এক 'মাল্যবান-পর্বত'।

এইখানে, আমরা না-ভেবে পারি না, তাহ'লে কি মাল্যবান মর্ষকামী? মাল্যবান কি মর্ষকামী নয়? সে কেন বিনা প্রতিবাদে সমস্ত-কিছু মেনে নেয়? উৎপলাকে অসহ্য জেনেও কেন সে তার মৃত্যু পর্যন্ত কল্পনা করতে পারে না? তার ক্ষমাশীলতা কি দুর্বলতার ছদ্মনাম নয়? তার আত্ম-দরদের সঙ্গে আত্মকরুণাও মিশ্রিত নয় কি? তার স্ত্রীর প্রেমিক কি স্ত্রীর শরীরপ্রেমিক (এই তথ্যটি কবি চমৎকার আবছায়ায় ও রহস্যগুণ্ঠনে রেখে দিয়েছেন) তারই ঘরে সাইকেল রেখে উঠে চ'লে যায় দোতলায় তার স্ত্রীর শয়নঘরে এবং সেখানে কাটায় মধ্যনিশীথ অবধি :—এইসবই সে নিশ্চুপে দেখছে, হয়তো, বইএর শেষ অধ্যায়ে, অভিযোগও আনছে—কিন্তু সে-অভিযোগের সুর এমন তেজহীন এমন নিঃসহায়, যে, প্রমাণ হয় নিষ্ক্রিয় সে, ঘটনার উপর তার কোনো হাত নেই, নিজের স্ত্রীর উপরেও জোর নেই। তবু এই নিষ্ক্রিয় মনোভুবনের বাশিন্দা ব্যক্তিটি কি সামান্য ও নিরুপাধি একজন? সন্দেহ নেই : উৎপলার অত্যাচার স'য়ে, কষ্ট পেয়ে, কষ্টের ভিতর হর্ষ পেয়ে, মাল্যবান, শেষ-পর্যন্ত, প্রমাণ করে সে মর্ষকামী। 'ঘরের ভেতর নারীসোনালিব্যাঘ্রের হিংস্রতায়, হৃদয়হীনতায় কেমন একটা নিপট নিগূঢ় তৃপ্তি পায় সে।' (পৃ ১৩৯) এই পরিতৃপ্তি দ্বিধাহীনভাবে মর্ষকামিতার পরিচায়ক। তবু, তাহ'লেও,

মাল্যবান সামান্য চরিত্র নয় : তাকে মনে হয় উপনিষদ-কথিত সেই দ্বিতীয় বিহঙ্গ যে কেবল দেখে যায়, উপলব্ধি ক'রে যায়, ঘটনায় সক্রিয় অংশ নেয় না, ঘটনাকে নিজের মনে ঘটতে দিয়ে বাড়িয়ে চলে তার আত্মিক অভিজ্ঞান। তার অফিসের অন্য কেরানিদের জীবন মসৃণ নির্বিবাদ নিরুপদ্রব চলছে ব'লে সে ঈর্ষা বোধ করে না, অনুভব করে করুণা, কেননা 'উৎপলার সম্পর্কে এসে জীবন ধাক্কা আঘাত উপলব্ধির ভেতর দিয়ে চলেছে।' বস্তুত উৎপলা 'বস্তুপৃথিবী'র বাসিন্দা ; মাল্যবান 'প্রতীক-পৃথিবী'র ('বস্তুপৃথিবী' ও 'প্রতীক পৃথিবী' কথাদুটি জীবনানন্দ এই উপন্যাসেই ব্যবহার করেছেন)। এই দুয়ের সংঘর্ষে চেতনার দরোজা খুলে যায়, বহুতল সংবেদন কম্পিত-প্রতিকম্পিত হয়। উৎপলা, তাই, মাল্যবানের কাছে হ'য়ে ওঠে বোধ-অনুভব-উপলব্ধি-অভিজ্ঞতার কারণিক শক্তি ; তাই, উৎপলার কাজে সে প্রতিবাদ করে না, বাধা দ্যায় না, তাকে এক ধারক-যন্ত্রের মতো ব্যবহার ক'রে অন্য-এক দিগন্তের সঙ্গে পরপারের সঙ্গে যোগ স্থাপন করে—উৎপলা যার খোঁজও রাখে না। এভাবে উৎপলা হ'য়ে ওঠে তার জীবনপ্রতীক, উৎপলাকে সহ্য ক'রে সে জীবনকে সহ্য করতে শেখে ; এভাবে উৎপলা হ'য়ে ওঠে তার কাছে শুধু প্রয়োজনীয় নয়—আবশ্যিক।

কবি জীবনানন্দ দাশ এই উপন্যাসের ছত্রে-ছত্রে—বিষয়ে, বক্তব্যে, বিন্যাসে—উপস্থিত। এই উপন্যাসের অনুধাবনে জীবনানন্দের শেষদিকের বেশ-কিছু কবিতার—এবং সমগ্র জীবনানন্দ দাশেরও—ভিতরার্থ খুলে যায় : এখন বোঝা যায় কেন তিনি লিখছেন—১. দীনতা : অন্তিম গুণ, অন্তহীন নক্ষত্রের আলো। (এইসব দিনরাত্রি, শ্রে. ক.) ; ২. জীবনকে সকলের তরে ভালো ক'রে/পেতে হ'লে এই অবসন্ন ম্লান পৃথিবীর মতো/অম্লান, অক্লান্ত হ'য়ে বেঁচে থাকা চাই। (পৃথিবীতে, শ্রে. ক.) ; ৩. কোথাও আঘাত ছাড়া—তবুও আঘাত ছাড়া অগ্রসর সূর্যালোক নেই। (সময়ের কাছে, শ্রে. ক.)। কিংবা আরো .

> কোনোদিনও যে জেগে উঠতে হবে না আর, শীত যা সবচেয়ে ভালো, এই বিশৃঙ্খল অধঃপতিত সময়ে সমাজে রাতের বিছানা যা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, সেই শীতরাতের কোনোদিন শেষ হবে না আর, উৎপলা সব সময়ই মাল্যবানের সময় ঘেঁষে থেকে যাবে অনিঃশেষ শীত ঋতুর ভেতর।
>
> [পৃ. ২০০]

এই লাইনগুলিতে প্রতিধ্বনিত হয় কবিরই কবিতার কএকটি পঙক্তির রণন :

অরব অন্ধকারে ঘুম থেকে নদীর চ্ছলচ্ছল শব্দে জেগে উঠবো না আর ;
তাকিয়ে দেখবো না নির্জন বিমিশ্র চাঁদ বৈতরণীর থেকে
অর্ধেক ছায়া গুটিয়ে নিয়েছে
কীর্তিনাশার দিকে।
ধানসিঁড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়ে থাকবো—ধীরে—
পউষের রাতে—কোনোদিন জাগবো না জেনে—
কোনোদিন জাগবো না আমি—কোনোদিন আর।

[অন্ধকার, বনলতা সেন]

অথবা :

হয়তো দু চার মাস বয়েস এই ছানাটির, মা নেই, ভাইবোন কিছু নেই—

[পৃ ১৩৮]

তুলনীয় :

আমারি পায়ের কাছে ঘাসে
পড়ে গেল—ভাই বোন আর কেউ অসীম আকাশে
নাই তার ?

[২১/জীবনানন্দ দাশের কবিতা]

আর দুএকটি দিবগুচ্ছ সাজিয়ে তোলা যায় :

১. মাল্যবানের নিজের দোষ নয় ; ঘুমেরও দোষ নয় ; এই পৃথিবীরই দোষ, শতাব্দীর দোষ ;—

[পৃ ১৮৬]

নদীরা যে নেই আজ পৃথিবীতে—সূর্য নেই—
সব এই জ্ঞানহীন সময়ের দোষ।

[দুর্দিন /৩৫, জীবনানন্দ দাশের কবিতা]

২. মানুষ না হয়ে সে যদি সারস হত তাহলে কৌচে না ব'সে কোন যুগে ওদের ঐ নীড়ে ঝাপটে ব'সে থাকত সে।

[পৃ ২১]

আমি যদি হতাম বনহংস,
বনহংসী হতে যদি তুমি ;

[আমি যদি হতাম, ব. সে.]

উপন্যাসের ৮২ পৃষ্ঠায় উক্ত 'অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত অন্ধকার' বাক্যগুচ্ছ তাঁর কবিতায় 'অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমির' রূপে বহুবার ব্যবহৃত ('নাবিকী', 'সূর্যপ্রতিম', সা. তা. তি. ; রবীন্দ্রনাথ/৫৪, জীবনানন্দ দাশের কবিতা)।

আবহমান বুদ্ধদেবে, পূর্ব-জীবনানন্দে দ্রষ্টব্য কেবল ললিত-মধুর-চারু শব্দ ও বাক্যের ক্বণন ও ঝংকার ; জীবনানন্দের মধ্যপর্যায় থেকে ভাষার লালিত্যের সঙ্গে মিশ খেয়েছে প্রাকৃত রুক্ষ দেশজ শব্দ আর বাঁকা মশকরা। কবি গল্পউপন্যাসে হাত দ্যান তাঁর এই মধ্যপর্যায়ে : তখন তাঁর ভাষায় যেমন একাধারে লালিত্য আর কর্কশতার সমাবেশ, তেমনি তাঁর বিষয়ও আর অবিমিশ্র নিসর্গকেন্দ্রী নয়, বরং মানুষমুখ্য : "মাল্যবান" উপন্যাসে নিসর্গপ্রকৃতি উপস্থিত ক্ষীণ পটশোভায় কিংবা স্মৃতিসূত্রে। "মাল্যবান" উপন্যাস থেকে কবির ঐ দুধরনের বাক্‌ব্যবহারের কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ললিত-মধুর-চারু শব্দসমাহৃতি ; লক্ষণীয় এর প্রসঙ্গও দূরাভাসিত :

১. আকাশে অনেক তারা, বাইরে অনেক শীত, ঘরের ভেতরে প্রচুর নিঃশব্দতা, সময়ের কালো শেরওয়ানীর গন্ধের মতো অন্ধকার ; বাইরে শিশির পড়ার শব্দ, না কি সময় বয়ে যাচ্ছে ; কোথাও বালুঘড়ি নেই, সেই বালুঘড়ির ঝিরি-ঝিরি শিরি-শিরি ঝিরি-ঝিরি শব্দ : উৎপলার ঠাণ্ডা সমুদ্রশঙ্খের মতো কান থেকে ঠিকরে—মাল্যবানের অন্তরাত্মায়।

[পৃ ২৬-২৭]

২. ...লক্ষ্মীপেঁচা ডাকতে থাকে, ঘুম ভেঙে গিয়ে দাঁড়ালে দেখা যায় শীতের কুয়াশায় সে কোন অন্তিম পোচড়ের ফাঁকে-ফাঁকে বৃহস্পতি কালপুরুষ অভিজিৎ সিরিয়াস যেন লণ্ঠন হাতে ক'রে এখান থেকে সেখানে, সেখান থেকে এখানে কোন সুদূরযানের পথে চলেছে; কেমন একটা আশ্চর্য দূর পরলোকের নিক্কণ শোনা যায় যেন। কোনোদিন কুয়াশা কম—শাদা মেঘ আছে—একফালি গড়ানো মেঘের পাশে—নিজের কেমন যেন একটা বৃহৎ আলোর শরীর নিয়ে থেমে আছে চাঁদ।

[পৃ ১৫]

উল্টোদিকে, প্রাকৃত বিষয়াসক্ত বাঁকা মশকরায়, দেশজ শব্দে গাঁথা বাক্‌-পদ্ধতি :

১. স্টিক হাতে নিয়ে গোলদীঘিতে ঘুরতে-ঘুরতে মনে হয় একটি বড়ো বাজপেয়ে সভায় বেশ মার্জিত ভঙ্গিতে আবেগের বিরাট

দূরত্ব নয়

অকূল পাথারে নিজেকে আশ্চর্যভাবে নিয়ন্ত্রিত ক'রে বক্তৃতা দেবার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে তার; পোলিটিকসে বাঙালীরা আজকাল গুজরাটি মারাঠি মাদ্রাজী ইউ-পিঅলাদের কাছে পদে-পদে ভুডভু খেয়ে ফিরছে—ভাবতে ভাবতে রক্ত কেমন যেন হয়ে ওঠে তার, বাঙালীর মানসম্মান ফিরিয়ে আনবার জন্যে বড়ো নয়াল আগুনের মতো দাউ-দাউ ক'রে উঠতে ইচ্ছা করে তার—বিপ্লবের থেকে বিপ্লবে—ফ্রান্স রুশ স্পেন চীন সমস্ত বিপ্লবের—হয়ে—স্তনাগ্রচূড়ায় নতুন দুগ্ধের উল্লাসে নবীন পৃথিবীর জন্যে।

২. রাতের বেলাটাও তার তাদের মতোই কেটে যেত, যদি উৎপলার মতো একজন 'সত্তমা' স্ত্রী এসে বাদ না সাধত। উৎপলার সম্পর্কে এসে জীবন ধাক্কা আঘাত উপলব্ধির ভেতর দিয়ে চলেছে। এ না হলে সে তার অফিসের মাইতি-দে-গড়গড়ি-গুঁইবাবুদের মতো এঁড়ি-গেঁড়ি বাচ্চায় ঘর ভ'রে ফেলে সিঁদুর-ধ্যাবড়ানো ফোকলাদেঁতো শাঁকচুন্নীদের নিয়ে ঘর করত।

প্রসঙ্গত, এই উপন্যাসে আপাহিল-অন্তিমা অজস্র প্রাকৃত ও দেশজ শব্দধারা ছুটেছে :

ফালিকাং ; মইমারণ হইমারণ (ব্যাপার) ; জাঙ্গাল ; গ্যাঁজ ; ভুডভু ; হাঁকড়ায় ; ঝুমঝুর (দিয়ে ওঠে মন) ; নিখেট ; দাবনা ; ড্যাকরা ; মিনসে ; ন্যাকরা (ভুল বানান মুদ্রিত হয়েছে : 'ন্যাকড়া') ; উম[২] ; এক-বগ্‌গা ; গায়ের ঝাল ; ন্যাতা-জোবরা ; জলচাকি ; দেইজিপনা ; হেঁসেল ; ছ্যাঁচড়া ; প্যাং-পিঁড়ি ; ক্যাঁকড়া ; (কচ্ছপের) চাড়া ; ঠুঁটো ; রেতো ; খোনা ; খেমটা ; উচ্চুণ্ডে ; ন্যালা (কুকুর) ; ঢেস্কেলে ; ড্যাবড়া ; বয়রা (ভুল বানান মুদ্রিত হয়েছে : 'বয়ড়া') ;

---

[২] শব্দটির প্রয়োগ আছে তাঁর কবিতায়ও :

হিমের রাতে শরীর 'উমু' রাখবার জন্যে
দেশোয়ালীরা সারারাত মাঠে আগুন জেবেলেছে—

[শিকার, ব. সে.]

খিঁচুনি ; বেচাল ; ফাঁড়ন-ফোঁড়ন ; বেটপকা[৩] ; ধাষ্টামো ; বিতিকিচ্ছি ; ঘেসড়ে ; চিলতি-চিলতি (মাঠ) ; নয়াল ; নিঝোর ; ফলসানি ; ন্যাবা ; (চোখ) পাঁজলাচ্ছে ; তুড়বুড়ো ; ধুমসো ; হুস্‌কে ; পোচলা ; পট্টি ; চোখুম্পি ; উড়চুঙো ; এাড়িগেঁড়ি ; পেটোয়া ; ন্যালাভ্যালা ; চোপা ; হিরিগিরে ; মরুণ্ডে ; হুজ্জোৎ ; সেপাট ; সিটে ; ধুণ্ডে ; আত্তি ; তড়পে ; মুনিষ ; হুড়োড়।

এইভাবে তাঁর ভাষায় এসেছে পদে-পদে নূতন শব্দের ঝিলিক, শব্দের বেট-পকা খোঁচা, মার্জিত শব্দাবহে হঠাৎ-হঠাৎ বর্বর শব্দ,—এম্নিভাবে চলেছে পদে-পদে ভাষার পুনরাবিষ্কার, শব্দের নূতন অর্থারোপ, তাঁর বিশেষণ-শব্দের বিস্ময়-বিদ্যুতি ব্যবহার :

১. মাল্যবানের মনে হল লরির এই লবেজান আওয়াজেরও একটা সার্থকতা আছে।

[পৃ. ১৩]

২. ছিটক হাতে নিয়ে গোল-দীঘিতে ঘুরতে-ঘুরতে মনে হয় একটা বড়ো বাজপেয়ে সভায় বেশ মার্জিত ভঙ্গিতে আবেগের বিরাট অকূলপাথারে নিজেকে আশ্চর্যভাবে নিয়ন্ত্রিত ক'রে বক্তৃতা দেবার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে তার।

[পৃ. ১৬]

৩. 'পুরুষ মানুষ' হয়ে এ-সব মেয়েদের কাছে জীবনের বড়ো-সড়ো হড়ামদড়াম কথা ছাড়া কোনো মিহি কথা বলতে যাওয়া ভুল।

[পৃ. ৩৪]

৪. কেমন কানাভাঙা খোনা খেমটা উত্তেজের অবসাদে মাল্যবানের মন ভারী হয়ে উঠতে লাগল। নিজে সে বাপ হয়েছিল—বিয়ে করে-ছিল—হীন কুৎসিৎ উচ্ছুণ্ডে জীবনবীজ ছড়িয়েছিল ভাবতে-ভাবতে মন তার চড়চড় করে উঠল।

[পৃ. ৪৭]

৫. একটা ঘোলা নিশ্বাস ফেলল উৎপলা।

[পৃ. ৫০]

[৩] শব্দটির প্রয়োগ আছে তাঁর কবিতায় :

ইন্দ্রের আসনে বেটপকা অন্তত বসা যায়
শুল্ক আয়কর সুদ—বেশি ধুদ অল্পকে অস্পষ্টভাবে দিলে।

[এইখানে সূর্যের, প্রে. ক.]

৬. উৎপলার জীবনের বিভীষিকাচ্ছন্ন নিষ্ফলতা...

[পৃ. ৫৫]

৭. কেমন অদ্ভুত বিশালাক্ষ অস্বস্তিতে সে চারদিকে তাকাতে লাগল।

[পৃ. ১২৫]

৮. ...তখন থেকেই এটার ভেতরে কেমন একটা শ্রীছাঁদের বাপান্ত গরমিল বেরিয়ে পড়ল।

[পৃ. ১৩৬]

৯. মাল্যবানের মত মানুষের জীবনেও এ ব্যাপারটার অখাদ্য অপরাধের তীক্ষ্ণতা দিনরাতের বর্ষা খেতে-খেতে নষ্ট হয়ে ক্ষয় পেয়ে গেল।

[পৃ. ১৪৩]

১০. কিন্তু এতো পরলোকের এঁয়োতি নিবিড়তা—জীবন নদীর ওপারে—হয়তো হবে কোনো দিন—হয়তো হবে না।

[পৃ. ১৯৯]

শব্দ ও বাক্যবন্ধের পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে ক্লান্তিদ্যোতনা প্রস্ফুট ক'রে তুলতেন কবি তাঁর কবিতায়, এখানেও আছে মাঝে-মাঝে তার সাক্ষ্য; এরকম একটি স্বগতস্বাপ্নিক কথোপকথনের ধারা :

কোনোদিন শেষ হবে না, রাতের ?
না।
কোনোদিন শেষ হবে না আমাদের রাতের উৎপলা ?
হবে না। হবে না।
শীতের রাত ফুরুবে না কোনোদিন ?
না।
কোনোদিন ফুরুবে না শীত, রাত, আমাদের ঘুম ?
না, না, ফুরুবে না।
কোনোদিন ফুরুবে না শীত, রাত, আমাদের ঘুম ?
ফুরুবে না, ফুরুবে না।
কোনোদিন ফুরুবে না শীত, রাত, আমাদের ঘুম ?
না, না, ফুরুবে না।
কোনোদিন ফুরুবে না শীত, রাত, আমাদের ঘুম ?
ফুরুবে না। ফুরুবে না। কোনোদিন—

[পৃ. ২০০-২০১]

কি-রকম ব্যথিত বিমর্ষ ব্যর্থ-সফল মন্ত্রধ্বনির মতো মনে হয় এই পঙক্তি-গুলি—কবিতার মতো। এরই মধ্যে শীত-রাত্রি-নিদ্রা প্রতীক হ'য়ে ওঠে

জীবনের বহমান নিষ্ফলতার, নির্গন্তব্য নিষ্ফলতার—সেই ফলহীনতাকেও আঁকড়ে ধরার আনন্দময় আস্বাদে। এরকমভাবেই কবির কবিতার 'বস্তু-পৃথিবী'র হেমন্ত একদিন 'প্রতীকপৃথিবী'র হেমন্তে রূপান্তরিত হ'য়ে গিয়েছিলো। উপর্যুক্ত পঙক্তিনিচয়কে 'স্বগতস্বাপ্নিক কথোপকথন' বলেছি এজন্যে, যে, এই বই-এর সংলাপসমূহ ঊর্ধ্বকমায় ঘেরা, কিন্তু এখানে ওরকম কোনো বেড়া বা বাঁধন নেই, একে মনে হয় স্বপ্নকথিত ও স্বপ্নশ্রুত বাক-গুচ্ছ, সর্বোপরি : কবির বক্তব্য এখানে নিঃশব্দ শিল্পশেখর ছুঁয়ে গেছে 'ক্লান্ত ক্লান্তিহীন' একগুচ্ছ পঙক্তিতে।

একটি মজার ব্যাপার চোখে পড়ে : এ উপন্যাসের পটভূমি যদিও শাহরিক, কিন্তু উপমাগুলি—জীবনানন্দের কবিতায় যার ব্যবহার প্রবল-প্রচুর—এসেছে গ্রাম ও নিসর্গ থেকে ; মনে হয়, আমাদের পক্ষে শিকড় উপড়ে ফেলা অসম্ভব ; উপরন্তু : জীবনানন্দের কবিতায় এ আরো তাৎ-পর্যবান এজন্যে, যে, কবি কোনোদিন নগর বা নাগরিক উপকরণগুলিকে নির্দ্বিধ ও সহর্ষ বরণ ক'রে নেননি, বরং তাঁর সমস্ত চিৎপ্রকৃতি ও আত্মা গ্রামে প্রোথিত, নিসর্গে প্রাণিত, এবং শহরে এসেও গ্রামনিসর্গোন্মুখ :

১. মশারীর খুঁট তুলে এদের খাটের পাশে পাড়াগাঁর পউষ-রাতের নিশ্চুপ ডানার পাখির মতো এসে স্নিগ্ধ নৈঃশব্দ্যে—এদের জাগিয়ে ?—বসে থাকতে চায়।

[পৃ ১৮]

২. তারপর বিছানার উপর উঠে ব'সে তার সমস্ত সুন্দর মুখের বিপর্যয়ে—মুহূর্তেই সে ভাবটা কাটিয়ে উঠে মরা বালির চেয়েও বেশি বিরসতায় বললে...

[পৃ ১৮-১৯]

৩. ঠাণ্ডা সমুদ্রশঙ্খের মতো কান...

[পৃ ২৭]

৪. মনটা তার অনেক সময়ই একটি মুনিয়ার বা মেঠো ইঁদুরের মতো আকাশে-আকাশে ফসলে-ফসলে ভেসে যেতে চায়।

[পৃ ২৯]

৫. এই স্ত্রীলোকটি মিষ্টি হোক, বিষ হোক, ঠাণ্ডা হোক, আমার জীবনের রাখা-ঢাকা সবুজ বনে আতার ক্ষীরের মতো কথাগুলো শুনতে আসবে—সে পাখি ও নয়।

[পৃ ৩৪]

৬. ভাবতে-ভাবতে মাল্যবান চোখ বুজে কেমন একটি শ্যামকল পাখির মতো মুখে নিগূঢ় হ'য়ে ব'সে রইল।

[পৃ ৫৭]

৭. মাল্যবান গায়ে তেল পায়ে তেল মাথায় তেল মেখে ভরা রোদে একটি চিত্রিত সরীসৃপের মতো চিকচিক করছিল।

[পৃ ৮২]

৮. ডিমপাড়া নীড়ের দুটো কোলঘেঁষা পাখির মতন উম হয়ে রয়েছে যেন তার একামানুষের শরীর।

[পৃ ১১৬]

৯. ...সারা দিনের সমস্ত কথা কাজ অবসন্ন শোল বোয়ালের মতো দীঘির অতলে তলিয়ে যেত যেন,

[পৃ ১১]

১০. কোথাও মেঘ নেই, বৈশাখ-আকাশের বিদ্যুৎচমকানির মতো ভ'রে যেত মন এ-কাণার থেকে সে-কাণায় ;

[পৃ ১১]

জীবনানন্দের আরো কিছু শিল্পকুশলতা, তাঁর কবিতার বিশিষ্টতাও যেগুলি, এখানেও দ্রষ্টব্য : যেমন, নির্বস্তুক উপমা (১. সময়ের কালো শেরওয়ানীর গন্ধের মতো অন্ধকার ; ২. কথাভাবা কালো ধুমসো পাখিদের নীড় তার মাথাটা) ; এসব উপমার অনেকগুলি সুদর্শন সুভাবন প্রতিমা, তবু আরো দুএকটিকেও চিহ্নিত করা যায় (১. এই বারোটা বছর উৎপলার অনিচ্ছা অরুচির বঁইচি-কাঁটা চাঁদা-কাঁটা বেত-কাঁটার ঠাসবুনোনো জঙ্গলে নিজের কাজকামনাকে অন্ধ পাখির মতো নাকে দমে উড়িয়েছে মাল্যবান ; ২. চেতনার একটি সূর্যের বদলে অবচেতনার অন্তহীন নক্ষত্র পেয়েছে সে) ; আছে উপর্যুপরি, অনেকসময় বিচ্ছিন্ন-বিরোধী-বিপ্রতীপ বিশেষণ শব্দের সমাহৃত প্রয়োগ[৪] (১. বিশ শতকের উপচীয়মান আবহমান রক্ত রৌদ্র ছায়া

---

[৪] রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনায়ও আছে অনুরূপ বিশেষণ শব্দের উপর্যুপরি প্রয়োগ :

(ক) কেবল একটি আন্তরিক 'মা' 'মা' ক্রন্দন সেই **লজ্জিত শীর্ণ দীর্ঘ** অসুন্দর বালকের অন্তরে কেবলই আলোড়িত...[ছুটি, গল্পগুচ্ছ]

(খ) ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া **উজ্জ্বল চঞ্চল ঘনকৃষ্ণ** চোখ দুটি দিয়া পথের মধ্যে দর্শনযোগ্য যাহা কিছু সমস্ত দেখিয়া লয় [শাস্তি, ঐ]

(গ) সমস্তই যেন **সজীব, স্পন্দিত, প্রগলভ, আলোক-উদ্ভাসিত,** নবীনতায় সুচিক্কণ, প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ।

[অতিথি, ঐ]

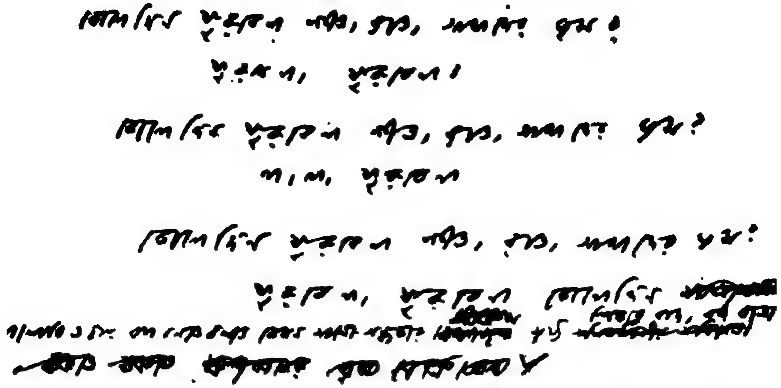

জীবনানন্দ দাশের "মাল্যবান" উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি-চিত্র

জ্বালা সমুদ্রসঙ্গীত। ২. তবুও কিরকম আঁধার, কঠিন, নিবিড় ; ৩. সেই-রকমই অসার, অবুদ্ধিমান, উচ্ছ্বাস-সর্বস্ব তো এই ছেলেটি ; ৪. প্রত্যেকটি দিনের কথা মনে আছে তার : সহজ কঠিন মৃদু নিরেস ; ৫. নিজেকে অবিচারিত—অভালোবাসিত—বিড়ম্বিত মানুষ ব'লে খতিয়ে নিতে-নিতে মনটা লঘু হ'য়ে ওঠে তার ; ৬. জীবনের থেকে কুবাতাস দুর্ভাগ্য অবিচার অভালোবাসা যদি শুকিয়ে যায়, তাহলে পথ থাকে না আর) ; আছে জীবনানন্দীয় অসামান্য প্রতীপাভাসের প্রয়োগ (১. কেমন নির্জলা জলীয় দিনগুলো জীবনের ; ২. মাল্যবান কোমল কঠিন চোখে উৎপলার দিকে তাকাল ; ৩. অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত অন্ধকার ; ৪. কোথাও বালুঝাড় নেই, সেই বালুঝাড়ের ঝিরি-ঝিরি শিরি-শিরি ঝিরি-ঝিরি শব্দ)[৫]।

কবির নিজজীবনের সঙ্গে এই উপন্যাসের কোথাও-কোথাও আশ্চর্য সাযুজ্য চোখে পড়বেই :

[৫] এই উপন্যাসের এক-জায়গায় জীবনানন্দ লিখেছেন : 'নিজের চিন্তাধারণা ও উপমার কেমন একটা আলংকারিক অসহজতায়—অস্বাভাবিকতায় বিরক্ত বীত-শ্রদ্ধ হ'য়ে উঠল মাল্যবানের মন।' জীবনানন্দের কবিতায় বাঙালি পাঠক-যে বহুকাল প্রতিহত হ'য়ে ছিলেন তার কারণ তাঁর এই বিষয় ও বিন্যাসের অসহজতা, অস্বাভাবিকতা। এর নিহিত গুণের দিক আমি বিশদভাবে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছি, তবু মানতেই হবে—জীবনানন্দ কখনো-কখনো বড়ো-বেশি আবেগতাড়িত, দ্রুতগামী, অসহজ, অস্বভাবী।

১. ওঁর মৃত্যুর পরপার সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল। মাঝে মাঝেই এই কথা বলতেন। বলতেন মৃত্যুর পরে অনেক প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা হয়।

[আমার স্বামী জীবনানন্দ দাশ, লাবণ্য দাশের সঙ্গে সাক্ষাৎকার : কবিতা সিংহ, "জীবনানন্দ স্মৃতি", পৃ ২৬৯]

২. আসলে, জীবনানন্দের স্বভাবে একটি দুরতিক্রম্য দূরত্ব ছিলো—যে-অতিলৌকিক আবহাওয়া তাঁর কবিতায়, তা-ই যেন ঘিরে থাকতো সব সময়—তার ব্যবধান অতিক্রম করতে ব্যক্তিগত জীবনে আমি পারিনি, সমকালীন অন্য কোনো সাহিত্যিকও না। এই দূরত্ব তিনি শেষপর্যন্ত অক্ষুন্ন রেখেছিলেন ; তিন বা চার বছর আগে সন্ধ্যেবেলা লেকের দিকে তাঁকে বেড়াতে দেখতাম—আমি হয়তো পিছনে চলেছি, এগিয়ে গিয়ে কথা বললে তিনি খুশিও হতেন, অপ্রস্তুতও হতেন, আলাপ জমতো না ; তাই আবার দেখতে পেলে ইচ্ছে করে পেছিয়েও পড়েছি কখনো-কখনো, ওঁর নির্জনতা ব্যাহত করিনি।

[জীবনানন্দ দাশের স্মরণে, "কালের পুতুল" : বুদ্ধদেব বসু]

৩. নির্জন একাকীত্ব আর নিঃসঙ্গ ভ্রমণকেই তিনি পছন্দ করতেন বেশি। তাই ভাবতে অবাক লাগে—আমিই বুঝি ছিলাম তার একমাত্র ব্যতিক্রম। এক আধ দিন নয়। সুদীর্ঘ কয়েক বছর ধরেই কবির প্রাত্যহিক সান্ধ্যভ্রমণে আমি ছিলাম একমাত্র অপরিহার্য সঙ্গী।

[আমার বন্ধু জীবনানন্দ, সুবোধ রায়, "জীবনানন্দ স্মৃতি", পৃ ২২৭]

৪. অনেকেই হয়তো জানেন না কবি ছিলেন ব্যঙ্গ সুনিপুণ। দারুণ রহস্যপ্রিয়। রঙ্গরহস্য ; কৌতুকপ্রিয়তা কবির অস্থিতে, রক্তে, মজ্জায়। একরকম সহজাতই বলা যায়। একটু রসের আভাস, এতোটুকু কোথাও হিউমারের গন্ধ পেলেই—ব্যস, আর দেখতে হবে না। তখন আর সেই রোমান্টিক, রূপোপজীবী কবি জীবনানন্দ নয়। অন্য মানুষ। হাস্যকৌতুকের প্রতি ছিল তাঁর এমনই দুর্বার আকর্ষণ।

[ঐ, পৃ ২৩১]

৫. চিড়িয়াখানা কবির অতি প্রিয়। প্রচণ্ড আকর্ষণ। চন্দনা কাকাতুয়া হাঁস মুমু ময়ূর...দিঘির জলে ভাসা কতো বিচিত্রবর্ণ

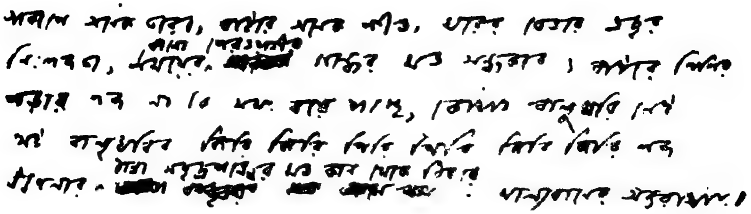

জীবনানন্দ দাশের "মাল্যবান" উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি-চিত্র

> পাখি। আর সর্বোপরি ঠাণ্ডা নির্জন ছায়াবীথি আর দিগন্ত-বিস্তৃত ঘন বনানীর স্নিগ্ধ শ্যামশ্রী। ভরদুপুরে কতোবার যে গেছি তাঁর সঙ্গে তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই।
>
> [ঐ, পৃ. ২৩১]

এখানে বর্ণিত চরিত্রটির সঙ্গে মাল্যবান চরিত্রটিকে তো প্রায় মিলিয়ে নেওয়া যায়। মনে পড়ে : মাল্যবানের সপরিবারে চিড়িয়াখানা দর্শন (পৃ. ৫৯), কথায়-কথায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে গোল দিঘিতে ভ্রমণ (পৃ. ৪২, ১৪৯ ও ১৭৬), মৃত্যুভাবনা (পৃ. ১১৪-১১৯), উপন্যাসে 'সত্যাগ্রহের আসামী মনে ক'রে একটা বিশৃঙ্খল ভিড়ের ভেতর থেকে অন্য অনেকের সঙ্গে মাল্যবান ও উৎপলাকে গ্রেপ্তার ক'রে জেলে আটক রাখা হয়েছিল—দিন দুই—মাস ছয়েক আগে' (পৃ. ৩৮)—বাস্তব জীবনে, ১৯৪৬ সালে, কবি তখন 'স্বরাজ' পত্রিকায় কর্মরত, অফিস থেকে বাড়ি ফেরার সময় তাঁকে ভুল ক'রে থানায় নিয়ে যায়, পরে তিনি তাঁর এক ছাত্রের কল্যাণে মুক্তি পান (দ্র. "মানুষ জীবনানন্দ" : লাবণ্য দাশ, পৃ. ৫৬-৫৯)।

এক শীতনিশীথে-শুরু আর-এক-শীতনিশীথে সমাপ্ত এই উপন্যাসটি পড়তে-পড়তে কাফকা-কামু্'র জগৎচিত্র জেগে উঠেছে মনে আমার। কামু-র ক্রমাগত নাস্তির মার কিংবা কাফকা-র আকস্মিক নিয়তি-খড়্গের নেমে আসা—প্রায় সেই জগতেরই তুল্য ; শুধু এখানে প্রথম থেকেই সেই জীবনের কাছে বিনীত, সময়ের মার সহ্য করবার শিক্ষা, বিনীত নালিশ বড়োজোর। অন্তহীন দীর্ঘল শীতরাত্রি আসলে নিখিল-নাস্তির শীত ধ'রে রাখে ; শেষ যাদুমন্ত্রের মতো স্বগতকথন আসলে আত্মার সঙ্গে নিরুদ্ধার আলাপ, জীবনের সঙ্গে জীবন-নির্জিতের সন্ধিস্থাপন, হয়তো সেই বিশাল বিবিক্তির ভিতরেই কোথাও আছে গোপন মৌচাকের ক্ষীণ অতিক্ষীণ ক্ষরণ।

এ উপন্যাস এক পদে-পদে পরাজিত আত্মার আখ্যান, তারই ভিতরে চলে জীবনের মধ্য থেকে অর্থ ও তাৎপর্য নিষ্কাশনের ক্রমিক প্রয়াস, মাল্যবানের খাবার টেবিলে ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত চলে আত্মজিজ্ঞাসা আর আত্মজবাব তথা আত্মসংহিংসার পালা। এই উপন্যাস শ্বাস রোধ ক'রে আনে আমাদের, নির্বাতাস দেশে থেকে চেতনা ঘুলিয়ে ওঠে আমাদের, তবু এ পিটোর্য়ান অন্তঃসারশূন্য ভিতরার্থশূন্য ফাঁপা আশার দামামা, মাল্যবানের পরাজয় শেষপর্যন্ত পরাজয় থাকে না আর—হ'য়ে ওঠে 'সময়ের আশ্চর্য সমগ্রতার কাছে আত্মসমর্পণ'॥

[১৯৭৫]

কবির বিবাহ-বাসর [১৯৩০] স্থান : রামমোহন লাইব্রেরি, ঢাকা

জীবনায়ন

১

শিল্পীর জীবনচরিতে শিল্পভোক্তা বা দর্শকের কৌতূহল, কবির জীবনচরিতে পাঠক বা সমালোচকের আগ্রহ স্বাভাবিক। যে-বিস্ময়বিশিষ্টতা থাকে কবি-শিল্পীর রচনায়, তাঁর জীবনে আমরা খুঁজি তারই প্রতিরূপ। পাঠক-সমালোচকের এই প্রবল আগ্রহের ফলেই কবি-শিল্পীর ব্যক্তিজীবন নিয়ে নানা রকম গল্প ছড়ায়, সামান্য ঘটনার উপর তীব্র রঙ চড়ে, কবি-জীবনের একটি তুচ্ছ ঘটনাকে যে-কোনো তুঙ্গে না-পৌঁছিয়ে দিতে পারলে আমাদের ঠিক পরিতৃপ্তি হয় না।

বাঙালি লেখকশিল্পীদের জীবনীতে অন্য একটি বিষয়ও দ্রষ্টব্য। বাঙালি কবিদের যে-অত্যল্প কটি জীবনচরিত লেখা হয়েছে, তাতে প্রায় সর্বতোভাবে কবিদের ক'রে তোলা হয়েছে আদর্শ-বদ্ধ, আদর্শ-নিবেদিত। একজন কবির স্খলন-পতন-ত্রুটিও-যে অমানবিক নয়,একজন কবির আঁধার দিকগুলিও-যে তাঁর কবিতা ভোগের জন্যে প্রয়োজনীয়—এই তথ্যটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বীকার করা হয়নি। এমনিতে কবি-শিল্পীদের জীবনচর্চার রেওয়াজ এখানে প্রচলিত হয়নি, জীবনের সঙ্গে কবিতাকে-যে কোথাও-কোথাও মিলিয়ে পাঠ করা যেতে পারে, তা আমাদের সমালোচনার কোনো পরিচ্ছন্ন পথ তৈরি করেনি—দৈবাৎ বিচ্ছিন্নভাবে এসেছে কখনো। ফলত মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ বা নজরুল কিংবা বঙ্কিমচন্দ্র বা শরৎচন্দ্র—এইসব প্রধান কবিকথকই একমাত্র জীবনীকারদের লক্ষ্যবস্তু ; এবং এঁরাও এসেছেন খণ্ডিত হ'য়েই।

কবি জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর পরে তাঁর কবিতা যেমন ক্রমশ স্বীকৃত হচ্ছে, তেমনি তাঁর জীবন বিষয়েও আমরা ক্রমশ আগ্রহী হ'য়ে উঠছি। তাঁর কবিতা অধিকাংশই নির্বস্তুক ; সুতরাং জীবনের সঙ্গে কবিতাকে মিলিয়ে পাঠ করার পদ্ধতি এখানে খুব কাজে দেবে না হয়তো। তবে, কবিজীবনীর তথ্যপুঞ্জ সামগ্রিকভাবে তাঁর কবিতার কুয়াশা মোচনে, ভিতরকার গহন সত্তাটি চিনিয়ে দেবার জন্যে, এমনকি কবিতার শারীরিক গড়নের ভাষ্য

রচনার ক্ষেত্রেও উপকারী সহায়তা দান করতে পারে। কিন্তু এরই মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাদম্বরী দেবীর সম্পর্কের রহস্যময়তায় যেমন, নজরুলের অসুস্থতার প্রসঙ্গে যেমন, তেমন জীবনানন্দেরও জীবনের কোনো-কোনো ক্ষেত্রে পরতের পর পরত ধুলো জমিয়ে আচ্ছাদিত ক'রে তোলা হচ্ছে। সেই আচ্ছাদনখানি সরিয়ে সৎ, স্বাভাবিক, মানবিক দৃষ্টির বিচার শুরু হোক ; কবিজীবনকে আদর্শায়িত ক'রে না-তুলে, তাকে সত্যের আলোয় যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হোক, এমনিভাবে হয়তো আমরা পৌঁছোতে পারবো জীবনানন্দের জটিল অথচ আমন্ত্রণকারী কবিতার অন্দর-মহলেও।

২

জীবনানন্দ কি আত্মহত্যা করেছিলেন ?

কবির জীবনীকারগণ তাঁর মৃত্যুকে একটি দুর্ঘটনা ব'লেই চিহ্নিত করেছেন, স্বাভাবিক দুর্ঘটনা। কিন্তু আসলে কি তাই ? কবির বন্ধু সুবোধ রায় প্রত্যক্ষদর্শী জনৈক চুনীলাল দে-র জবানবন্দিতে জানিয়েছেন :

> 'জলখাবার' (শোল কাফে নামে যে মিষ্টির দোকানটি অধুনা নামান্তরিত) ছাড়িয়ে জুয়েল হাউসের সামনে দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করছিলেন জীবনানন্দ দাশ। চুনীবাবুর মতে শুধু অন্যমনস্ক নয়, কী এক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন কবি। স্টপিং স্টেশন থেকে তখনো ট্রাম প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ হাত দূরে। ক্রমাগত ঘন্টা বাজানো ছাড়াও বার বার সাবধান করে দিয়েছিলো ট্রাম ড্রাইভার। তবুও যা অনিবার্য তাই ঘটল। গাড়ি থামল যখন, প্রচণ্ড এক ধাক্কার সঙ্গে সঙ্গেই কবির দেহ তখন ক্যাচারের ভেতর ঢুকে গেছে।
>
> [আমার বন্ধু জীবনানন্দ, সুবোধ রায়]

এ কেমন অন্যমনস্কতা ও গভীর চিন্তা, যা ট্রাম-ড্রাইভারের বার-বার ঘন্টা বাজানো ও সাবধানতা সত্ত্বেও মৃত্যুর মুখে নিয়ে যায় কবিকে ? প্রত্যক্ষদর্শী চুনীলাল দে-র ভাষ্য উদ্ধৃত করেছেন কবির জীবনীকার গোপালচন্দ্র রায়ও :

> সমবেত জনতার মধ্যে থেকে দু-একজনের কথা কানে এল। তাঁরা বলছেন—ট্রাম লাইনের এই ঘাসের উপর দিয়ে ভদ্রলোক আপন মনেই আসছিলেন। ট্রামের ড্রাইভার ঘন্টা বাজিয়েছে,

দু একজন রাস্তার লোক ট্রাম আসছে বলে চীৎকারও করেছে। কিন্তু ভদ্রলোক কিসের চিন্তায় এত বিভোর ছিলেন যে কোন কিছুই তাঁর কানে যায়নি।

[জীবনানন্দ : গোপালচন্দ্র রায়]

জীবনানন্দের এই ইচ্ছামৃত্যুর এটি কি কারণ নয়, যে, এই কবি সারা-জীবন ভিতরে-ভিতরে পালন করেছেন মৃত্যুইচ্ছা ? মরণ-অভীপ্সা জীবনানন্দের কবিতায় ছত্রে-ছত্রে যেভাবে দখল রেখেছে, আর কোন বাঙালি কবির লেখায় আছে ওরকম একচ্ছত্র মরণের স্বারাজ্য স্থাপনা ? তাঁর কোনো-কোনো গ্রন্থনামেই দ্যোতিত বিনষ্টির সংকেত : "ঝরা পালক", "ধূসর পাণ্ডুলিপি", "সাতটি তারার তিমির", "বেলা অবেলা কালবেলা"। তাঁর বুনো হাঁস, হরিণেরা কেবলি মৃত্যুর কবলে প'ড়ে যায়। কারণহীন স্বেচ্ছা-মৃত্যুকে প্রথমবারের মতো বাংলা কবিতায় ব্যবহার করলেন তিনি 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায়। 'হঠাৎ-মৃত' নামে একটি কবিতা যোজিত হয়েছে "মহাপৃথিবী"তে। সারা "রূপসী বাংলা" জুড়ে মৃত্যু তার দারুণ-করুণ ধসা বিস্তার ক'রে গেছে। এড্‌গর এ্যালান পো'র গল্পের সেই আরক্তিম-দেহী মৃত্যুর মতো তাঁর সমস্ত উৎসবে আকস্মিক প্রবেশ করে মৃত্যু, বিনাশ, ধ্বংস। আমাদের মনে প'ড়ে যেতে থাকে বারবার তাঁর কবিতার অসংখ্যবার উচ্চারিত মৃত্যুর প্রসঙ্গগুচ্ছ, এমনকি মৃত্যুইচ্ছারও চরণাবলি :

১. যেই ঘুম ভাঙে নাক কোনোদিন ঘুমাতে ঘুমাতে।
সবচেয়ে সুখ আর সবচেয়ে শান্তি আছে তাতে।

[আমরা]

২. স্থবিরতা, কবে তুমি আসিবে বলো তো।

[স্বপ্নের ধ্বনিরা, ব. সে.]

৩. ধানসিঁড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়ে থাকবো—ধীরে—
পউষের রাতে
কোনোদিন জাগবো না জেনে—কোনোদিন জাগবো না আমি
—কোনোদিন আর।

[অন্ধকার, ব. সে.]

এমনকি ব্যক্তিজীবনেও :

[রবীন্দ্রনাথের] 'জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে' গানটি ওঁর প্রিয় ছিল। ওঁর মৃত্যুর পরপার সম্বন্ধে একটা অদ্ভূত আকর্ষণ ছিল। মাঝে মাঝেই ওই কথা বলতেন। বলতেন, মৃত্যুর পরে অনেক

প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা হয়। আর খালি বলতেন, আচ্ছা, বলো তো, আমি মারা গেলে তুমি কি করবে ?

[আমার স্বামী জীবনানন্দ দাশ : লাবণ্য দাশ]

এই ক্রমাগত মৃত্যুঅভীপ্সা কি ভিতর থেকে তাঁকে হাত ধ'রে নিয়ে গিয়েছিলো ট্রামলাইনের উপর ? খুব সঙ্গতভাবেই তাঁর মৃত্যুকে স্বেচ্ছামৃত্যু ব'লেই মনে হয় আমাদের। এই মরণেচ্ছার বাস্তব কারণও ছিলো। অন্তত একজন লেখক, জীবনানন্দ বিষয়ে অসীম উৎসাহী, জীবনানন্দেরই সমকালীন কবি, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের একটি সাক্ষ্য আমাদের ধারণার সপক্ষে আমরা দাঁড় করাতে পারি, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের একটি পত্রাংশ :

আমার মনে হয় জীবনানন্দ ঠিক ট্রামদুর্ঘটনায় মারা যাননি। যদিও এই কথাটাই সর্বত্র বলা হয়ে থাকে, এবং আমরা দেখেছি, তথাপি আমার ধারণা তিনি আত্মহত্যা করেছেন।

৩

দাম্পত্য-জীবনে জীবনানন্দ কি সুখী ছিলেন না ?

তাঁর ঐ আত্মহত্যার প্রধান কারণ হয়তো : কবি দাম্পত্য-জীবনে সুখী ছিলেন না মোটেই। এ বিষয়ে কবির জীবনীলেখকেরা বা স্মৃতিলেখকেরা গভীর নীরবতা পালন করেছেন। কবির দাম্পত্য সুখহীনতার বড়ো কারণ হয়তো আর্থিক অসচ্ছলতা। জীবনানন্দ মাঝে মাঝেই কর্মহীন হ'য়ে পড়তেন—এবং এই কর্মহীনতা দীর্ঘদিন চলতো এক-এক সময়। আর্থিক অসাচ্ছন্দ্যের প্রসঙ্গ তাঁর লেখাতেও বর্তমান। লাবণ্য দাশ লিখেছেন, 'উনি যে চাকরি পেতেন না তা নয়। উনি চাকরি করতে চাইতেন না। বারবার বলতেন, বলো তো কি নিদারুণ সময়ের অপচয়। বড়ো ক্ষতি হয়। এভাবে এতটা সময় চলে যাওয়া, আহা, যদি আমার এমন সঞ্চয় থাকত যে এভাবে সময় নষ্ট না করলেও চলত।' ['আমার স্বামী জীবনানন্দ দাশ', লাবণ্য দাশ] কথাটি সর্বাংশে সত্য নয়। বেসরকারি কলেজে অস্থায়ী চাকরি তাঁর দুশ্চিন্তার অন্যতম কারণ ছিলো, বরং চাকরির জন্য তাঁকে জীবনের প্রায় শেষপর্যন্ত সচেষ্ট থাকতে হয়েছে, বিভিন্ন ব্যক্তির সহায়তা নিতে হয়েছে। তবে এটা ঠিক, যে, কবি চাচ্ছিলেন লেখবার অখণ্ড অবসর— নানারকম লেখায় নিজেকে নিয়োজিত করতে চেয়েছিলেন কবি—সময় পাননি। লাবণ্য দাশকে আর্থিক অসাচ্ছল্য কাটানোর জন্যেই হয়তো শিক্ষিকার

জীবিকা গ্রহণ করতে হয়েছিলো। পূর্বোক্ত পত্রে সঞ্জয় ভট্টাচার্য তো এই অসুখী দাম্পত্য-জীবনকেই দায়ী করেছেন কবির আত্মহত্যার জন্যে। সঞ্জয় ভট্টাচার্য স্পষ্ট লিখেছেন :

> আমি জীবনানন্দের পারিবারিক অনেক ঘটনাই জানি ; যা খুব একটা সুখের ছিল না। ওর বউর সাথে প্রতিদিন একটা দ্বন্দ্ব —আমাকে বলতো। জীবনানন্দ তার থেকে মুক্তি খুঁজছিল।

সেই মুক্তিই কি কবি খুঁজেছিলেন ট্রামলাইনের উপর, ট্রামগাড়ির চাকার তলায় ? প্রসঙ্গত, জীবনানন্দের "মাল্যবান" উপন্যাসটির কথা অপ্রতিরোধ্যভাবে মনে প'ড়ে যায় আমাদের। কবির গ্রন্থাকারে প্রকাশিত এই উপন্যাসের একমাত্র উপজীব্য দাম্পত্যকলহ। এটিকে কবির ছদ্মবেশী আত্মজীবনী বলা যায়। মাল্যবান চরিত্রটির সঙ্গে কবি জীবনানন্দ প্রায় মিলে যান। উৎপলাকে দুর্মুখ, স্বার্থপর, ঝগড়াটে, দুশ্চরিত্র—এইসব হিশেবে, একেবারে কৃষ্ণবর্ণে আঁকবার কারণ কি ? উৎপলার প্রতি পাঠককে বিষিয়ে দেওয়ার জন্যে লেখকের অতিব্যস্ততা ও উত্তেজনা লুকিয়ে রাখাও যায়নি ? উৎপলাকে একেবারে কৃষ্ণ বর্ণে রঞ্জিত ক'রে, উৎপলার প্রতি পাঠককে চটিয়ে দিয়ে লেখকও কি একরকম শান্তি পাচ্ছেন না ? মাল্যবান-এর সঙ্গে জীবনানন্দের ব্যক্তিজীবন কতোটা মেলে, তার পরিষ্কার ও অগুপ্ত নির্ধারণ হওয়া দরকার। প্রসঙ্গত, জীবনানন্দের সহোদর অশোকানন্দ দাশের জবানিতে আমরা জানতে পারি : কবির স্ত্রী ও উত্তরাধিকারী লাবণ্য দাশ "মাল্যবান" উপন্যাসটি প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন ১৯৭৩ সালে। কবির মৃত্যুর (১৯৫৪) পরে ঐ উপন্যাসের প্রকাশের অনুমতি দিতে এতো দীর্ঘকাল—বিশ বছর—সময় লাগলো কেন লাবণ্য দাশের ?

৪

জীবনানন্দ কি একাডেমী পুরস্কারের উমেদার ছিলেন ?

১৯৫৪ সালের মে মাসে সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে কবি লিখেছিলেন, 'আপনারা কি কবির সাহেবকে আমার কথা বলেছিলেন ? বাড়ি নিয়েও বড় মুস্কিলে আছি। তারাশংকরবাবুর সঙ্গে দেখা করব ? এসব বিষয় নিয়ে আপনাদের

সঙ্গে গিয়ে আলোচনা করতে পারি কিংবা আপনি চিঠি লিখেও জানতে পারেন। খুব জরুরি।' দুটো বিষয় আলাপ করতে চেয়েছিলেন কবি তাঁর বন্ধু হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে। একটি বাড়ি নিয়ে, অন্য একটি কি? বস্তুত সে-বছর একাডেমি পুরস্কার পাবার জন্যে, জীবনানন্দও, অন্য আর কএকজন কবি ও লেখকের মতোই, সচেষ্ট হয়েছিলেন।

যে-জীবনানন্দ তাঁর কবিতার জন্যে রক্ষণশীল ('শনিবারের চিঠি') ও প্রগতিবাদী ('পরিচয়') দুই দলের দ্বারাই আক্রান্ত হয়েছিলেন, যে-জীবনানন্দের কবিতা নিয়ে তাঁর সহকর্মী অধ্যাপকেরা তাঁকে নিত্য বিদ্রূপে জর্জরিত করতেন—কবি এই স্বীকৃতিটুকুর জন্যে তাঁর তৃষ্ণা জেগে ওঠাই স্বাভাবিক। উপরন্তু জীবনানন্দের আর্থিক অসচ্ছলতা তাঁকে অস্থির ক'রে রেখেছিলো, বেসরকারি কলেজের চাকরির অনিশ্চয়তা তাঁকে দ'গ্ধে-দ'গ্ধে মেরেছে—একাডেমি পুরস্কারের পাঁচ হাজার টাকা পেলে তাঁর ভালোরকম সুরাহা হ'তো, এই টাকার জন্যেই বোধহয় তিনি বিশেষ করে আগ্রহী হ'য়ে উঠেছিলেন। কিন্তু জীবদ্দশায় তিনি তা পাননি, জীবিত থাকলে পেতেনও না—জীবনানন্দের কাছেও নিশ্চয় এ তথ্য অজ্ঞাত থেকে যায়নি। অস্বীকৃতি, অবহেলা, উৎপীড়ন, বাড়ির চিন্তা, চাকরির অনিশ্চয়তা, নিত্যনৈমিত্তিক দাম্পত্য কলহ, লেখক ও মানুষ হিশেবে পদে-পদে অপমান এই সংবেদী কবিটিকে আত্মহননের দিকে ঠেলে দিয়েছিলো। বাঁচবার শেষ চেষ্টা হিশেবে স্বীকৃতি আর মানুষ হিশেবে মানুষের মতো বেঁচে থাকবার তাড়নাই কবিকে একাডেমী প্রাইজের তদবির করতে বাধ্য করেছিলো। বুঝেছিলেন যখন, যে, তা হবে না, তখন শেষ ভরসাটুকুও হাত থেকে খ'শে যায়। পুরস্কারের উমেদারির জন্যে কি জীবনানন্দ মানুষ হিশেবে ছোটো হ'য়ে যাবেন? না, কেননা পরিবেশই তাঁকে বাধ্য করেছিলো। পঞ্চান্ন বছর বয়সেও স্বীকৃতির ও অর্থের অভাব তাঁকে পাগল ক'রে তুলেছিলো। আর, তদবিরের কলাকৌশলই তিনি জানতেন না, সুতরাং পুরস্কার পাবার আশাও ছিলো না। মারা গেলেন ব'লেই পুরস্কার অবশ্য দেওয়া হ'লো তাঁকে—সেই দারুণ প্রহসন! শুভার্থী সুহৃদ সঞ্জয় ভট্টাচার্য অভিমানভরে লিখেছেন, 'তাঁর সঙ্গে শেষ দেখার সূচনার শোচনীয় দিনগুলোই আমি স্মরণ করছি। মনে ভেসে উঠছে একটি মূর্তি : দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক চাপা ঠোঁট, ঊর্ধ্বে দৃষ্টি। আর কপালে রাজদণ্ড। জীবিত অবস্থায় প্রার্থনায়ও যিনি পাঁচশো টাকা পাননি, মৃত্যুর পরে তাঁর নামে পাঁচ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণার আর বিড়ম্বনা কেন?' ("কবি জীবনানন্দ দাশ") আর এক আত্মরচিত বিচিত্র প্রহসনের নায়ক ছিলেন সজনীকান্ত দাস : নজরুল

ইসলামকে সারাজীবন আক্রমণ ক'রে, তিনি (নজরুল) অসুস্থ হ'য়ে পড়লে তাঁর দরদ যেমন উথলে উঠেছিলো, তেম্নি যে-জীবনানন্দকে তিনি কশাঘাতে জর্জরিত করেছিলেন তাঁর দুর্ঘটনার পরে তিনি সচেষ্ট হ'য়ে উঠলেন তাঁকে বাঁচাতে। আশ্চর্য ! বাংলাদেশেই এসব সম্ভব !

৫

জীবনানন্দ নির্জন ছিলেন কিন্তু উদাসীন ছিলেন না

কবি-যে নির্জন, অমিশুক ও অসামাজিক ছিলেন, এর সাক্ষ্য আছে তাঁর পরিচিতদের রচনায়-রচনায়। বুদ্ধদেব বসু :

> জীবনানন্দের স্বভাবে একটি দুরতিক্রম্য দূরত্ব ছিলো—যেটা অতিক্রম করতে ব্যক্তিগত জীবনে আমি পারিনি, সমকালীন অন্য কোনো সাহিত্যিকও না। এই দূরত্ব তিনি শেষ পর্যন্ত অক্ষুন্ন রেখে ছিলেন ; তিন বা চার বছর আগে সন্ধেবেলা লেকের দিকে তাঁকে বেড়াতে দেখতাম—আমি হয়তো পিছনে চলেছি, এগিয়ে গিয়ে কথা বললে তিনি খুশিও হতেন, অপ্রস্তুতও হতেন, আলাপ জমতো না ; তাই আবার দেখতে পেলে আমি ইচ্ছে করে পেছিয়েও পড়েছি কখনো কখনো, তাঁর নির্জনতা ব্যাহত করিনি।
>
> [জীবনানন্দ দাশ-এর স্মরণে]

বিমলচন্দ্র ঘোষ :

> দেখা হলে জিজ্ঞাসা করতাম, মানুষের সঙ্গে মেশেন না কেন ? তার একটিমাত্র উত্তর শোনা যেতো, 'ভালো লাগে না।' মানুষের সঙ্গ তাঁর অসহ্য লাগতো। সাহিত্যিক আলাপ-আলোচনার মধ্যে অন্যেরা যদি হাজার কথা বলতেন, জীবনানন্দের মুখ থেকে বেরুতো দু একটা নিস্পৃহ মন্তব্য। নিজের মধ্যে ডুবে থাকাই ছিল এই নিঃসঙ্গতা-প্রিয় কবির স্বধর্ম।
>
> [কবি জীবনানন্দ দাশের জীবনদর্শন]

তাঁর এই প্রকৃতির বিজনতা শেষদিকে ঈষৎ চ্যুত হ'লেও মোটামুটি তাই ছিল তাঁর চারিত্র্যলগ্ন।

কিন্তু নির্জনতা ও উদাসীনতা এক নয়; অনেকেই বিষয়টিকে গুলিয়ে ফেলেছেন। জীবনানন্দ উদাসীন বা নির্মোহ সন্ন্যাসী ছিলেন না, বরং তীব্রভাবে শরিক ছিলেন জীবনে। লাবণ্য দাশের উক্তি বিশ্বাস্য মনে হয় বরং :

> অনেকে বলেন, তিনি নিপাট ভালো মানুষ, আত্মভোলা, কোনো-দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না ইত্যাদি। এসব যখন শুনি বা পড়ি, তখন খানিকটা অদ্ভুত লাগে। কারণ ঐ ছবিতে আমি যেন আমার অচেনা ব্যক্তিত্বহীন একজন সাজানো সৌখীন কবির তৈরি করা ছবি দেখতে পাই। আমি ঐ ব্যক্তিত্বহীন জীবনানন্দকে সত্যিই চিনি না। আমার স্বামীর ছবি, আমার কাছে সম্পূর্ণ অন্য।

[আমার স্বামী জীবনানন্দ দাশ]

তাই যদি না হবে, তাহলে তাঁর যে-হাস্যপরিহাসের প্রতি প্রবল আকর্ষণের কথা বলেছেন তাঁর ভগ্নী সুচরিতা দাশ বা বন্ধু সুবোধ রায়, তার কি অর্থ দাঁড়ায়? বিদ্রূপ সে-ই করে, যে উদাসীন নয়—তীব্রভাবে জড়িত ও প্রতি-ক্রিয়াস্নাত বরং। তাঁর মধ্য-পর্যায় থেকে জীবনানন্দ নারীর প্রতি, অধ্যা-পকের প্রতি, ইহুদি রমণীর গানের প্রতি, আরো অনেকের প্রতি যে-বিদ্রূপ বর্ষণ করেছেন, তা ঐ মানসিকভাবে জড়িত থাকারই ফল। আবার ভোগীও ছিলেন না তিনি : বুদ্ধদেব বসু যেমন জীবন নিংড়ে ভোগের পাত্র পূর্ণ করেছেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বেদনাকেই সানন্দ তীব্র ভোগ করেছেন—তেমন নন জীবনানন্দ, জীবনকে যেন তিনি সহ্য করেছেন। যে উদাসীন নয়, ভোগীও নয়—তার শুষ্ক ও আতীব্র যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। সারাজীবন যে-জীবিকা ছিলো তাঁর অবলম্বন, তাকেও ভালোবাসতে পারেননি। '৪২ সালের একটি চিঠিতে লিখেছেন স্পষ্ট : অধ্যাপনা জিনিশটা কোনো দিনই আমার তেমন ভালো লাগেনি। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য : অধ্যাপক হিশেবেও তিনি সফল ছিলেন না—তাঁর জীবনের একেবারে শেষ-প্রান্তে অধ্যাপনা যখন ভালো লাগছিলো, ছাত্রদের সশ্রদ্ধ প্রীতি রোজগার করছিলেন—তখনই মৃত্যু পরদা ফেলে দিলো। আর টাকাকড়ির ব্যাপারেও তিনি খুব নিস্পৃহ ছিলেন কি? 'শিক্ষাদীক্ষা—শিক্ষকতা' প্রবন্ধটি আগা-গোড়া টাকা পয়সার হিশেবেই ভরা। আর্থিক অসচ্ছলতা আমাদের দেশে কম বেশি সকলেরই; কেউ-কেউ যেমন সেসব উড়িয়ে দ্যান, জীবনানন্দ তো তেমন—অর্থাৎ উদাসীন—ছিলেন না: অসুখী দাম্পত্য প্রসঙ্গেও একই কথা প্রয়োজ্য। লক্ষণীয় তাঁর কল্পনা বস্তুলোককে অতিক্রম ক'রে যায়

বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিকতা তাঁর কেউ নয়। তাঁর কবিতায় তার কণামাত্র স্পর্শও নেই : ঈশ্বর বা কোনো ঐশী বা প্রাকৃতিক শক্তিতে বিশ্বাস তাঁর কবিতায় অলভ্য। মনে হয় জীবনানন্দ তাঁর ব্যক্তিজীবনে ও কবিতায় ছিলেন এক দ্বৈধতার শিকার : বস্তুলোককে যখন তিনি অতিক্রম ক'রে গেছেন, তখন অধ্যাত্মলোকে উত্তীর্ণ হ'তে পারেননি। নাকি এড্‌গর এ্যালান পো'র মতো বস্তুলোকের অতিরিক্ত মাত্রেই তিনি বস্তুলোকের বাইরে চ'লে গিয়েছিলেন? সংসার সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না তিনি, আবার কর্মঠও ছিলেন না।

৬

রূপসী বাংলা, বেলা অবেলা কালবেলা ও কবিতার কথা

কবির মৃত্যুর পরে যে-দুটি কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, "রূপসী বাংলা" ও "বেলা অবেলা কালবেলা", সেগুলি যে তাঁর মৃত্যুত্তর প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থ : এ তথ্যটি আমরা ভুলতে বসেছি। এ-সব বই-এর ভিতরে কোনো অবাঞ্ছিত করক্ষেপ হয়নি তো? "রূপসী বাংলা"-র ভূমিকায় লেখা হয়েছে : 'কবিতাগুলি প্রথম বারে যেমন লেখা হয়েছিল, ঠিক তেমনই পাণ্ডুলিপি-বদ্ধ অবস্থায় রক্ষিত ছিল; সম্পূর্ণ অপরিমার্জিত।' জীবনানন্দের অভ্যাস আমরা জানি : প্রথম লেখনের পরে কিছুদিন ফেলে রাখতেন, তারপর কিছু সময় অতিবাহিত হ'য়ে গেলে বিশোধিত ক'রে নিতেন দ্বিতীয়বার আত্মস্বভাবে। "রূপসী বাংলা"র কবিতাগুচ্ছ সেই পরিশোধনের সুযোগ পায়নি। তবু প্রশ্ন জাগে : একটি কবিতাকে ভেঙে-ভেঙে বহুবার লেখবার যে-অভ্যাস ছিলো জীবনানন্দের, কবির মৃত্যুর পরে তাঁর পাণ্ডুলিপি দেখে বুদ্ধদেব যে-মন্তব্য করেছিলেন, এই বই-এ তা কতোদূর কিংবা আদৌ প্রশ্রয় পেয়েছে কি? "বেলা অবেলা কালবেলা"-র ভূমিকায় অশোকানন্দ দাশ জানিয়েছেন, 'এই কবিতাগ্রন্থের নামটি কবিকর্তৃক মনোনীত।' "রূপসী বাংলা" সম্পর্কে ওরকম কিছু বলেননি, এই নামটি কে প্রয়োগ করেছেন পরিষ্কার বলা উচিত ছিলো। মৃত্যুত্তর গ্রন্থের উৎসর্গলিপিই বা ('আবহমান বাংলা —বাঙালী') কার কৃত্য? আমাদের বিবেচনায়, এই গ্রন্থদ্বয়কে 'সম্পা-

দিত' ধরলেই কবি জীবনানন্দ দাশের প্রতি সুবিচার করা হবে। "কবিতার কথা" প্রবন্ধগ্রন্থটিও তাই : এর নামকরণ, প্রবন্ধ নির্বাচন ও প্রবন্ধ সন্নিবেশ সবই প্রকাশকেরা করেছিলেন, এবং এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিলো কবির মৃত্যুর পরে ; সুতরাং এটিকে সম্পাদিত গ্রন্থ ব'লেই বিবেচনা করা উচিত।

৭

জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর পরে বিশ বছরের বেশি সময় বাহিত হ'য়ে গেলো। এখনো তাঁর কোনো সৎ, সংস্কারমুক্ত, প্রামাণ্য জীবনী রচিত হ'লো না। সেই পুঙ্খানুপুঙ্খ সত্য জীবনী যেমন এই মহান কবির ব্যক্তিপ্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় সাধন করাবে, তেমনি খুলে দেবে তাঁর কবিতার শাহি-মহলের সব গোপন দরোজা। বক্ষ্যমাণ অনুমানগুলি হয়তো তখন পরীক্ষিত হবার সুযোগ পাবে। যেমন কবিতায় তথা শিল্পে, তেমনি জীবনেও সত্যের সন্ধিৎসাই শেষ সত্য॥

[১৯৭৫]

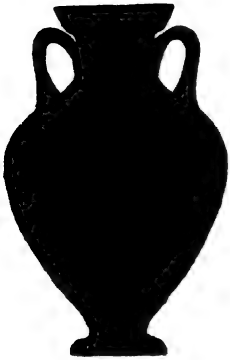

যোজনাংশ

পরিচ্ছেদ এক

জীবনানন্দের প্রথম কবিতা

* * * বর্ষ-আবাহন * * *

ওই যে পূর্ব-তোরণ-আগে
দীপ্ত নীলে, শুভ্র রাগে
প্রভাত রবি উঠল জেগে
দিব্য পরশ পেয়ে।

নাই গগনে মেঘের ছায়া
যেন স্বচ্ছ স্বর্গ কায়া
ভুবনভরা মুক্ত মায়া
মুগ্ধ—হৃদয় চেয়ে।

অতীত নিশি গেছে চলে,
চির-বিদায়-বার্তা বলে,
কোন্ আঁধারের গভীর তলে
রেখে স্মৃতি-লেখা।

এস এস ওগো নবীন,
চ'লে গেছে জীর্ণ মলিন
আজকে তুমি মৃত্যু-বিহীন
মুক্ত-সীমা-রেখা।

['ব্রহ্মবাদী', বৈশাখ ১৩২৬]

জীবনানন্দের প্রথম গদ্য-রচনা

* * * স্বর্গীয় কালীমোহন দাশের শ্রাদ্ধবাসরে * * *

দীর্ঘ পথের যাত্রা শুরু করিয়া মুসাফিরকে মাঝে মাঝে পান্থশালায় আশ্রয় লইতে হয়। যাত্রাপথটিও যেমন তাহার সমস্ত নয়, পান্থশালার ভিতরেও তেমনি তাহার সকল অস্তিত্ব ক্ষুন্ন হয় না। পথিক গতিশীল। কোথায় কোন্ দিক্‌চক্রবালের পারে তাহার যাত্রার শেষ তাহা সে দেখিতে পায় না, মনে মনে খানিকটা সমঝাইয়া লইতে পারে শুধু। কত কত পথের বাঁক, নদীর কিনারা, হরিৎ ক্ষেত, ঊষর মরু তাহাকে পার হইতে হয়। কত কত সরাইখানায় তাহাকে বিশ্রাম খুঁজিতে হয়। শেষে হয়তো সে তাহার সুদূর নিরিখের সন্ধান পায়। পৃথিবীতে প্রতি পথিকেরই এমনি করিয়া অনিবার যাত্রার সূচনা হইতেছে, অসংখ্য পথ-পরিধি অতিক্রম করিতে হইতেছে, পথিক-আত্মার বেলাও তাই। সে স্থিতিশীল নহে। বারবার তাহাকে চলিতে হইতেছে, উধাও হইতে হইতেছে। মাঝে মাঝে, দিকে দিকে, সে ছায়াপাত করিয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্য। নব নব গতি, লীলা ও বিচ্ছুরণমণ্ডিত জ্যোতিষ্কের মত সে, সমস্ত নিখিলের অন্তরে এই নব নব ব্যঞ্জনা ও উন্মেষের নহবৎ নিরন্তর বাজিয়া যাইতেছে। পুরানো আস্তানাখানা ভাঙ্গিয়া যায়; অনেক দিনের চেনা নদী বালুর খাতে আসিয়া হঠাৎ কোথায় মিলাইয়া যায়; বেলাশেষে ফুলের পাপড়ি ঝরিয়া পড়ে। যাহা সুন্দর, যাহা মঙ্গল, যাহা অনিন্দ্য সকলই যেন একে একে করুণবিদায় লইয়া চলিয়া যায়। আমাদের হৃদয়ে দারুণ আঘাত বাজিয়া ওঠে। আমরা মনে করি এই সুন্দর, মঙ্গল মধুরের সঙ্গে আমাদের সকল সম্ভাষণ যেন চিরদিনের জন্য শেষ হইয়া গেল। ধ্বংশের অন্ধকার পাষাণ-পুরীর পিছনে নব উন্মেষের কিরণ রেখা আমাদের চেতনাকে যেন সচকিত করিয়া তুলিতে পারে না। তাই শীতল চিতার সম্মুখে মাথা হেঁট করিয়া আমরা মরণকেই অনেকসময় শেষকথা বলিয়া ধরিয়া লই। যে নদী মরু

বাহিরেতে বিরস হইয়া গিয়াছে সে যে ফল্গুরূপে ধরণীর নিমজ্জমান স্তরকে সরস করিয়া রাখিয়াছে, যে পাপড়িগুলি ঝরিয়া পড়িয়াছে সেগুলির যে শেষ নিকাশ হইয়া যায় নাই, নব মুঞ্জরণের জন্য যে তারা তৈরী হইয়া রহিয়াছে তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। যে অতিথি আজ আমাদের ভিতর হইতে চলিয়া গেলেন তিনি চির-রাত্রির ভিতর আপনাকে নিভাইয়া, জুড়াইয়া রাখেন নাই। একটা অটুট অপর্য্যাপ্ত প্রাণের স্পন্দনে তিনি আলোক-লোকে অপরূপভাবে আপনাকে আবার ফুটাইয়া তুলিতেছেন। মরণের ভিতর তাই কোনও বিহ্বলতা বা ভয়াল ভ্রূকুটির ব্যথা থাকিতে পারে না। প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কাছে মৃত্যু তাই সলীল সঞ্চরমান আত্মার একটি নবতর লীলা,—নবীন সঞ্চয়। সৃষ্টির ভিতর কোনও সমাপ্তি বা মাত্রা নাই—আছে শুধু অন্তহীন বিকাশ।

আমার পরম ভক্তিভাজন দাদামহাশয় যে আমাদের নিকট হইতে চলিয়া গেলেন তাহার অর্থ এ নয় যে,বহমান সৃষ্টির সঙ্গে তাঁহার সমস্ত সম্পর্ক চিরকালের জন্য ছিন্ন হইয়া গেল,—অর্থ এই যে, এই পৃথিবীর পর্দার আড়ালে তিনি আজ নবতর দৃশ্যপর্বে নব ভূমিকায় নবীন প্রাণধারার সঙ্গে আপনাকে যুক্ত করিয়া দিয়াছেন। যবনিকার অন্তরালে আজ তিনি কি লইয়া নিমগ্ন আছেন জানি না ; কিন্তু আমাদের সঙ্গে যত দিন ছিলেন, তাঁহাকে আমরা প্রেমনিবিড়, ভাবপরায়ণ, স্নেহশীল, সহৃদয়, উদার, সুরসিক, গুণ-গ্রাহী, ত্যাগী ও ভক্তপ্রাণ বলিয়াই জানিয়াছি। শুনিয়াছি নিতান্ত শিশু-কালে যখন আমার মায়ের মাতৃবিচ্ছেদ হয়, পাঁচটি শিশুসন্তান আমার দাদামহাশয়কেই মা বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া ছিল। পক্ষীমাতা যেমন নীড়ের ভিতর বসিয়া সন্তানগুলিকে স্নিগ্ধ-মুক্ত ডানার স্নেহ সম্পুটে আবিষ্ট করিয়া রাখে, নীড়ের বাহিরে গিয়াও সে যেন নীড়কে ভুলিতে পারে না, ভুলিতে পারে না নীড়স্থ অসহায় উন্মুখ প্রাণীগুলিকে,—দূরে দূরে থাকিয়াও তাহাদের সান্নিধ্যের জন্য যেমন সে উতলা দিশাহারা হইয়া উঠে—দাদামহাশয়কেও ঠিক তেমনি হইতে হইত। বিজ্ঞানে এ ধরনের জিনিষকে পশুপক্ষীর Self-preservation instinct বলিয়া কেহ কেহ ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন ; কিন্তু মানুষের বেলা,—বিশেষত দাদামহাশয়কে আমরা যেরকমভাবে চিনিয়াছি, তাহাতে ইহাকে তাঁহার স্নেহ ও প্রেম-প্রবণতার একটা অনাবিল ধারা ভিন্ন আর কি বলিতে পারি ? ছেলে-বেলায় আমার একবার যখন মারাত্মক ব্রংকাইটিস হইয়াছিল, শুনিয়াছি মার চেয়েও দাদামহাশয়ই আমাকে অনেক বেশী পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন ; শিয়রে

জাগিয়া অনেক রাত কাটাইয়া দিয়াছিলেন। এরকম দৃষ্টান্ত দাদামহাশয়ের জীবনে আদৌ বিরল নহে। তাঁহার সমস্ত জীবনখানাই এমনিতর আর্দ্র প্রাণধারায় সরল, শ্যামল। শুনিয়াছি একজন দুস্থ ব্রাহ্ম সংস্থানের জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হইবামাত্রই তিনি বিচলিত হইয়া গেলেন—এবং দুয়ারে দুয়ারে সেই বন্ধুটির জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিয়া করিয়া তাঁহার একটা হিল্লা করিয়া দিয়া তবে নিরস্ত হইলেন। ব্রাহ্মসমাজে এমন অনেক ব্যক্তি আজও বর্তমান আছেন, আমার দাদামহাশয়ের স্নেহ-করুণাশীতল তরু-চ্ছায়ায় ঠাই পাইয়া যাঁহারা মাঝে মাঝে আপনাদিগকে এমনিভাবে সুস্থ ও সার্থক করিয়া লইয়াছেন। কোনও কোনও উচ্চ রাজকর্মচারীর সঙ্গে দাদা-মহাশয়ের বিশেষ আলাপ থাকাতে চাকুরীর জন্য অনেকে তাঁহাকে ধরিয়া পড়িতেন। বড় চাকুরের সঙ্গে খাতির থাকিলেই যে সব সময় চাকুরী হাসিল করিতে পারা যায় না, এত লোককে রাতারাতি চাকুরী জুটাইয়া দেওয়াও যে একটা সহজ ব্যাপার নয়, দাদামহাশয় তাহা বেশ করিয়া জানিলেও এমনি কোমলপ্রাণ ছিলেন যে, আত্মীয়-স্বজনের বাধা অগ্রাহ্য করিয়াও যে কোনও শরণাগতের জন্য আশায় বুক বাঁধিয়া দুয়ারে দুয়ারে উমেদারি করিয়া বেড়াইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। যেখানে মানব-প্রেম, ভ্রাতৃভাব, প্রাণের সহজতম আকর্ষণ, সেখানে সঙ্কোচ বা গ্লানি কি করিয়া ঠাঁই পাইতে পারে? পরের অভ্যুদয়ে যেখানে অহরহ ঈর্ষার স্ফুলিঙ্গ জ্বলিয়া উঠিতেছে, দেখিতে পাই, দাদামহাশয় সেইস্থলে পরের জন্য আপনাকে বিলাইয়া দিয়া মহৎ মনের কত চমৎকার ছবিই না আঁকিয়া গিয়াছেন।

আজকালকার ব্রাহ্মসমাজ নানাদিকেই যে নিতান্ত ম্রিয়মান হইয়া পড়িতেছে একথা ব্রাহ্মসমাজের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদের মুখেও বার-বার শুনিয়াছি, এবং আমরাও তাহা অস্বীকার করিবার বিশেষ কোন কারণ খুঁজিয়া পাই না। কিন্তু দাদামহাশয় যখন ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলেন, তখন ব্রাহ্মধর্ম বাংলাদেশে একটা গভীর উত্তেজনা ও উৎসাহের সৃষ্টি করিয়াছিল। আজকাল পলিটিক্‌সে দেশ যেমন মাতিয়া উঠিতেছে তখন-কার দিনে সমাজ-সংস্কার ও নবধর্মের তাড়নায় জাতি তেমনি উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই বিপুল ক্ষেত্রে দাদামহাশয় একজন অগ্নিহোত্রী ছিলেন। পূর্বে যে তাঁহার কোমলতা, সহানুভূতি ও সরলতার কথা বলা গিয়াছে, সেগুলি মথিত ও মণ্ডিত করিয়া তাহার ভিতর বৈশ্যানরের জ্বলন্ত শিখার মতই যে তেজ ও পুরুষত্বের পরাক্রম বর্তমান ছিল, বক্তৃতা-

মঞ্চে, উপাসনার বেদীতে, তর্কের আসরে কিম্বা গার্হস্থ্য জীবনে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইত। দাদামহাশয় সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন না।

ইউরোপের মধ্যযুগে বা ভারতের বৌদ্ধযুগ হইতে শুরু করিয়া একটা সন্ন্যাসের প্রভাব মানুষের জীবনে দারুণভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল এবং তাহার বিপাকে পড়িয়া মানুষের পার্থিব জীবনকে নিতান্তই মায়া বা মোহ বলিয়া আখ্যাত করা গিয়াছে; পাপের জন্য অজস্র অনুশোচনা, মুক্তির জন্য নিরন্তর প্রার্থনা ও দেহকে শয়তানেরই কারখানা মনে করিয়া তাহাকে নির্দয়ভাবে নিপীড়িত করিবার অসংখ্য চেষ্টা হইয়াছে। দাদামহাশয় সে-ধরণের সন্ন্যাস-মার্গের পন্থী ছিলেন না। পৃথিবীকে তিনি Vale of Tears মনে করিতেন না। জীবনকে তিনি অভিজাত বলিয়া বাতিল করিতে চাহিতেন না। সংসারের আটপ্রহরিয়া লড়াইতে তিনি জড়াইতেন না। উদাসীর উধাও-মন্ত্রে আপনাকে তিনি দীক্ষিত করেন নাই। ...অথচ দাদামহাশয়ের প্রায় সমস্ত জীবনখানাই সাধন-ভজনে ব্যাপৃত ছিল। তাঁহার ঘরের সম্মুখে তিনি "সাধন-কুটীর" নামে একখানি কুটীর বাঁধিয়া ছিলেন। বন্ধুগণকে লইয়া তিনি দিনের অধিকাংশ সময়ই সেখানে উপাসনা, আলোচনা, কীর্ত্তনাদিতে আপনাকে ডুবাইয়া রাখিতেন। এক এক জনের জীবনে এক একটা আশা বা আকাঙ্ক্ষা, অন্য সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ও আশার চেয়ে অনেকখানি বড় স্থান অধিকার করিয়া থাকে। কেহ বা কেতাব পড়িতে ভালোবাসেন, কেহ শিক্ষা দিতে আনন্দ পান, কেহ দেশের বা জনহিতকর কাজের ভিতর আপনাকে ঢালিয়া দিয়া স্বস্তি অনুভব করেন। দাদামহাশয়ের অন্তরের সব চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষাটুকু তৃপ্ত হইত, যখন তিনি আত্মীয় বন্ধুদের সহিত আধ্যাত্মিক যোগে মিলিত হইতে পারিতেন। তাঁহার জীবনের সবচেয়ে সফল ও শুভ মুহূর্ত ছিল যখন "সাধনকুটীরে" বসিয়া স্বর্গীয় দ্বারকানাথ গুপ্ত, মথুরানাথ সেন (কবিরাজ), গোবিন্দচন্দ্র সেন বা হরিবোলা বাবু এবং বামনচন্দ্র গাঙ্গুলী প্রভৃতির সহিত প্রাণ খুলিয়া কীর্ত্তন, ধর্ম আলাপন, আরাধনা ও অধ্যাত্ম বিষয়ে আলোচনা করিবার সুযোগ পাইতেন। শুনিয়াছি দাদামহাশয়ের সে "সাধনকুটীরের" দুয়ার সকলের জন্যই অবারিত ছিল। ইংরেজিতে যাহাকে clique বলে, এই প্রতিষ্ঠানটি আদৌ তাহা ছিল না—ব্রাহ্মদের সহিত হিন্দুসুহৃৎগণও আসিয়া মিশিতেন। বৃদ্ধদের সঙ্গে যুবকেরাও আসিয়া যুক্ত হইত। পরমার্থ সম্বন্ধে নানা রকম প্রশ্ন চলিত, নানা ধরণের মীমাংসা হইত। বৃদ্ধদের

তরফ হইতে স্নেহ ও বাৎসল্য, যুবকদের তরফ হইতে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের কোনই অভাব ছিল না। বেশ একটা আকর্ষণের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দাদামহাশয়ের ভাব, ভক্তি ও সহৃদয়তায় রঞ্জিত এই "সাধনকুটীর" খানা।

বরিশালের হিন্দু ব্রাহ্ম-পরিবারে যতদূর সম্ভব যাওয়া আসা তাঁহার নৈমিত্তিক কর্ম্ম ছিল। কে কোথায় কি ভাবে আছেন, কাহার কি অভাব, কোন জায়গায় বেদনা, কোথায় নিরাশা—দাদামহাশয় রৌদ্র বৃষ্টি ও সময়ের সীমার আইন কানুন বারংবার লংঘন করিয়া কেবল মাত্র প্রেমপরায়ণ হৃদয়েরই আবেগেই সকলের খোঁজ লইয়া বেড়াইতেন এবং সম্ভাবনা, সংস্থান ও সৎ পরামর্শ লইয়া ভ্রাম্যমাণ মুস্কিলআসানের বেশে দিকে দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। দাদামহাশয়ের সহিত পরলোকগত লাখুটিয়ার জমিদার রাখালচন্দ্র রায় মহাশয়ের সৌহৃদ্য ছিল। একবার দাদামহাশয়কে তিনি একখানি দামী শাল উপহার দিয়াছিলেন। আজীবন সামান্য পোষাক-আষাকে অভ্যস্ত দাদামহাশয় সে জিনিষটি নিজের জন্য গ্রহণ করিতে পারিলেন না। আমরণ তিনি অনাড়ম্বরভাবে জীবন কাটাইয়াছিলেন। লোকসঙ্গে, সামাজিক উৎসবে ও পাড়াপড়সীদের ঘরে ঘরেই তিনি আপনার ঘর বাঁধিয়া লইয়াছিলেন। মানুষের সঙ্গে মিশিয়া, লৌকিকতার ভিতরে তিনি প্রসাদ ও আনন্দ অনুভব করিতেন।

সকলের নিকটই তাঁহার অনুজ্ঞা ও আদেশ ছিল "আনন্দের কথা বল, আনন্দের কথা বল।" এমনি ধরণের সামাজিক, উৎসাহী ও উৎসবশীল মানুষটিকে যখন জরা ও ব্যাধির তাড়নায় শেষ জীবনে অন্ধকার কামরার অকরুণ আবহাওয়াকেই আঁকড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল, তখনও তাঁহার হাস্যপটুতা, রসিকতা, উৎফুল্লতা কিম্বা আশার কিছুমাত্র ক্ষুন্নতা না দেখিয়া স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়াছি।

সুখ, দুঃখ, বেদনার আলোড়নে তিনি ভাঙিয়া পড়েন নাই। ইংরেজীতে যাহাকে Optimist বলে দাদামহাশয় তাই ছিলেন। বরিশালের আর একজন Optimist —অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে তাঁহার এত বেশী ঘনিষ্ঠতার গোড়ার কথাও দুজনার Optimism এর ভিতরই খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

মেটারলিঙ্ক বলিয়াছিলেন যে, যে মানুষ কাঁদিতে সুরু করে, তাহার সে কান্নায় আঁচ চারদিকে অশ্রুর আগুন ছড়াইয়া সমস্ত ছারখার করিয়া দেয়, আর মানুষের হাসিও আনন্দ-ফোয়ারার মত উৎসারিত হইয়া চারিদিকে আনন্দ ও হাসির তুফান তৈরী করে।' মেটারলিঙ্কের মতে মানুষের

জীবনে এই হাসির অভিমানের বড়ই প্রয়োজন। এই আনন্দ-রস-ঘন-উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বই তাঁহার কল্পনার কাম্য। দাদামহাশয়ও কবির অন্তরের স্বপ্নটুকু জীবনে ফুটাইয়া তুলিয়া আমাদের ভিতরে অনেক রস ও আনন্দের স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন। বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ ও তাঁহার দূরস্থ বন্ধুবান্ধব সে জন্য দাদামহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ।

উপনিষদে যাহাকে রস-স্বরূপ বলা হইয়াছে, তিনি তাহার অফুরন্ত মুক্ত ধারার একটি বেপমান তরঙ্গে এখানকার অনেকগুলি জীবনকে অনেক দিন ধরিয়া হিল্লোলিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের এ লোকের তটিনী হইতে সে-তরঙ্গ আজ অপসারিত হইলেও তাঁহার স্মৃতি কখনও লুপ্ত হইতে পারে না। তাঁহার সেই মঙ্গল-স্মৃতিতে এই শ্রাদ্ধ-বাসর মধুময় হইয়া উঠুক।—

মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধব :
মাধ্বীণঃ সন্তোষধীঃ
মধুনক্তম্ উতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
মধুমান্নো বনস্পতি মর্ধুমাং অস্তু সূর্য্যঃ।

['ব্রহ্মবাদী', অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩৩২, ৮:২—মাঘ ১৩৩২, ৮:১০—ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩৩২, ৮ : ১১-১২]

জীবনানন্দের রাজনীতি-সমাজ-চেতন প্রবন্ধ

* * * পৃথিবী ও সময় * * *

পৃথিবীর জাতিদের পরস্পরের ভিতর মৈত্রী স্থাপনের যে চেষ্টা কিছু দিন থেকে চ'লে আসছে—যার ফলে বিভিন্ন জাতীয়তা পৃথক সভ্যতা ও সংস্কৃতি মেনে নিয়েও এক অচ্ছিন্ন মানবসমাজের আশ্রয়ে মানুষ ও জাতি অন্তর্লীন অথচ স্বাধীন হয়ে থাকবার সুযোগ পেতে পারে—আনন্দে ও শান্তিতে—সে প্রয়াস যতটা কূটনৈতিক ততটা বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠতে পারেনি, এবং যেটুকু বা সংস্কারমুক্ত সত্যার্থী হতে সক্ষম হয়েছে ব'লে মনে হয় তার চেয়ে ঢের কম অনুপাতে আন্তরিক হতে পেরেছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের আগে রাষ্ট্রশক্তিদের পরিচালনায় পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির ভিতর ভাব ও চিন্তার যতদূর সম্ভব নির্ম্মল বিনিময়ে পরস্পরের অভাব অভিযোগ মোচন করবার এবং নীতি বা প্রেমের নির্দ্দেশে না হোক আধুনিক সার্থক লৌকিক বুদ্ধির প্রেরণায় সকল জাতি এসে মৈত্রী সম্বন্ধে মিলিত হওয়ার মত কোনো বিশেষ উদ্যমের পরিচয় দিয়েছিল ব'লে আমাদের জানা নেই।

যদিও ভাবনা প্রতিভার অধিকারী কবি শিল্পী ও মনীষী দার্শনিকেরা সকলের উন্নতি ও কল্যাণ-উৎসারী একটি পৃথিবী-পটভূমির স্বপ্ন অনেক দিন থেকেই দেখে আসছেন, কিন্তু জেনিভার জাতি-নিচয়ের পরিষদ সৃষ্টি হবার আগে সে স্বপ্ন নিরালম্ব নির্বস্তুক হয়ে রয়েছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পৃথিবী আজকের চেয়ে বড় ছিল—মানে, দীর্ঘতর ছিল। যানশিল্পের যে অভাবনীয় ও দ্রুতগতির ফলে দেশে দেশে দূরত্ব বিচিত্রভাবে সংকুচিত হয়ে পড়ছে—এক জাতি আরেক সুদূর জাতিরও হয়ে দাঁড়াচ্ছে নিকট প্রতিবেশী, প্রাকসামরিক পৃথিবীতে এটা সম্ভব ছিল না ; এ-জিনিষ কণ্টকল্পনার ব্যাপার ছিল প্রায়।

তাছাড়া দেশে দ্বীপে এই নিকট যোগাযোগের ফলেই সুদূরগত জাতিকেও প্রায় মুখচেনা পড়শীর মত দেখবার বুঝবার সুযোগ

পাওয়া যাচ্ছে—মানসিক দূরত্বের ব্যবধান ঘুচে যাচ্ছে, দৃষ্টিরীতির বৈষম্যের মানে ও মর্ম্মার্থ গ্রহণ করতে পারা ক্রমেই সম্ভব হয়ে উঠছে। এই সবেরই সঙ্গত সুফল আশা করতে পারা যেত ; সকলেই যখন কাছে, যে যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কেউ দূরে নয় বিচ্ছিন্ন নয়, তখন সকল জাতিকে নিয়ে যার যার ব্যক্তিস্বাধীনতা ও জাতিস্বকীয়তা সত্ত্বেও শান্তির ও মৈত্রীর হেতু-ভূমিতে এক অবিচ্ছিন্ন মানব পরিমণ্ডল গঠন করবার ইচ্ছা ও আয়োজন অসঙ্গত মনে করা যেতে পারত কি ? কিন্তু সৎ দার্শনিকের মনের নিভৃতে যে বিধানই চলতে থাকুক না কেন—মানবমৈত্রীর পরিবর্তে জাতিবিদ্বেষ, দেশে দেশে সংঘর্ষ নিরবচ্ছিন্ন রক্তান্ধকার আধুনিক ইতিহাসের পৃষ্ঠা অশুদ্ধ ভাবনা ও বিমিশ্র বাসনার শূন্যতা ও নিষ্ফলতায় আড়ষ্ট ক'রে রাখছে। পরের জিনিষে লোভ, নিঃসহায়কে নিংড়ানো, শোকাবহ স্বৈরাচার বারবার যুদ্ধ, মন্বন্তর ও কালোবাজারের অন্ধ বিমূঢ়তা সৃষ্টি ক'রে চলছে। কিন্তু তবুও এটা মানব সভ্যতার উষাকুয়াশা, গোটা ভবিষ্যৎ হয়তো মানুষের সম্মুখে—এ কথা ভেবে ও মানুষের মানবতা মাঝে মাঝে স্তিমিত হওয়া সত্ত্বেও তা পুনরায় জ্যোতিষ্ক্রয় এই সত্য মনে রেখে আমরা মানুষের প্রতি আস্থা না হারিয়ে তার প্রকৃত প্রতিভা-সঙ্গত বাস্তবমর্ম্মের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য ক'রে অগ্রসর হ'তে থাকব।

প্রথম মহাসমরের পরেই এসেছিল যে জেনেভীয় পরিষদ তা' আজ আর নেই। সে সব আশা আকাঙ্খার ধূলো বালির ভিতর আর একটি বিস্তীর্ণ সর্বজাতীয় ?—পরিষদের উদয় হয়েছে। ইউরোপ ও আমেরিকার এই জাতীয় বড় প্রতিষ্ঠানে এশিয়া আফ্রিকার নানা জাতির প্রতিনিধি উপস্থিত থাকলেও এ যে মুখ্যতঃ যুদ্ধজয়ী শ্বেতপুরুষদের নিজেদেরই সুখসুবিধা ও শুভানুধ্যানের কাজে খাটছে ইউএনো সম্পর্কে সে সংস্কার নিরসনের কোনো সুযোগ এখনও (নিঃসন্দেহে) পাওয়া যাচ্ছে বলে মনে হয় না। ভবিষ্যতে পেলে তা আনন্দের বিষয় হবে। রাশিয়ার সঙ্গে অন্য বড় শক্তি দুটির মতের মিল বেশি নেই ; চিন্তারশ্মির কোনো এক তির্য্যক সম্মেলন-লোকে মনের মিল আছে হয়তো—বেশ চূড়ান্তভাবেই আছে। কিন্তু নিগূঢ় মনোমিলন বা প্রকট মনান্তর জাহির ক'রে কূটমন্ত্রণা চলে না। এরা কেউই তা করছে না। প্রত্যেকেই খুব সন্তর্পণে চলচে।

বৃটিশ কমনওয়েলথের একটি অসুস্থ ইন্দ্রিয়নিষ্ঠ অঙ্গ—যেমন দক্ষিণ আফ্রিকা—ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের ওপর অত্যাচার ও তার যুক্তিহীন জবাবদিহি চালিয়েই ক্ষান্ত নয়, আরো কিছু দক্ষিণ-পশ্চিমী দেশপ্রসার

চাচ্ছিল। ইহুদী-আরব সমস্যা অবিশ্যি জাতিমুখপাত্রদের নিজেদের নিকট-লোকের সমস্যা নয় ; কিন্তু তা হ'লেও হতে পারত। যে অন্তরায়ের জন্য তা'হওয়া সম্ভব নয় সেই নিভন্ত সাম্রাজ্য তার অর্থহীন স্বত্ববোধ ও শ্বেত-মানুষের দায়িত্বভার নামে অর্দ্ধসত্যের আবেশে আর চলতে পারছে না—তাকে সরে পড়তে হচ্ছে আজকালই। ইন্দোনেশিয়ার বেলাও এই রকমই হবে।

ভারতবর্ষে যে সাম্প্রদায়িক রূঢ়তা ও মনের রুগ্নতা বড় বেশি প্রসার লাভ করছিল আজকাল, এরকম কিছু আধুনিককালে বৃটেনের ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্টদের মধ্যে ঘটলে এ্যাটলী প্রমুখ বৃটিশমন্ত্রীদল কদিন তা সহ্য করতেন—এই বিকার ও ব্যাভিচারের জন্য যে ছোট বড় নায়কগণ দায়ী তাদের কি জাতীয় শাস্তি দেওয়া হত—এই হৃদয়হীন অসামাজিক ব্যসন দমন ও নিয়ন্ত্রণ ক'রে শান্তি ও স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে কি পরিমাণ অর্থ ও সামর্থ্য মুহূর্তের ভিতর সঞ্চারিত করা হত?

ভারতবর্ষ বৃটেন নয় অবশ্য—সেই দূর দ্বীপের স্বাধীন আত্মসিদ্ধির ভূমি হয়েছিল অনেকদিন। আমাদের কাজ আমাদের হাতে তুলে দেবার মত আশ্চর্য্য অনাত্মসিদ্ধির দিন এসে পড়েছে তার, দেখছি তো। দায়িত্ব ঢের বেড়ে গেছে আমাদের।

যে শুভজাতক পৃথিবীরাষ্ট্র আজো জন্মায়নি—অর্থনৈতিক ন্যায়, বিজ্ঞানী উপায় ও আন্তরিকতার কল্যাণ তার যদি আজ উদয় হত তবে সেখানে আধুনিক ভারতের সাম্প্রদায়িক রুক্ষতার মত কোনো সমস্যা দেখা দিত না হয়তো, কিন্তু আকস্মিকভাবে ঘটে গেলে যে দৃঢ় দক্ষ ও সৎ উপায়ে অবিলম্বেই তার সমাধান হত, আজকের কোনো একক বা মিলিত সভ্য-জাতিদের পক্ষে পরের জন্য সে দুঃসাধ্য সাধনের সংকল্প খুব যে ঐকান্তিক তা মনে হয় না। এসব সম্পর্কে আমাদের নিজেদেরই আরো বিহিত চেতনা এবং সেই চেতনালব্ধ কর্ম্মশক্তির আরো সকল্যাণ সক্রিয়তার প্রয়োজন। প্রতি মানুষ সম্প্রদায় ও প্রত্যেক জাতিই আজকের এই কঠিননিরেস চোরা-বালির পৃথিবী বেয়ে মানুষের প্রাণের অবৈকল্যে ভালো-সমাজের সূর্য্যা-লোকে অগ্রসর হয়ে পড়বার প্রয়োজন অনুভব করছে ; নিজের ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিসত্তার অতীত সমাজ ও সময়ের নির্দ্দেশে। একজন লোকের ও সম-বায়ের সততা ও সম্ভ্রমের বিকাশ ও সংরক্ষণের ভার পৃথিবীর যে কোনো সমবায়ের, সমষ্টির বা ব্যক্তির হাতেই ; এই চেতনা আধুনিক সভ্যতার ও আজকের অর্থবিজ্ঞানের সংকট ঘোচাতে পারে ব'লেই মনে হয়। কিন্তু ঘোচাতে গিয়ে চরিত্রের যে নিতান্ত বিশুদ্ধ ও আন্তরিকতার প্রমাণ দিতে

হয় মানুষকে, সেই পথ আশ্রয় ক'রে জীবন সম্পর্কে আরো নিহিত—আরো সত্য ধারণার ফলে ভবিষ্যৎ সমাজ-কল্যাণ দেখা দেবে—এ প্রত্যাশা অসঙ্গত নয়। অবশ্য অর্থনীতি ও বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক পরিণতির মধ্যে মানবচরিত্রের ক্রমেই অধঃপাতের ভূমিকা ত্যাগের আভাস মানুষের ভিতরে—অন্তিম বিশ্লেষণে—মানুষ সম্পর্কে অকৃত্রিম মূল্যচেতনা আছে বলেই সম্ভব হবে আশা করি।

['সোনার বাংলা', শারদীয় সংখ্যা ১৩৫৪]

জীবনানন্দের সাহিত্যিক প্রবন্ধ

* * * নজরুলের কবিতা * * *

নজরুল ইসলাম অনেক দিন থেকে কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছেন। এর দৈহিক ওজর আমাদের জানা আছে ; আত্মিক, ঐতিহাসিক কারণও রয়েছে।

জনগণ, ভদ্রসাধারণ এখনও ম'রে বেঁচে আছে ; সার্বিক নিপট মৃত্যু, এদের জন্যে—এবং তার ভিতর থেকে আরও একবার বেঁচে উঠবার অধ্যায়—জীবনকে নতুন করে প্রতিপালন করবার প্রয়োজনে।

কিন্তু আমাদের সামাজিক জীবনে এই মৃত্যু ও জীবন সবার কাছে দুরতিক্রম্য নয়। যতদূর ধারণা করতে পারি এই মানুষের পৃথিবীতে অনেকদিন থেকে এই রকমই চলেছে ; একটি সময় বৈশিষ্ট্য ক্ষয়িত হয়ে নতুন সাময়িকতাকে নিয়ে আসে। এতে সমাজ কাজে উন্নত না হোক (বা হোক), মূল্যচেতনায় স্থিরতর হবার অবকাশ পায় ব'লেই তো মনে হয়। প্রবীণ বিরস মনীষীরা যাই ভাবুন না কেন, সাধারণের মানব-মন মনে করে যে ভোর আসছে। একেই কখনো বুদ্ধের, ধর্মাশোকের বা ফরাসী বিপ্লবোত্তর মানবীয় প্রাতঃকাল ব'লে মনে হয়েছে। সে-সব প্রাতঃকাল উন্মেষেই মিলিয়ে গিয়েছে বারবার। ইতিহাসে দীর্ঘ সুদিন কোথায় পেলাম আমরা—এবং সুদীর্ঘ সুরাত্রি ? কিন্তু তবু আবারও ভোর আসছে।

এর থেকে নিরাশার মতামতে উপস্থিত হওয়া যায়, কিংবা জীববিজ্ঞানীর কাছ থেকে জেনে নিয়ে এই মর্মে উপস্থিত হওয়া যায় যে মানুষ এখনও শিশু—তার সভ্যতার অন্তিম ক্ষণ এতো দূরে যে আমাদের পক্ষে তা নেই ; আমরা এসেছি কেবলমাত্র ভূমিকার ভাঙা-গড়ার ভিতর। আমরাও এই ভাবি। একটি যুগ ভেঙে যাচ্ছে দেখে আমাদের কারো সাহিত্য-স্বভাব ভাঙনের রচনায় উদ্বেলিত হয়েও যা আজও পাওয়া যায়নি এমন কোন নতুন সময়ের আভাসে প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠতে চায় ; কিন্তু স্থিরতা

পায় কি ; অর্থ সফলতা লাভ করে ? ফলে আমাদের আগামী যুগের কবিতা অত্যন্ত স্থূল হয়ে দাঁড়ায় : যে-সব নিয়মের প্রভাবে আগামীকাল ক্রমে ক্রমে এসে পড়ছে তাদের ভিতর থেকে কয়েকটিকে প্রতীক বা প্রবর্তয়িতার মত চালিয়ে আমাদের কবিতা কি নবীন হয়ে ওঠে কিংবা কবিতা হয় ? আর তা নয় তো বস্তুশক্তির দুরন্ত ক্রিয়াকৌশলের পরিহাসের দিকে লক্ষ্য রেখেও একান্তভাবে ভাবনানিষ্ঠ হয়ে গিয়ে আধুনিক ও আগামীকালের কবিতা কারো কারো মতে এত বেশি তনুসূক্ষ্ম হয়ে দাঁড়ায় যে আজকের কর্তব্যাসক্ত মানসের বিচারে সে-কবিতার শব্দ, ভাষা, ইঙ্গিত সমস্তই অসঙ্গত, আচ্ছন্ন ব'লে মনে হয়। এখনকার বাংলা কবিতায় এই দুটি স্বভাবই লক্ষিত হয়—প্রথমটি নিশান হাতে নিয়ে অগ্রসর হয়েছে—নিজের বা অপরের মুখে মানুষের আকাঙ্ক্ষিত দিব্য দিনের কিছু-না-কিছু স্বাদ পেয়েছে ব'লে। কিন্তু এই দুই প্রকৃতির মিশ্রণে ভালো কবিতা পেয়েছি—নিতান্ত কম নয়।

এ কালের বাংলা কবিতার এইসব অভিব্যক্তির আগে কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন। (তখন তাঁকে 'বিদ্রোহী কবি' বলা হতো)। আমাদের দেশে যে বিশেষ সময়রূপ কাজ ক'রে যাচ্ছিল, তেরো শো পঁচিশ-আটাশ-তিরিশে একদিকে যেমন তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসছিল, অন্যদিকে কয়েকটি ইতিহাসোত্থ কারণ এবং অঙ্গাঙ্গী নতুন সময়পর্ব তাকে উদ্বুদ্ধ করছিল বলে তা একটি আশ্চর্য রক্তচ্ছটায় রঞ্জিত হ'য়ে উঠেছিল—যাকে মৃত্যুর বা অরুণের জীবন ব'লে মনে করতে পারা যেত। নজরুলের অনেক কবিতাই সেই সময় লেখা হয়। মনের উৎসাহে তিনি লিখতে প্রলুব্ধও হয়েছিলেন ; নিভে যাবার আগে বাংলার সময়পর্যায় তখন বিশেষভাবে আলোড়িত হ'য়ে উঠেছিল ব'লে। এরকম পরিবেশে হয়তো শ্রেষ্ঠ কবিতা জন্মায় না, কিংবা জন্মায়, কিন্তু মননপ্রতিভা ও অনুশীলিত সুস্থিরতার প্রয়োজন। নজরুলের তা ছিল না। তাই তাঁর কবিতা চমৎকার কিন্তু মানোত্তীর্ণ নয়। জনগণ তখন আজকের মত ঈষৎ উন্নীত—কিংবা রূপান্তরিত ?—ছিল না ; চমৎকার কবিতা চাচ্ছিল, (আজো জনমানস রকমফেরে তাই-ই চায়—যদিও), নজরুল সেই মন স্পর্শ করতে পেরেছিলেন এমনভাবে যে আজকের কারো কোনো জনসাধারণের জন্যে তৈরী কবিতা বা গদ্যকবিতা ফলত পদ্যের স্তরে নেমেও তা পেরেছে কি না বলা কঠিন। তখনকার দিনে বাংলায় লোকোত্তর পুরুষ কম ছিলেন না—শ্মশানের পথে সন্তানোৎসব জমেছিল বেশ খানিকটা ঔদাত্ত্যে। নজরুল ইসলামের আগ্রহ পুষ্ট হয়েছিল, তিনি অনেক সফল

কবিতা উৎসারিত করতে পেরেছিলেন। কোনো কোনো কবিতায় এত বেশী সফলতা যে কঠিন সমালোচকও বলতে পারেন যে নজরুলী সাধনা এইখানে-এইখানে সার্থক হয়েছে ;—কিন্তু তবুও মহৎ মান এড়িয়ে গিয়েছে।

কোনো এক যুগে মহৎ কবিতা বেশি লেখা হয় না। কিন্তু যে বিশেষ সময়ধর্ম, ব্যক্তিক আগ্রহ ও একাত্মতার জন্যে নজরুলের অনেক কবিতা সফল ও কোনো কোনো কবিতা সার্থক হয়েছিল—জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় মূল্য ও মাত্রাচেতনায় খানিকটা সুস্থির হ'য়েও আজকের দিনের অনেক কবিতাই যে সে তুলনায় ব্যাহত হয়ে যাচ্ছে তা শুধু আধুনিক বিমুখ সময়রূপের জন্যেই নয়—আমাদের হৃদয়ও আমাদের বিরূপাচার করে, অনেক সময়ে আমাদের মনও আমাদের নিজের নয় ; এই সাময়িকতার নিয়মই হয়ত তাই। কিন্তু নজরুলের ব্যক্তিকতা ও সময় এই বুদ্ধিসর্বস্বতার হাত থেকে তাঁকে নিস্তার দিয়েছিল। আধুনিক অনেক কবিতা থেকে তাঁর কোনো কোনো কবিতার অঙ্গীকার তাই বেশি, ধ্বনিময়তাও উৎকর্ণ না করে এমন নয়। কিন্তু নিজেকে বিশোধিত করে নেবার প্রতিভা নেই এ-সব কবিতার বিধানে, শেষ রক্ষার কোনো বিধান নেই।

পরার্থপরতার চেয়ে স্বার্থসন্ধান ঢের হেয় জিনিস ; স্বার্থসাধন কিছুই নয় ; কিন্তু কোটি মানসের আত্মোপকার প্রতিভাই তাকে নির্মাতার উপরের ভূমিকায় ওঠাতে সাহায্য করে, কবিতাকে তার অন্তিম সঙ্গতির পথে নিয়ে যায়। এরই স্বভাবে সৃষ্ট কবিতা ব্যাপ্ত ও গভীর হয়ে উঠতে পারে। নজরুলের প্রথম ও শেষ কবিতা এরই অভাবে একই সূচনায় বিচ্ছিন্ন হয়ে ততদূর স্থান হারিয়ে ফেলছে। (রোগমুক্তির পর নজরুল এই বিষয়ে অবহিত হ'য়ে উঠবেন আশা করি।)

['কবিতা', কার্তিক-পৌষ ১৩৫১]

জীবনানন্দের সাহিত্যিক প্রবন্ধ

* * * লেখার কথা * * *

নিজের প্রয়োজন ও মতামত মুখের ভাষায় অন্যের কাছে ব্যক্ত করা প্রায় কোনো স্বাভাবিক লোকের পক্ষেই কঠিন নয়। সে-ভাষা ভালো গদ্যও হতে পারে ; পদ্য অবিশ্যি হবে না ; পয়ারে বা ছড়ায় কথা ব'লে সংসার সমাজে চলাফেরার রেওয়াজ অনেক দিন হয় আমাদের দেশ—পৃথিবী থেকেই উঠে গেছে।

কিন্তু চিঠি ছাড়া আর কিছু লিখতে হলে অনেকের পক্ষে কলম চালানো মাঝে-মাঝে বেশ কঠিন হয়ে ওঠে। চিঠিও সকলে তরতর ক'রে লিখে যেতে পারেন না। এমন অনেক লোক আছেন, যাঁরা নিজ ভাষায় সামান্য বিষয় নিয়ে চিঠি লিখতে গিয়েও মুস্কিলে প'ড়ে যান ; কাটাকুটি অদলবদল ক'রে চিঠির একটা মোটামুটি খসড়া তৈরি হলে ভেবে-চিন্তে আস্তে-আস্তে সেটা টুকতে থাকেন। এত মাথা ঘামিয়েও চিঠি তাঁদের চলনসই গদ্য মাত্র, সাহিত্য নয় ; তবে, কোনো ঘোরপ্যাঁচ নেই, যা বলবার ভাঙা-ভাঙা ভাষায় পরিষ্কারভাবেই বলা হয়েছে। কিন্তু অবাক হয়ে ভাবতে হয়, এ দু'পাতা লিখতে গিয়ে এত মুসাবিদার কী দরকার ছিল। লেখাও হয়েছে বাংলায়—কোনো বিদেশী ভাষায় নয়। দিনরাত যা মুখে বলা হচ্ছে চিঠির ভাষা তার চেয়ে প্রায়ই ভালো নয়, তবুও মুখে বলতে যেটা তিন-চার মিনিট লাগত, চিঠিতে দাঁড় করাতে গিয়ে লাগল আধঘন্টা—তিন কোয়ার্টার। কলমের নিব খারাপ নয়, কালিও ক্বাথ হয়ে যায়নি। খুব সম্ভব এঁদের লেখার অভ্যাস নেই, লেখা সম্বন্ধে একটা অবোধ্য ভয়ও রয়েছে মনে-মনে, মুখের ভাষা যে অনেক সময় লেখারও ভাষা, কেমন একটা সংকোচ সন্দেহ রয়েছে তাতে।

কিন্তু লেখক নয়—কোনো দিন প্রবন্ধ গল্পে অবিদ হাত দেয়নি, এমন কোনো-কোনো লোককেও দেখেছি কথা বলবার সময় জিভ যে-রকম নড়ে

প্রায় সেই সঙ্গেই তাল রেখে কলম চালিয়ে গেছেন। নিজের ভাষায় খুব তাড়াতাড়ি চিঠি লিখে ফেলা প্রায় বারো আনি লেখাপড়া-জানা মানুষের পক্ষে কঠিন কিছু নয়। টেবিলে বা জলচকীতে—নিদেন হাঁটুর ওপর একখানা বই চাপিয়ে, ওপরে চিঠির কাগজ রেখে পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের লিখতে দেখা যায় এত সহজ দ্রুতত্বে যে নিবে বেধে কাগজ ছিঁড়ে গেলেও পারত, কিন্তু টিঁকে রয়েছে সব, লেখাও মানানসই হয়েছে, চার-পাঁচ পাতার চিঠিও মিনিট দশ-বারোর ভেতর শেষ হয়ে গেছে।

এঁদের কিছু-কিছু চিঠি সাহিত্য হিসেবে গৃহীত হতে পারে। কিন্তু এ-লেখকদের নাম নেই ব'লে তারিখ পেরিয়ে এ চিঠিগুলো উৎরোয় না। হয়তো তাই-ই ভালো। পৃথিবীতে সাহিত্যের স্তূপের বেশি বাড় ঠিক নয়। সেই সূক্ত-সাহিত্যের সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের দেশেই যা জন্মেছে, অনেক অনেক বাছাই ক'রে তারও দিশা পাওয়া কঠিন। পড়ে কে, খবর রাখে ক'জন, সময় কোথায়।

কোনো কাগজপত্রে লেখা ছাপাবার কথা ভাবতে যায়নি, লিখিয়ে হিসেবে সমাজেও পরিচিত নয়, এমন অনেক বাঙালিকে ইংরেজিতে তাড়াতাড়ি বড়-বড় চিঠি লিখে ফেলতে দেখেছি। যাঁরা এটা পারেন তাঁরা বিবৃতিও লিখে ফেলতে পারেন—নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে প্রবন্ধও খুব সম্ভব। লেখার দিকে সে-রকম ঝোঁক থাকলে এঁরাও বোধহয় ভালো ফলাতে পারেন—শুধু আক্ষরিক লেখা নয়, সাহিত্যও। কিন্তু সব দেশেই আজকাল লেখকদের বেশি ভিড়। সেটা এড়িয়ে এঁরা ভালোই আছেন। অন্য কারণে না হোক এই জন্যেও এঁদের এক-আধখানা চিঠি সাহিত্যের ইতিহাসে বাঁচিয়ে রাখা উচিত।

আমি সে-দিন এক বন্ধুর সঙ্গে বিশেষ কারণে দেখা করতে গিয়েছিলাম সকালবেলা। চিঠি লিখছিলেন। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে চোখ তুলে বললেন, 'বোস।' ইনি চিঠি লিখতে আরম্ভ করলে লেখা না শেষ ক'রে মানুষের সঙ্গে যে কথা বলবেন না, সে-দিনও রকম-সকমে সেটা বোঝা গেল ; এঁর বরাবরকার এ-প্রকৃতি অজানা ছিল না অবিশ্যি আমার। চিঠি লেখার ফাঁকে-ফাঁকে এক-আধটা কথা হয়তো চলতে পারে—বেতারের কোডের মতো ; কিন্তু সে-সবের বিশেষ কোনো লক্ষ্য নেই, অর্থ নেই, কথার ভেতরে লেখকের কোনো মনও নেই। কাজেই চুপচাপ ব'সে আঙুল-কলমের তড়বড়ানির দিকে তাকিয়ে রইলাম। লিখছেন ইংরেজিতে—চিঠির একটা পুরো প্যাড কোলে চাপিয়ে ; তিনখানা খাম টেবিলের ওপর ; প্রথম

চিঠিতে হাত দিয়েছেন মাত্র। এক-একখানা চিঠি কত বড় হবে? যত বড়ই হোক—কলম কোনো রেহাই পাচ্ছে না, চাচ্ছেও না। এ-রকম লিখিয়ের হাতে পড়লে কাগজ বিষয় ভাষা ও কলম নিজেদের ভেতর যে একটা সহজ ত্বরিৎ মীমাংসা খুঁজে পায়, তা তাৎপর্যেও গভীর হলে তো আর কথাই নেই। তিনখানা চিঠি লেখাই শেষ হল—বোধ হয় দশ-বারো পৃষ্ঠা হবে—মিনিট কুড়ি সময়ের মধ্যে। আমি এসেছি ব'লে তাড়া ক'রে নয়। দায়সারা কাজ নেই। দু'টো চিঠি আমাকে পড়তে দিলেন। কাকে লিখেছেন, কিছুই জানা নেই, বাইরের লোক—এ-সব চিঠি আমি কেন পড়ব—ভাবভঙ্গিতে এরকম একটা ওজর ফুটিয়ে চিঠি দু'খানা হাত পেতে নিলাম তবু—এত তাড়াতাড়ি এত কী লেখা যায়, দেখবার জন্যে। দিব্যি হাতের-লেখা, পরিষ্কার ভাষা, কোথাও কোনো খুঁৎ-ভুল কিছুই নেই; মনে হল উজ্জ্বলই; নাহোক প্রাঞ্জল তো একান্তই; সাহিত্য বলা যেতে পারে; এত চট ক'রে লিখে ফেললেন। ইস্কুল-কলেজে মাস্টারি করেন না, কাগজে ইংরেজি প্রবন্ধও লেখেন না, চিঠিফিটি আঁকড় না; কিন্তু এ চিঠি দুটোই পত্র-সাহিত্য; দু'বার ভেবে তিনবার কেটে নয়—কলমে সহজেই এসেছে সব। ইনি ইংরেজি ভালোই জানতেন, জানতাম; কিন্তু সহজ লেখার ক্ষমতা শুধু ভাষাজ্ঞানের ওপর নির্ভর করে না। অনেক বড় সাহিত্যিক সময় নিয়ে ভেবে-চিন্তে লেখেন; এক পাতা চার বার লিখে পাঁচ বারের বার লেখাটা দাঁড়ায় হয়তো। ফ্লোবেয়ার ও টলস্টয়ের দৃষ্টান্ত আছে। রবীন্দ্রনাথের কোনো-কোনো পাণ্ডুলিপির কাটকুটে বোঝা যায় লেখক কত ভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি মোটামুটি খুব সম্ভব দ্রুতবেগে লিখতে পারতেন। য়েটসই বোধ হয় তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন: আপনি কী ক'রে এত তাড়াতাড়ি লেখেন, আমি তো লেখার তাগিদ নিয়ে আবছা দেয়ালের দিকে অনেকটা সময় তাকিয়ে থাকি।

আমার বন্ধুটির চিঠি-সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ য়েটসের সাহিত্যে অবিশ্যি অনেকখানি তফাৎ। কিন্তু ছোট-বড় সব লেখকদের ভেতরেই এমন লোক আছেন যাঁরা বলবার কথা বেশ সহজে শীগগিরই গদ্যসাহিত্যে ফলিয়ে তুলতে পারেন, অন্যদের দেরি হয়। আমার মনে হয়, মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করেও হলে সব শিল্পীরই প্রায় সর্বদাই অনেকখানি সময়ের প্রয়োজন। সহজ—মোটামুটি সৎ সাহিত্য কোনো-কোনো লেখক হামেশাই লিখছেন—এক রকম কলম হাতে নিলেই হল।

কিন্তু সাহিত্যিক হিসেবে এঁদের মতন কিংবা মহত্তর হয়েও অন্য

এক জাতের লেখক ঝোঁকের মাথায় না লিখে তলিয়ে ভেবে দেখে আস্তে-আস্তে লেখেন। মনকে অনেক বেশি ব্যাপ্তিপ্রসাদ ও নিবিষ্টতায় টেনে নিয়ে, আমার মনে হয়, এই ধরনের লেখকদের ভেতর থেকেই ঠিক শিল্প-ঘন—এমনকি মহান লেখা সৃষ্টি হয়। জীবনকে যাঁরা ভালো ক'রে বুঝে পরিষ্কার তাৎপর্যে দেখাতে পেরেছেন তাঁদের হাতেই বড় সাহিত্য তৈরি হবে। প্রায়ই মানুষের বা শিল্পীর চেতনায় ভাসা-ভাসা স্তরই প্রথমে জেগে ওঠে। যে-লেখক এই চেতনাস্তরকে ভেদ ক'রে আরো স্পষ্ট চৈতন্যে স্থিত হয়ে ঠিক শব্দ, ভাব, ভাষা যথাসম্ভব শীগগির লাভ করতে পারেন, তাঁর শক্তি খুবই অসাধারণ, কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে সে-রকম লেখক খুব কম। কবিতার বেলায় অবিশ্যি কবির সমস্ত চৈতন্য একসঙ্গে কাজ করতে থাকে। কবিতার মোটামুটি একটা নমুনা গ্রথিত ক'রে তুলতে খাঁটি কবির অনেক সময়ই বেশি দেরি হয় না ; কিন্তু তবুও কবিতাটিকে পরবর্তী প্রকৃতি সিদ্ধির স্তরে পৌঁছিয়ে দিতে হলে সময়েরও দরকার।

গদ্য লেখবার সময় লেখকের চেতনার অতটা গাঢ় মন্থন প্রায়ই হয় না—কবিতা লেখবার সময় যেমন হয়। হবার দরকারও নেই, গদ্যের কাজ যুক্তি নিয়েই বেশি। গদ্য সাহিত্যের সিদ্ধি ও সার্থকতার নানারকম মান ও বিভিন্নতা রয়েছে। কোনো-কোনো লেখকের সাহিত্যকৃত্য তাড়াতাড়ি চলে, সহজেই অনেক রকম সার্থকতা আয়ত্ত ক'রে নিয়েছে ব'লে মনে হয়। কিন্তু সার্থকতাকে মহৎ সাহিত্যে দাঁড় করাতে হ'লে গদ্যশিল্পীর অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞা ছাড়া—প্রায়ই সময়েরও প্রয়োজন। শিক্ষিত লোকের হাতে অল্প সময়ের মধ্যেই দু'খানা চিঠি-সাহিত্য তৈরি হতে পারে বটে, যেমন ইংরেজি-নবিশ বন্ধুর কথা বলছিলাম। কিন্তু মন্টেন, স্যর টমাস মুর, বেকন বা প্যাসকালের সন্দর্ভ অথবা ওয়ালটনের কমপ্লিট অ্যাঙলার বা ল্যামের লেখা কিংবা ড্রাইডেন বা আধুনিক কালের এলিয়ট বা বাংলা আলোচনা-সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী এবং আগেকার ও এখনকার বড় লেখকদের গদ্য-সাহিত্যের সিদ্ধি পেতে হলে তার চেয়ে বিভিন্ন অন্য এক ধরনের লেখা ও লেখকের প্রয়োজন। সে-সব লেখাও প্রায় প্রতি পাতায়ই লেখকের মননে বারংবার আলোচ্য ; এ-ধরনের লেখা প্রায়ই ঘড়ি ধ'রে আগলানো কঠিন ; বেশি সময় লাগে।

অন্য নানা রকম সার্থক জিনিসের মতন লেখারও চর্চা রাখলে অবিশ্যি লেখা ক্রমেই সহজ হয়ে আসে—খুব সম্ভব অনেক কিছু বিষয়ই ঠিকভাবে লেখা যায়—তাড়াতাড়িও লেখা যায় হয়তো। কিন্তু চর্চা রাখলেও সব

লেখকের লেখাই সাহিত্য নয় না—সৎ সাহিত্য তো আরো ওপরের জিনিস। চর্চা বা সাধনা ছাড়াও লেখকের পক্ষে উঁচু দরের মননের দরকার—লেখায় বিশেষ সিদ্ধি পেতে হলে।

বিজ্ঞানের বা মানুষের যুক্তিপথের বাইরে যা রয়েছে তা অসত্যও নয়—যুক্তির আয়ত্তে এখন পর্যন্ত আনতে পারা যাচ্ছে না ব'লে তাকে সত্য ব'লেও গ্রাহ্য করতে পারা যাচ্ছে না। বাকি সব যুক্তির কাছে সত্য হলে সত্য। অনেকে মানুষের যুক্তির মূল্য মানেন না; তাঁদের মতে বুদ্ধি বা যুক্তি দিয়ে জগতের ব্যাপার বোঝা যায় না, বিজ্ঞানীসুলভ বোধি দিয়েও না; আরো যুক্তিনিঃসক্ত হতে হবে। খুব সম্ভব এমন এক ধ্যানপ্রস্থানে পৌঁছতে হবে, যেখানে বুদ্ধি, যুক্তি কিছু নয়। এঁদের সিদ্ধান্ত কতখানি সত্য জানবার সুযোগ এখন পর্যন্ত হয়নি আমার। যুক্তির পথ লঙ্ঘন করবার কোনো কারণ আছে কিনা অনুভব করতে পারছি না। তবে এঁদের একটা কথা ভাববার মত। এঁরা বলেন, শুদ্ধ বিশ্বাস থাকা দরকার। যে-সব জিনিস সত্য ও পরমার্থ ব'লে এঁরা বিশ্বাস করেন, সে বিশ্বাসে এঁদের এত দাবী যে যুক্তির ওপরও প্রায় কোনো যুক্তিবাদীরই খুব সম্ভব ততটা কিছু নেই। যুক্তির ওপর শুদ্ধ আস্থা থাকা দরকার। কিন্তু যুক্তির অজুহাতে বিজ্ঞান বা মনোবিজ্ঞানের অজ্ঞাত জিনিসগুলোকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। মন ও নির্মন সম্বন্ধে আরো তথ্য পরিষ্কারভাবে জানা দরকার। কবিতা লেখার সময় চৈতন্য যে-রকমভাবে উদ্বুদ্ধ হলে গোটা কবিতাটিকেই প্রায় ঠিকমতন অবস্থায় তাড়াতাড়ি লাভ করা যায়, উদ্বোধনে বিপর্যয় ঘটলে, বা বাধা পেলে, মনের সক্রিয় অংশগুলো অনেক চেষ্টা ক'রেও যে বিশেষ কিছুই ক'রে উঠতে পারে না, তার কারণ বিজ্ঞান (মনের) পরিষ্কার ভাবে বোঝাতে পারবে হয়তো একদিন; ব্যাপারটা, আমার মনে হয়, এমন কিছু অজ্ঞেয় নয়—যদিও অনেকের ধারণা রহস্যবাদগভীর সাহিত্য সৃষ্টি করবার তাগিদ ও শক্তি মহাশূন্যের ভেতর থেকে আসে। এ-মত খণ্ডন বা সমর্থন করবার কোনো দরকার নেই। সাহিত্যিকের মন অন্য মানুষের মনের বাইরের কিছু বস্তু নয়, সেই মনেরই এক ধরনের সিদ্ধিলাভ, জীবন নিয়েই তার কাজ, অভিজ্ঞতার কেন্দ্রবিন্দু ও ভাবনাঘন যুক্তির আশ্রয়ে।

['ময়ূখ', আষাঢ় শ্রাবণ ১৩৬৫]

* * * রবীন্দ্র-জীবনানন্দ পত্রবিনিময় * * *

[জীবনানন্দ-কে রবীন্দ্রনাথ]

১

কল্যাণীয়েষু,

তোমার কবিত্বশক্তি আছে তাতে সন্দেহ মাত্র নেই।—কিন্তু ভাষা প্রভৃতি নিয়ে এত জবরদস্তি কর কেন বুঝতে পারিনে। কাব্যের মুদ্রাদোষটা ওস্তাদীকে পরিহসিত করে।

বড়ো জাতের রচনার মধ্যে একটা শান্তি আছে যেখানে তার ব্যাঘাত দেখি সেখানে স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। জোর দেখানো যে জোরের প্রমাণ তা নয় বরঞ্চ উলটো। ইতি

২২ অগ্রহায়ণ ১৩২২ — শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

ওঁ

"Uttarayan"
Shantiniketan, Bengal

কল্যাণীয়েষু,

তোমার কবিতাগুলি পড়ে খুশি হয়েছি। তোমার লেখায় রস আছে, স্বকীয়তা আছে এবং তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে।

ইতি ১২.৩.৩৭
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত জীবনানন্দ দাশ
সর্বানন্দ ভবন
বরিশাল
Barisal

[রবীন্দ্রনাথ-কে জীবনানন্দ]

৩রা পৌষ ১৩৩৭[?]
66 Harrison Road, Calcutta

১

শ্রীচরণেষু,

আপনার স্নেহাশীষ লাভ ক'রে অন্তর পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে। আজকালকার বাংলাদেশের নবীন লেখকদের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য এই যে তাদের মাথার ওপরে স্পষ্ট সূর্যালোকের মত আধুনিক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীকে তারা পেয়েছে। এত বড় দানের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে হোলে যতখানি গভীর নিষ্ঠার দরকার দেবতা পূজারীকে কখনও তার থেকে বঞ্চিত করেন না। কিন্তু এ দানকে ধারণ করতে হলে যে শক্তির প্রয়োজন তার অভাব অনুভব করছি। অক্ষম হোলেও শক্তির পূজা করা এবং শক্তির আশীর্বাদ ভিক্ষা করা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সাধনা। আর আমার জীবনের আকিঞ্চন সেই আরাধ্য শক্তি ও সেই কল্যাণময় শক্তির উৎসের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা। আশা করি এর থেকে আমি বঞ্চিত হব না।

পত্রে আপনি যে কথা উল্লেখ করেছেন সেই সম্পর্কে দুএকটি প্রশ্ন মনে আসচে। অনেক উঁচু জাতের রচনার ভেতর দুঃখ বা আনন্দের একটা তুমুল তাড়না দেখতে পাই। কবি কখনও আকাশের সপ্তর্ষিকে আলিঙ্গন করবার জন্য উৎসাহে উন্মুখ হয়ে ওঠেন—পাতালের অন্ধকারে বিমজর্জর হয়ে কখনও তিনি ঘুরতে থাকেন। কিন্তু এই বিষ বা অন্ধকারের মধ্যে কিম্বা এই জ্যোতির্লোকের উৎসের ভেতরেও প্রশান্তি যে খুব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তা তো মনে হয় না। প্রাচীন গ্রীকরা 'সিরিনিটি' জিনিষটার খুব পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁদের কাব্যের মধ্যেও এই সুর অনেক জায়গায় বেশ ফুটে উঠেছে। কিন্তু যে জায়গায় অন্য ধরণের সুর আছে, সে কাব্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে হয় না। দান্তের ডিভাইন কমেডির ভেতর কিম্বা শেলীর ভেতর 'সিরিনিটি' বিশেষ নেই। কিন্তু স্থায়ী কাব্যের অভাব এঁদের রচনার ভেতর আছে ব'লে মনে হয় না। আমার মনে হয় বিভিন্ন রকমের বেষ্টনীর মধ্যে এসে মানুষের মনে নানা সময় নানা রকম 'মুডস্' খেলা করে। সে 'মুডস্' গুলোর প্রভাবে মানুষ কখনও মৃত্যুকেই বঁধু বলে সম্বোধন করে, অন্ধকারের ভেতরেই মায়ের চোখের ভালোবাসা খুঁজে পায়, অপচয়ের হতাশার ভেতরেই বীণার তার বাঁধবার ভরসা রাখে। যে জিনিষ

তাকে প্রাণবন্ত করে তোলে অপরের চোখে হয়তো তা নিতান্তই নগন্য। তবু তাতেই তার প্রাণে সুরের আগুন লাগে,—সে আগুন সবখানে ছেয়ে যায়। 'মুড'-এর প্রক্রিয়ায় রচনার ভেতর এই যে সুরের আগুন জ্বলে ওঠে, তাতে 'সিরিনিটি' অনেক সময়ই থাকে না—কিন্তু তাই বলেই তা সুন্দর ও স্থায়ী হয়ে উঠতে পারবেনা কেন বুঝতে পারছি না।

সকল বৈচিত্র্যের মত সুর-বৈচিত্র্যও আছে সৃষ্টির ভেতর। কোনো একটা বিশেষ ছন্দ বা সুর অন্য সমস্ত সুর বা ছন্দের চেয়ে বেশী করে স্থায়ী স্থান কি করে দাবী করতে পারে? আকাশের নীল রং, পৃথিবীর সবুজ রং, আলোর শ্বেত রং কিম্বা অন্ধকারের কালো রং—সমস্ত রংগুলিরই একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য ও আকর্ষণ আছে। একটিকে অন্যটির চেয়ে বেশী সুন্দর ও সুচির বলা চলে ব'লে মনে হচ্ছে না। এই অন্ধকার, এই আলো, আকাশের নীল, পৃথিবীর শ্যামলিমা—সবই তো সুচির—সুন্দর। সৌন্দর্য ও চিরত্বের বিচার তাই একটু অন্য ধরণের ব'লে মনে হয়। ঘুড়ির কাগজের সবুজ, নীল, শাদা বা কালো রং যখন পৃথিবী, আকাশ, প্রভাত বা রাত্রির বর্ণের সৌন্দর্য ও স্থায়িত্বের দাবী ক'রে বসে, তখন আর কোনো প্রসঙ্গের প্রয়োজন থাকে না। আমার তাই মনে হয়, রচনার ভেতর যদি সত্যিকার সৃষ্টির মর্যাদা থাকে তা হোলে তার ভেতরকার বিশিষ্ট সুরের প্রশ্নটি হয়তো অবহেলাও করা যেতে পারে। শান্তি বা সিরিনিটির সুরে কবিতা বেঁধেও সত্যিকারের সৃষ্টির প্রেরণার অভাব থাকলে হয়তো তাও নিষ্ফল হয়ে যায়।

বীঠোফেনের কোনো কোনো সিমফনি বা সোনাটা-র ভেতর অশান্তি রয়েছে, আগুন ছড়িয়ে পড়ছে,—কিন্তু আজো তো টিকে আছে—চিরকালই থাকবে টিকে, তাতে সত্যিকার সৃষ্টির প্রেরণা ও মর্যাদা ছিল বলে।

আমার যা মনে হয়েছে, তাই আপনাকে জানিয়েছি। আপনার অন্তর-লোকের আলোপাতে আমার ত্রুটি ও অক্ষমতাকে আপনি মার্জিত করে নেবেন আশা করি। আপনার কুশল প্রার্থনীয়। আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। প্রণত

শ্রীজীবনানন্দ দাশ

Sarbananda Bhaban
Barisal, 5-3-36

শ্রীচরণেষু,

আপনি আধুনিক পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ও মনীষী। আপনি মহামানব। আপনার সাহিত্যসৃষ্টি ও জীবন পৃথিবীর ইতিহাসে এক গভীর বিস্ময় ও গরিমার জিনিষ। জার্মান সাহিত্যে Goethe, ইংরেজি সাহিত্যে Shakespear-এর যে স্থান আমাদের দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে আপনার সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা।

এ যুগের বাঙালীর ও বিশেষ ক'রে বাঙালী যুবকের সবচেয়ে বেশী গৌরব ও আনন্দ এই যে আপনার অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও জীবনের নিত্য-নূতন দীপ্তি তার সম্মুখে র'য়ে গেছে।

আমি একজন বাঙালী যুবক ; মাঝে মাঝে কবিতা লিখি। অনেকবার দেখেছি আপনাকে ; তার পর ভিড়ের ভিতর হারিয়ে গেছি। আমার নিজের জীবনের তুচ্ছতা ও আপনার বিরাট প্রদীপ্তি সব-সময়ই মাঝখানে কেমন একটা ব্যবধান রেখে গেছে—আমি তা' লঙ্ঘন করতে পারিনি। আজ যদি St. Paul কিংবা খৃষ্ট, অথবা গৌতম বুদ্ধ পৃথিবীতে ফিরে আসেন আবার, তাহলে ভিড়ে চাপা প'ড়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা ক'রে আসব হয়তো ; কিন্তু তারপর তাঁরা আমাকে ভিড়ের মানুষ ব'লে বুঝে নেবেন।

প্রায় নয় বছর আগে আমি আমার প্রথম কবিতার বই একখানা আপনাকে পাঠিয়েছিলুম। সেই বই পেয়ে আপনি আমাকে চিঠি লিখেছিলেন ; চিঠিখানা আমার মূল্যবান সম্পদের মধ্যে একটি।

তখন আমি কলকাতায় কোন কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক ছিলুম। তারপর বাংলাদেশ ও এদেশের বাইরে নানা কলেজে ঘুরে এই তিন বছর হল বরিশালে ব্রজমোহন কলেজে অধ্যাপনা করছি।

প্রায় আট দশ বছর আগের রচিত কবিতা কুড়িয়ে এবার আর একখানা বই বার করলুম। এ বইখানা আপনাকে উৎসর্গ করতে পারিনি। এই একটা লজ্জা ও দুঃখ আমার রয়ে গেল। যতদূর শীঘ্র সম্ভব এই অপরাধ থেকে আমি নিজেকে মুক্ত করে নেব।

আমার এই বই—এই "ধূসর পাণ্ডুলিপি" আপনাকে পাঠালাম একখানা। মাঝে মাঝে ছাপার ভুল আছে—আরো ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে। কিন্তু

তবুও আমার মনে হয় বইয়ের কবিতাগুলোর একটা নিজস্ব soul রয়েছে। সাহিত্যের বিষয়বস্তু চিরন্তন; কিন্তু প্রকাশের বৈশিষ্ট্য বিশেষ বিশেষ রূপের জন্ম দেয়। কোনো কোনো রূপ—যেমন রবীন্দ্রকাব্য, Wordsworth বা Shelly-র কবিতা, অথবা Shakespeare-এর রচনা অনবদ্য হয়ে থাকে। সে যা হোক, নিজের কবিতা বা অন্য কোন কবিতার সমালোচনা নিয়ে আজ আমি উপস্থিত হতে চাই না। কালিদাস তাঁর মেঘদূতে বলেছিলেন শ্রেষ্ঠ জনের কাছে দাবি জানাতে হয়; তাঁরা মানুষের আন্তরিক দাবির সম্মান রক্ষা করেন। আমিও আজ একটা মস্ত বড় দাবি নিয়ে আপনার কাছে হাজির হয়েছি: আপনি যদি একটু সময় ক'রে এই বইটা প'ড়ে দেখেন—ও তারপর বিশদভাবে আমাকে একখানা চিঠি লেখেন তাহলে আমি খুব উপকৃত বোধ করব। বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করবার জন্য আপনাকে অনুরোধ [করছি] বলে ক্ষমা করবেন। কিন্তু আগেই বলেছি আমার আজকের দাবিটা খুব মস্ত বড়, এবং সবচেয়ে মহৎ জনের কাছে।

আপনার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি। আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী

জীবনানন্দ

পরিশিষ্ট : জীবনপঞ্জি

জন্ম ১৮৯৯ সাল ; ৬ ফাল্গুন ১৩০৫। (লাবণ্য দাশ জানিয়েছেন কবির জন্মসাল ১৮৯৮। দ্র. বিষ্ণু দে-সম্পাদিত "একালের কবিতা"-র ভূমিকা।) বরিশাল, বাংলাদেশ। পিতা : সত্যানন্দ দাশ ; মাতা : কুসুমকুমারী দাশ। পিতা স্নাতক, শিক্ষক, 'ব্রহ্মবাদী' নামে একটি পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, প্রবন্ধকার। মাতা কবিতা লিখতেন। তাঁরা তিন ভাই-বোন : জীবনানন্দ, অশোকানন্দ ও সুচরিতা। শিবনাথ শাস্ত্রী, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখের সঙ্গে পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা।

শৈশব পিতা কম বয়সে স্কুলে ভর্তি হবার বিরোধী ছিলেন ব'লে বাড়িতে মায়ের কাছেই বাল্যশিক্ষার সূত্রপাত। প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে পিতার উপনিষদ আবৃত্তি এবং মাতার গান শুনতেন। পরিবার-ভুক্ত অন্য সকলের মতো পরিচারক পরিচারিকাদেরও (আলি মামুদ, ফকির. মোতির মা, মোতিলাল, শুকলাল, রাজমিস্ত্রি মনিরুদ্দিন) আত্মীয় জ্ঞান করতেন এবং তাদের কাছে ব'সে নানারকমের কাহিনী, ছড়া ইত্যাদি শুনতে ভালোবাসতেন। অনেক গাছ, লতা, পাখির নাম শিখেছিলেন এদের কাছেই। লাজুক প্রকৃতির হ'লেও খেলাধুলো, ভ্রমণ ও সাঁতারের অভ্যেস ছিলো। ছেলেবেলায় একবার কঠিন অসুখে পড়লে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য মাতা ও মাতামহ চারণকবি চন্দ্রনাথ দাশের সঙ্গে লক্ষ্ণৌ আগ্রা দিল্লি ভ্রমণ।

শিক্ষা ব্রজমোহন স্কুল, বরিশাল ; ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল ; প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা ; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ম্যাট্রিক (১৯১৫, প্রথম বিভাগ) ; আই. এ. (১৯১৭, প্রথম বিভাগ) ; বি. এ (১৯১৯, ইংরেজিতে অনার্স) ; এম. এ. (১৯২১, ইংরেজি, দ্বিতীয় বিভাগ)।

বিবাহ ৯ মে, ১৯৩০। বিবাহ-বাসর রামমোহন লাইব্রেরি, ঢাকা-য়। লাবণ্য গুপ্তের (পিতা : রোহিনীকুমার গুপ্ত) সঙ্গে। সন্তান : মঞ্জুশ্রী দাশ, সমরানন্দ দাশ।

কর্ম অধ্যাপনার কাজেই কর্মজীবনের শুরু এবং সমাপ্তি। মাঝখানে কিছুদিনের জন্য কলকাতার দৈনিক পত্রিকা 'স্বরাজ'-এর সাহিত্য বিভাগের সম্পাদনায় নিযুক্ত ছিলেন ; ইনশিওরেন্স কোম্পানির এজেন্ট হিশেবে কাজ করেছেন কিছুদিন ; এক বন্ধুর সঙ্গে ব্যবসা করেছেন। অধ্যাপনা—সিটি কলেজ, কলকাতা (১৯২২-২৮) ; বাগেরহাট কলেজ, খুলনা (১৯২৯ : মাস তিনেক) ; রামযশ কলেজ, দিল্লি (১৯৩০-৩১) ; ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল (১৯৩৫-৪৮) ; খড়্গপুর কলেজ (১৯৫১-৫২) ; বরিষা কলেজ (১৯৫৩) ; হাওড়া গার্লস কলেজ (১৯৫৩-৫৪)।

গ্রন্থ ঝরা পালক (১৯২৭)। ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬)। বনলতা সেন (কবিতা-ভবনের 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত, ১৯৪২)। মহাপৃথিবী (১৯৪৪)। সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮)। বনলতা সেন (সিগনেট প্রেস সংস্করণ, ১৯৫২)। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৫৪)। কবিতার কথা (প্রবন্ধসংগ্রহ, ১৯৫৬)। রূপসী বাংলা (১৯৫৭)। বেলা অবেলা কালবেলা (১৯৬১)। জীবনানন্দ দাশের গল্প (১৯৭২, সুকুমার ঘোষ ও সুবিনয় মুস্তাফী-সম্পাদিত)। সুদর্শনা (১৯৭৩, গোপালচন্দ্র রায়-সম্পাদিত)। মাল্যবান (উপন্যাস, ১৯৭৩)। জীবনানন্দ দাশের কবিতা (১৯৭৪, আবদুল মান্নান সৈয়দ-সম্পাদিত)।

সম্পাদনা 'সমকালীন সাহিত্যকেন্দ্র' নামক একটি সংস্থার মুখপত্র 'দ্বন্দ্ব' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ; অন্য দু'জন সম্পাদক ছিলেন : আবু সয়ীদ আইয়ুব ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র। দৈনিক স্বরাজ-এর রোববারের সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক (১৯৪৭)।

পুরস্কার বনলতা সেন (সিগনেট প্রেস সংস্করণ, ১৯৫২) : নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক পুরস্কৃত। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৫৪) : ১৯৪৭-৫৪ সালের শ্রেষ্ঠ বাংলা বই বিবেচিত হওয়ায় ভারত রাষ্ট্র কর্তৃক পুরস্কৃত।

মৃত্যু ১৪ অক্টোবর, ১৯৫৪ তারিখে সন্ধ্যাবেলা বালিগঞ্জে ট্র্যাম দুর্ঘটনায় আহত হন এবং ২২ অক্টোবর ১৯৫৪ রাত্রি এগারোটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে কলকাতা শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে মৃত্যু হয়।

সমাপ্ত